

REVISED AND UPDATED

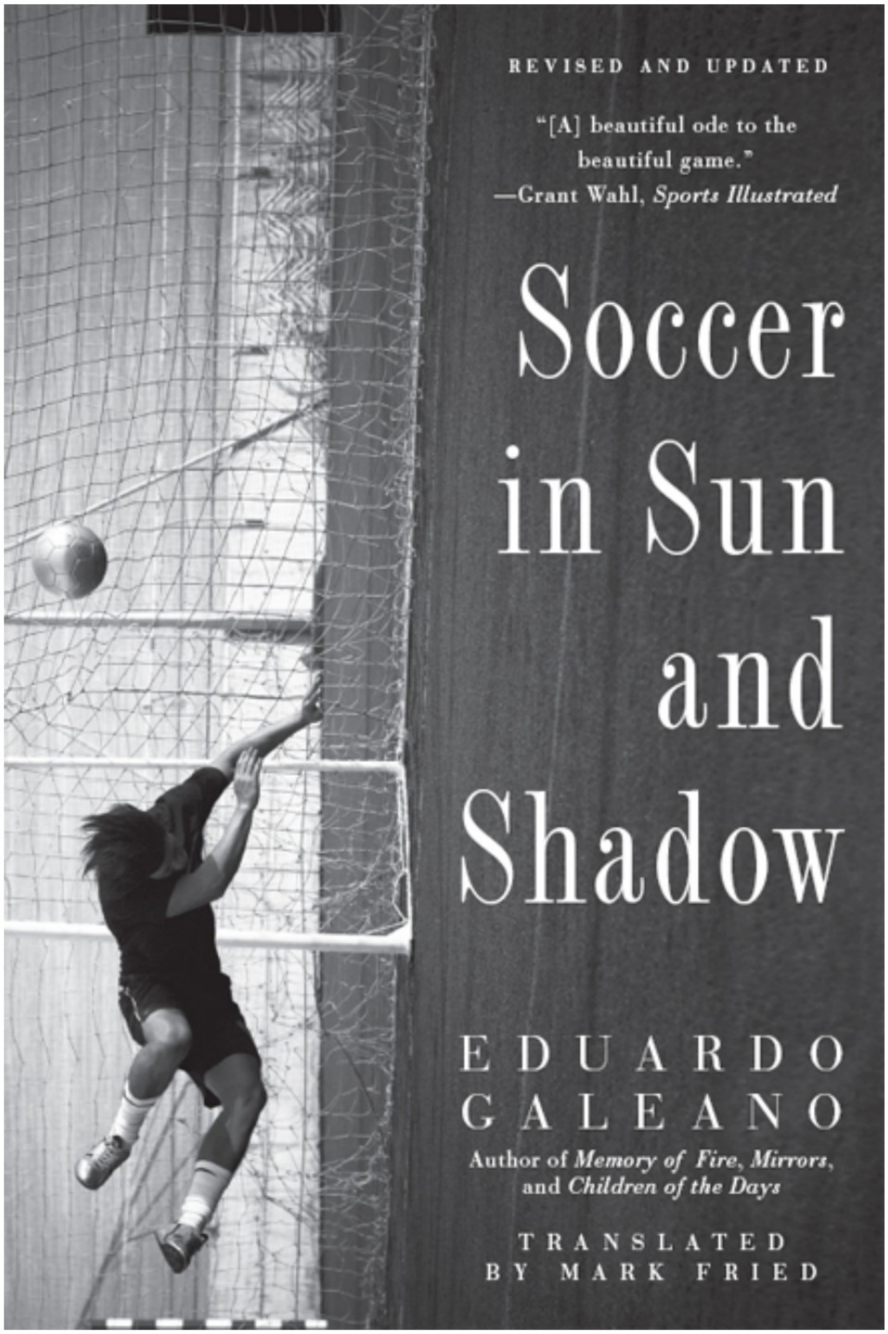
"[A] beautiful ode to the beautiful game."
—Grant Wahl, *Sports Illustrated*

Soccer in Sun and Shadow

EDUARDO GALEANO

Author of *Memory of Fire*, *Mirrors*, and *Children of the Days*

TRANSLATED BY MARK FRIED


REVISED AND UPDATED
"[A] beautiful ode to the beautiful game."
—Grant Wahl, *Sports Illustrated*
Soccer in Sun and Shadow
EDUARDO GALEANO
Author of *Memory of Fire*, *Mirrors*, and *Children of the Days*
TRANSLATED BY MARK FRIED

রোদ ও ছায়ায় ফুটবল

এদুয়ার্দো গালিয়ানোর আরও লেখা:

লাতিন আমেরিকার উন্মুক্ত শিরা, প্রেম

ও যুদ্ধের দিন ও রাত, আগুনের স্মৃতি খণ্ড ১-৩,

আলিঙ্গনের বই, আমরা না বলি,

হাঁটা শব্দ, উল্টো কণ্ঠস্বর,

সময়ের কণ্ঠস্বর

আয়না

দিনের শিশুরা

Soccer in Sun and Shadow

EDUARDO GALEANO

অনুবাদ করেছেন
মার্ক ফ্রিড

জাতি
বই
নিউ ইয়র্ক

এডুয়ার্ডো গ্যালিয়ানো দ্বারা অভ্যন্তর নকশা

প্রকাশক: নেশন বুকস, পার্সিয়াস বুকস গ্রুপের একজন সদস্য, ১১৬ পূর্ব ১৬তম স্ট্রিট, ৮ম তলা।
নিউ ইয়র্ক, এনওয়াই ১০০০৩

নেশন বুকস হলো নেশন ইনস্টিটিউট এবং পার্সিয়াস বুকস গ্রুপের একটি যৌথ প্রকাশনা উদ্যোগ।

কংগ্রেসের লাইব্রেরি ক্যাটালগিং-ইন-পাবলিকেশন ডেটা গ্যালিয়ানো, এডুয়ার্ডো, 1940-
[ফুটবল এবং সোমব্রা। ইংরেজি]

রোদ ও ছায়ায় ফুটবল/ এদুয়ার্দো গালেয়ানো।
পৃষ্ঠা সেমি।
গ্রন্থপঞ্জি এবং সূচিপত্র অন্তর্ভুক্ত।
আইএসবিএন (পেপারব্যাক): 978-1-56858-494-2
আইএসবিএন (ই-বুক): 978-1-56858-956-5 ১. সকার—ইতিহাস।
২. ফুটবল—উপাখ্যান। ৩. ফুটবল—সামাজিক দিক। ১. শিরোনাম।
GV942.5.G35 2013 796.334
—dc23 2013021572

বিষয়বস্তু

পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলো সেই শিশুদের উৎসর্গীকৃত, যারা বহু বছর আগে ক্যালেলা দে লা কোস্টায় আমার পথে এসেছিল। তারা ফুটবল খেলছিল এবং গান গাইছিল:

আমরা হেরেছি, জিতেছি,
যেভাবেই হোক আমরা মজা করেছি।

এই বইটি ‘এল পেপে’-র উৎসাহ ও ধৈর্যের কাছে বহুলাংশে ঋণী।
বারিয়েন্তোস, “মানোলো” এপেলবাউম, এজেকিয়েল ফার্নান্দেজ-মুরেস, কার্ল হুবেনার, ফ্রাঙ্কলিন মোরালেস, অ্যাঞ্জেল রুওকো এবং ক্লাউস গুস্টার, যারা প্রতিটি খসড়া পড়ে ভুলগুলো ধরেছেন এবং মূল্যবান ধারণা ও তথ্য দিয়েছেন।

এছাড়াও আমার স্ত্রী হেলেনা ভিলাগ্রার সমালোচনামূলক দৃষ্টি এবং আমার বাবা, “এল বেবি” হিউজের ফুটবল বিষয়ক স্মৃতিশক্তিও অনেক সাহায্য করেছিল। আমার ছেলে ক্লদিও এবং কয়েকজন বন্ধু, বা আমার বন্ধুদের বন্ধুরা, আমাকে বই ও সংবাদপত্র এনে দিয়ে বা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাদের ভূমিকা পালন করেছিল: হুগো আলফারো, “জে”।
ফার্নান্দো বালবি, চিকো বুয়ারকে, নিকোলাস বুয়েনাভেন্টুরা ভিদাল, ম্যানুয়েল ক্যাবিসেস, জর্জ কনসুয়েগ্রা, পিয়েরে চারাসে, জুলিয়ান গার্সিয়া-ক্যান্ডাউ, হোসে গনজালেজ ওর্তেগা, "পাঞ্চো" গ্রেলস, জেনস লোহম্যান, ড্যানিয়েল লোপেজ ডি'আলেসেন মারিয়েন্টো, জুলিয়ান মারিয়েন্টো মেডেম, জিয়ান্নি মিনা, দামাসো মুরুয়া, ফেলিপ নেপোমুসেনো, "এল মিগু" নিতো-সোলিস, লুইস নিনো, লুইস ওকাম্পোস আলোনসো, কার্লোস ওসা, নরবার্তো পেরেজ, সিলভিয়া পেইরো, মিগুয়েল অ্যাঞ্জেল রামিরেজ, অ্যালাস্টার রিড, সানোয়ান রোমানো, আফন্সো রোমানো, আফন্সো, রোমানো জিউসেপ স্মোর্তো, এবং হোর্হে ভালদানো। আমার আমন্ত্রণে ওসভালদো সোরিয়ানো সহযোগিতা করেছিলেন।

আমার বলা উচিত যে এই ফলাফলের জন্য তারা কেউই দোষী নয়, কিন্তু সত্যিটা হলো আমি আমার মনে হয়, এই ঝামেলায় পড়ার জন্য তারা নিজেরাই বেশ দোষী।

লেখকের স্বীকারোক্তি

এল উরুগুয়ের অন্য সব বাচ্চাদের মতো আমিও একজন ফুটবল খেলোয়াড় হতে চেয়েছিলাম। আর আমি বেশ ভালোই খেলতাম। সত্যি বলতে, আমি দুর্দান্ত খেলতাম, কিন্তু কেবল রাতে, যখন আমি ঘুমিয়ে থাকতাম। দিনের বেলায় আমি ছিলাম এ যাবৎকালের সবচেয়ে বাজে কাঠের পা-ওয়ালা খেলোয়াড়।

আমার দেশের ছোট ছোট ফুটবল মাঠগুলোতে।

একজন ভক্ত হিসেবে আমারও অনেক কিছু অপূর্ণ থেকে গিয়েছিল। হুয়ান আলবার্তো শিয়াফিনো এবং হুলিও সিজার আব্বাদি খেলতেন প্রতিপক্ষ দল পেনিয়ারোলের হয়ে। আমি ছিলাম ন্যাসিওনালের একনিষ্ঠ ভক্ত এবং তাদের ঘৃণা করার জন্য আমি আমার সাধ্যমতো সবকিছুই করতাম। কিন্তু তার অনবদ্য পাসের মাধ্যমে "এল পেপে" শিয়াফিনো দলের খেলা এমনভাবে পরিচালনা করতেন, যেন তিনি স্টেডিয়ামের সর্বোচ্চ টাওয়ার থেকে খেলা দেখছেন, এবং "এল পার্দো" আব্বাদি, সাতটি লিগে খেলা বুট পরে, বল বা প্রতিপক্ষকে একবারও স্পর্শ না করে, সামনে-পেছনে দুলতে দুলতে সাদা টাচলাইন বরাবর বল স্লাইড করে নিয়ে যেতেন। আমি তাদের প্রশংসা না করে পারলাম না, এমনকি আমার উল্লাস করতেও ইচ্ছে করছিল।

অনেক বছর কেটে গেছে এবং অবশেষে আমি নিজেকে যেমন, ঠিক তেমনভাবেই মেনে নিতে শিখেছি: ভালো ফুটবলের জন্য এক ভিক্ষুক। আমি হাত বাড়িয়ে সারা বিশ্ব ঘুরে বেড়াই, আর স্টেডিয়ামে মিনতি করি: "দোহাই লাগে, একটা সুন্দর মুভ দেখান।"

আর যখন ভালো ফুটবল খেলা হয়, আমি সেই অলৌকিক ঘটনার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই এবং কোন দল বা দেশ তা খেলছে, তাতে আমার কিছু যায় আসে না।



ফুটবল

টি ফুটবলের ইতিহাস হলো সৌন্দর্য থেকে কর্তব্যের দিকে এক দুঃখজনক যাত্রা। যখন খেলাধুলা একটি শিল্পে পরিণত হয়েছে, আনন্দের মধ্য থেকে যে সৌন্দর্য বিকশিত হয় খেলাটা একেবারে শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলা হয়েছে। এই শতাব্দীর শেষ প্রান্তের পৃথিবীতে, পেশাদার ফুটবল অপ্রয়োজনীয় সবকিছুকে নিন্দা করে, আর অপ্রয়োজনীয় মানে হলো অলাভজনক। সেই উন্মাদ অনুভূতি থেকে কেউ এক পয়সাও আয় করে না, যা এক মুহূর্তের জন্য একজন মানুষকে বেলুন নিয়ে খেলা করা এক শিশু, সুতোর বল নিয়ে খেলা করা এক বিড়াল, অথবা বেলুন বা সুতোর বলের মতো হালকা একটি বল নিয়ে বাতাসে উড়ে যাওয়া এক ব্যালে নর্তকীতে পরিণত করে; যে খেলছে তা না জেনেই, কোনো উদ্দেশ্য, ঘড়ি বা রেফারি ছাড়াই খেলে চলেছে।

খেলা এখন এক তামাশায় পরিণত হয়েছে, যেখানে নায়ক-নায়িকা কম আর দর্শকের সংখ্যা অনেক; ফুটবল এখন শুধু দেখার জন্য। আর সেই তামাশা বিশ্বের অন্যতম লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে, যা খেলাকে সহজ করার জন্য নয়, বরং বাধা দেওয়ার জন্যই সংগঠিত। পেশাদার খেলার প্রযুক্তি-শাসন বিদ্যুৎগতি ও পাশবিক শক্তির এক ফুটবল চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে; এমন এক ফুটবল যা আনন্দকে অস্বীকার করে, কল্পনাকে হত্যা করে এবং দুঃসাহসকে নিষিদ্ধ করে।

সৌভাগ্যবশত, মাঠে এখনও দেখা যায়, যদিও তা অনেকদিন পর পর, এমন কোনো উদ্ধত বদমাশকে, যে পূর্বনির্ধারিত নিয়মকানুন উপেক্ষা করে প্রতিপক্ষের পুরো দল, রেফারি এবং গ্যালারির দর্শকদের পাশ কাটিয়ে ড্রিবল করে এগিয়ে যাওয়ার মতো মারাত্মক ভুল করে বসে; আর এসবই করে স্বাধীনতার নিষিদ্ধ অভিযানকে আলিঙ্গন করার দৈহিক আনন্দের জন্য।

খেলোয়াড়

পি অ্যান্টিং করে, সে ডানা বেয়ে উপরে ওঠে। একপাশে স্বর্গীয় মহিমার অপেক্ষা; অন্যদিকে অন্যটি, ধ্বংসস্তূপের অতল গহ্বর।

সে পাড়ার সবার ঈর্ষার পাত্র: সেই পেশাদার ক্রীড়াবিদ, যে কারখানা বা অফিসের জীবন ছেড়ে এসে শুধু মজা করার জন্য টাকা পায়। সে যেন লটারি জিতেছে। আর তাকে যদি অশেষ পরিশ্রমও করতে হয়, ব্যর্থতা বা ক্লান্তির কোনো অধিকার না থাকলেও, তার নাম খবরের কাগজে আর টিভিতে আসে। রেডিওতে তার নাম শোনা যায়, নারীরা তার রূপে মুগ্ধ হয়, আর শিশুরা তার মতো হতে চায়। কিন্তু তার শুরুটা হয়েছিল বস্তির ধুলোমাখা রাস্তায় আনন্দের জন্য খেলা দিয়ে, আর এখন সে খেলে কর্তব্যের খাতিরে এমন সব স্টেডিয়ামে, যেখানে জেতা বা না জেতা ছাড়া তার আর কোনো উপায় নেই।

ব্যবসায়ীরা তাকে কেনে, বিক্রি করে, ধার দেয় এবং আরও খ্যাতি ও অর্থের আশায় সে এসব হতে দেয়। সে যত বেশি সফল হয় এবং যত বেশি অর্থ উপার্জন করে, ততই সে আরও বেশি বন্দী হয়ে পড়ে।

সামরিক শৃঙ্খলার অধীনে থাকতে বাধ্য হয়ে, সে প্রতিদিনের কঠোর প্রশিক্ষণ এবং ব্যথানাশক ও কর্টিসোনের অবিরাম বর্ষণে ভোগে, যা তার ব্যথা লুকিয়ে রাখে এবং শরীরকে ধোঁকা দেয়। আর বড় ম্যাচের আগের রাতে, তাকে একটি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে আটকে রাখা হয়, যেখানে সে জোরপূর্বক শ্রম দেয়, স্বাদহীন খাবার খায়, জল খেয়ে মাতাল হয় এবং একাকী ঘুমায়।

অন্যান্য পেশায় বার্ধক্যের সাথে সাথে কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়, কিন্তু একজন ফুটবল খেলোয়াড় ত্রিশ বছর বয়সেই বৃদ্ধ হয়ে যেতে পারে। পেশীগুলো তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়ে: “মাঠটা ঢালু হলেও ওই লোকটা গোল করতে পারত না।”

ওকে? গোলরক্ষকের হাত বেঁধে দিলেও না।

কিংবা ত্রিশ মিনিটের আগেই, যদি বলের আঘাতে সে ছিটকে পড়ে, বা দুর্ভাগ্যবশত পেশি ছিঁড়ে যায়, অথবা লাথিতে হাড় ভেঙে যায় যা আর সারানো সম্ভব নয়। আর এক জঘন্য দিনে খেলোয়াড়টি আবিষ্কার করে যে, সে একটিমাত্র তাসের উপর তার জীবন বাজি ধরেছে এবং তার টাকা যেমন শেষ, তেমনি তার খ্যাতিও। খ্যাতি, সেই ক্ষণস্থায়ী রমণী, তার জন্য একটি ‘প্রিয় চিঠি’ পর্যন্ত রেখে যায়নি।

গোলরক্ষক

টি তারা তাকে ডোরম্যান, কিপার, গোলি, বাউন্সার বা নেট-মাইন্ডারও বলে।
কিন্তু তাকে শহীদ, সর্বস্ব পরিশোধকারী, অনুতপ্ত বা অন্য নামেও ডাকা যেত।
সে যেন ঘুষি খাওয়ার বস্তা। লোকে বলে, যেখানে সে হাঁটে, সেখানে ঘাস আর গজায় না।

সে একা, দূর থেকে খেলা দেখতে বাধ্য। গোলপোস্ট থেকে এক মুহূর্তের জন্যও বের হয় না, তার একমাত্র সঙ্গী দুটি পোস্ট আর ক্রসবার; সে ফায়ারিং স্কোয়াডে নিজের মৃত্যুদণ্ডের অপেক্ষায় থাকে। একসময় সে রেফারির মতো কালো পোশাক পরত। এখন রেফারিকে আর কাকের মতো সাজতে হয় না, আর গোলরক্ষকও তার একাকীত্বে রঙিন সাজপোশাক দিয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারে।

সে গোল করে না; তার কাজ হলো গোল হওয়া থেকে বিরত রাখা।
গোলপোস্ট হলো ফুটবলের উৎসব: স্ট্রাইকার আনন্দ জাগিয়ে তোলে আর গোলরক্ষক, এক নিরুৎসাহী ব্যক্তি, তা নিভিয়ে দেয়।

তার পিঠে এক নম্বর জার্সি। প্রথম বেতন পায় সে? না, প্রথম মূল্য পরিশোধ করে সে-ই। দোষটা সবসময় গোলরক্ষকেরই। আর যখন দোষটা তার নয়, তখনও তাকেই দোষারোপ করা হয়। যখনই কোনো খেলোয়াড় ফাউল করে, শাস্তিটা গোলরক্ষককেই পেতে হয়: তাকে তার জল্লাদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য বিশাল ফাঁকা জালে একা ফেলে রাখা হয়। আর যখন দলের দিনটা খারাপ যায়, তখন উড়ে আসা বলের বৃষ্টির নিচে অন্যদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে তাকেই তার মূল্য দিতে হয়।

বাকি খেলোয়াড়রা মাঝে মাঝে বা প্রায়শই ভুল করতে পারে, এবং তারপর একটি দর্শনীয় ড্রিবল, একটি নিখুঁত পাস, বা একটি সঠিক জায়গায় নেওয়া ভলি দিয়ে তা পুষিয়ে নিতে পারে। কিন্তু সে তেমন নয়। দর্শকরা গোলরক্ষককে কখনো ক্ষমা করে না। কোনো ফেকের ফাঁদে পড়ে কি সে এগিয়ে গিয়েছিল? তাকে কি হাস্যকর দেখাচ্ছিল? বলটা কি পিছলে গিয়েছিল? তার ইস্পাতের মতো শক্ত আঙুলগুলো কি নরম হয়ে গিয়েছিল? একটি মাত্র ভুলের কারণে গোলরক্ষক একটি ম্যাচ নষ্ট করে দিতে পারে বা একটি চ্যাম্পিয়নশিপ হারাতে পারে, এবং ভক্তরা হঠাৎ তার সমস্ত কৃতিত্ব ভুলে গিয়ে তাকে চিরদিনের অপমানের দিকে ঠেলে দেয়। এই অভিশাপ তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাকে তাড়া করে ফিরবে।



প্রতিমা

একটি আর একদিন বায়ুদেবী মানুষের চরণে চুম্বন করেন—
সেই নির্যাতিত, অবহেলিত পা—এবং সেই চুম্বন থেকেই ফুটবল তারকার জন্ম।
জন্ম। তিনি টিনের চালের একটি কুঁড়েঘরে খড়ের দোলনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি প্রবেশ করেন
পৃথিবী একটি বলকে আঁকড়ে ধরে আছে।

হাঁটতে শেখার মুহূর্ত থেকেই সে খেলতে জানে। শৈশবে সে খেলার মাঠগুলোকে আনন্দে ভরিয়ে তোলে, বস্তির পেছনের গলিতে রাত না হওয়া পর্যন্ত পাগলের মতো খেলে, যতক্ষণ না বল আর দেখা যায় না; আর যৌবনের শুরুতে সে যেন উড়তে শুরু করে, আর তার সাথে স্টেডিয়ামগুলোও যেন উড়ে যায়। তার অ্যাক্রোব্যাটিক নৈপুণ্য প্রতি রবিবার বহু দর্শককে আকর্ষণ করে, একের পর এক জয়ে, একের পর এক করতালিতে।

বলটা তাকে খুঁজে নেয়, তাকে চেনে, তাকে চায়। সে তার পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে থাকে আর দুলতে থাকে। সে তাকে আদর করে আর কথা বলায়, আর সেই একান্ত আলাপে লক্ষ লক্ষ বোবা কথা বলে। সেইসব নগণ্যরা, যারা চিরকাল নগণ্য হয়ে থাকার জন্য অভিশপ্ত, তারাও ঐ এক-দুই পাসের গুণে, ঘাসের ওপর Z-এর মতো দাগ কাটা সেইসব ড্রিবলের গুণে, ঐ অবিশ্বাস্য ব্যাকহিল গোল বা ওভারহেড ভলির গুণে এক মুহূর্তের জন্য নিজেদের বিশেষ কেউ বলে মনে করে। যখন সে খেলে, দলে বারোজন খেলোয়াড় থাকে: “বারো? পনেরোজন! কুড়িজন!”

বাতাসে বলটি উজ্জ্বল হয়ে হাসে। সে তাকে নামিয়ে আনে, ঘুম পাড়িয়ে দেয়, প্রশংসায় ভরিয়ে দেয়, তার সাথে নাচে। এমন অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে তার অনুরাগীরা তাদের অনাগত নাতি-নাতনিদের জন্য দুঃখ বোধ করে, যারা এসব কোনোদিন দেখতে পাবে না।

কিন্তু প্রতিমা তো ক্ষণিকের জন্যই, মানুষের অনন্তকালের জন্য, যা কিনা শূন্যতারই এক সর্বস্ব। আর যখন সেই সোনালী পা-টি পঙ্গু হয়ে যাওয়ার সময় আসবে, ততক্ষণে নক্ষত্রটি আলোর ঝলকানি থেকে কৃষ্ণগহ্বরে তার যাত্রা সম্পন্ন করে ফেলবে। তার শরীরে ভাঁড়ের পোশাকের চেয়েও বেশি তালি, আর ততক্ষণে সেই অ্যাক্রোব্যাট পঙ্গু, শিল্পী এক ভারবাহী পশু: "তোমার এই ভারি জুতো পরে চলবে না!"

জনসমাদরের উৎসই জনতার বজ্রপাতের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।
বিদ্বেষ: "তুই মা!"

কখনো কখনো প্রতিমাটি একবারে ভেঙে পড়ে না। আবার কখনো যখন সে ভাঙ্গে, লোকেরা টুকরোগুলো গোগ্রাসে খায়।



ভক্ত

ও সপ্তাহে একবার, ভক্তটি স্টেডিয়ামের উদ্দেশ্যে বাড়ি ছেড়ে পালায়।

পতাকা উড়ছে আর শব্দযন্ত্র, আতশবাজি ও ঢাকের আওয়াজে বাতাস মুখরিত; ঝরে পড়ছে রঙিন ফিতা আর কাগজের টুকরো। শহরটা উধাও হয়ে যায়, তার দৈনন্দিন জীবন বিস্মৃত হয়। কেবল মন্দিরটিরই অস্তিত্ব থাকে। এই পবিত্র স্থানে, নাস্তিকবিহীন একমাত্র ধর্মটি তার দেব-দেবীগণকে প্রদর্শন করে।

যদিও ভক্তটি টিভিতে আরও স্বাচ্ছন্দ্যে অলৌকিক ঘটনাটি উপলব্ধি করতে পারেন, তবুও তিনি এই নির্দিষ্ট স্থানে তীর্থযাত্রা করতেই পছন্দ করেন, যেখানে তিনি তাঁর দেবদূতদের সশরীরে সমসাময়িক শয়তানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দেখতে পান।

এখানে সমর্থকটি তার রুমাল ঝাড়ে, ঢোক গিলে, তিক্ত রস গিলে, নিজের টুপি চিবিয়ে খায়, ফিসফিস করে প্রার্থনা আর অভিশাপ দেয়, এবং হঠাৎ গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ওঠে, আর পাশে গোলের উল্লাসে মত্ত অচেনা মানুষটিকে জড়িয়ে ধরতে ছারপোকার মতো লাফিয়ে ওঠে। এই পৌত্তলিক সমাবেশ যতক্ষণ চলে, সমর্থকের সংখ্যাও তত। হাজার হাজার অন্য ভক্তদের সাথে সেও এই নিশ্চিত বিশ্বাসে অংশীদার যে আমরাই সেরা, সব রেফারিই অসৎ, আর আমাদের সব প্রতিপক্ষই প্রতারণা করে।

সমর্থক খুব কমই বলে, “আজ আমার ক্লাবের খেলা আছে।” সে বলে, “আজ আমরা খেলছি।” সে জানে যে ‘বারো নম্বর খেলোয়াড়’-ই সেই উদ্দীপনার ঝড় তোলে যা বলটিকে এগিয়ে নিয়ে যায় যখন সে ঘুমিয়ে পড়ে; ঠিক যেমন অন্য এগারোজন খেলোয়াড় জানে যে সমর্থক ছাড়া খেলাটা হলো সুর ছাড়া নাচার মতো।

ম্যাচ শেষ হলে, গ্যালারি থেকে একচুলও না নড়া সমর্থকটি তার বিজয় উদযাপন করে: “কী গোলটাই না করেছি!” “কী মারটাই না দিয়েছি ওদের!” অথবা সে তার পরাজয়ে কাঁদে: “ওরা আবার আমাদের ঠকিয়েছে।” “চোর রেফারি।” আর তারপর সূর্য অস্ত যায়, আর সেই সমর্থকটিও। খালি হয়ে আসা স্টেডিয়ামের ওপর ছায়া নেমে আসে। কংক্রিটের গ্যালারিতে কয়েকটি ক্ষণস্থায়ী আগুন জ্বলে, আর আলো ও কণ্ঠস্বর মিলিয়ে যায়। স্টেডিয়ামটি একা হয়ে যায়, আর সেই সমর্থকটিও তার নিঃসঙ্গতায় ফিরে যায়: সেই ‘আমি’-র কাছে, যে একসময় ‘আমরা’ ছিল। সমর্থকটি চলে যায়, ভিড় ভেঙে মিলিয়ে যায়, আর রবিবারটা কার্নিভালের মৃত্যুর পর অ্যাশ ওয়েডনেসডের মতোই বিষণ্ন হয়ে ওঠে।



উগ্রপন্থী

টি ধর্মান্ধ ব্যক্তিটি একটি পাগলাগারদের ভক্ত। সমস্ত প্রমাণ অস্বীকার করার জন্য তার উন্মাদনা। অবশেষে তার মনের যা কিছু ছিল, সবকিছু ওলটপালট করে দিল, এবং অবশেষ প্রচণ্ড ক্রোধে উত্তাল জলে জাহাজডুবিটি উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরপাক খাচ্ছে। যে কোনো ছাড় দেয় না।

উগ্রপন্থী লোকটি স্টেডিয়ামে হাজির হয় তীব্র ও আক্রমণাত্মক সরঞ্জাম গায়ে জড়িয়ে, দলের পতাকায় মোড়ানো, মুখে তার প্রিয় দলের জার্সির রঙে রাঙানো; আসার পথে সে প্রচণ্ড শোরগোল আর হট্টগোল করে। সে কখনো একা আসে না। উচ্ছৃঙ্খল জনতার মাঝে, বিপজ্জনক শতপদী এই ভীতসন্ত্রস্ত লোকটি অন্যদের ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলে, এই ভীত মানুষটিই হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর। রবিবারের এই সর্বশক্তিমানতা সপ্তাহের বাকি দিনগুলোতে তার যে বাধ্য জীবন থাকে, তা থেকে তাকে মুক্তি দেয়: ইচ্ছাহীন বিছানা, আকর্ষণহীন চাকরি, অথবা একেবারেই কোনো চাকরি না থাকা। একদিনের জন্য মুক্ত হয়ে, এই উগ্রপন্থীর প্রতিশোধ নেওয়ার থাকে অনেক কিছু।

মৃগীরোগের আবেশে সে খেলা দেখে, কিন্তু কিছুই দেখতে পায় না। তার আখড়া হলো গ্যালারি। ওগুলোই তার যুদ্ধক্ষেত্র। প্রতিপক্ষের কোনো সমর্থকের সামান্য উপস্থিতিই এক অমার্জনীয় উস্কানি। ভালো স্বভাবগতভাবে হিংস্র নয়, কিন্তু মন্দ তাকে কোনো বিকল্প দেয় না। শত্রু, যে সবসময় অন্যায় করে, তার উত্তম-মধ্যম প্রাপ্য। ধর্মান্ধ ব্যক্তিটি তার মনকে অন্য দিকে যেতে দিতে পারে না, কারণ শত্রু সর্বত্র বিরাজমান; এমনকি সেই শান্ত দর্শকের মধ্যেও, যে যেকোনো মুহূর্তে মতামত দিতে পারে যে প্রতিপক্ষ দল ন্যায্যভাবেই খেলছে। তখন সে তার প্রাপ্য শাস্তি পাবে।



লক্ষ্য

টি গোল হলো ফুটবলের অর্গাজম। আর অর্গাজমের মতোই, গোলও হয়ে উঠেছে এক... আধুনিক জীবনে এর ঘটনা ক্রমশ বিরল হয়ে পড়ছে।

অর্ধ শতাব্দী আগে, কোনো ম্যাচ গোলশূন্যভাবে শেষ হওয়াটা ছিল এক বিরল ঘটনা: ০-০, দুজনের হাঁ করে থাকা মুখ, আর দুজনের হাই তোলা। এখন এগারোজন খেলোয়াড় পুরো ম্যাচ জুড়ে ক্রসবারে ঝুলে থাকে, গোল আটকানোর চেষ্টায়, এবং গোল করার জন্য তাদের হাতে কোনো সময়ই থাকে না।

যখনই সাদা বুলেটটি জালে ঢেউ তোলে, তখন যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে তা রহস্যময় বা পাগলামি মনে হতে পারে, কিন্তু মনে রাখবেন, এমন অলৌকিক ঘটনা সচরাচর ঘটে না। গোলটি, তা যতই ছোট হোক না কেন, ধারাভাষ্যকারদের গলা থেকে বেরিয়ে আসা এক অপূর্ব গোল, বুক থেকে গাওয়া এমন এক ‘দো’ যা কারুসোকেও চিরতরে নির্বাক করে দেবে, আর দর্শকরা উন্মাদ হয়ে যায় এবং স্টেডিয়াম ভুলে যায় যে এটি কংক্রিটের তৈরি, মাটি থেকে মুক্ত হয়ে বাতাসে উড়ে যায়।

রেফারি

আমি স্প্যানিশ ভাষায় তিনি হলেন আরবিট্রো (árbitro) এবং সংজ্ঞাগতভাবেই তিনি স্বেচ্ছাচারী। এক জঘন্য স্বৈরশাসক যিনি কোনো বিরোধিতা ছাড়াই তাঁর একনায়কতন্ত্র চালান, এক দাম্ভিক জল্লাদ যিনি নাটকীয় ভঙ্গিতে তাঁর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে শিস দিয়ে তিনি অমোঘ ভাগ্যের বাতাস বইয়ে দেন, কোনো গোল হতে দেওয়ার জন্য বা না দেওয়ার জন্য। হাতে তাস নিয়ে তিনি ধ্বংসের রং তোলেন: হলুদ তাস পাপীকে শাস্তি দিতে ও অনুতপ্ত হতে বাধ্য করতে, এবং লাল তাস তাকে নির্বাসনে পাঠাতে।

লাইনসম্যানরা, যারা সাহায্য করেন কিন্তু সিদ্ধান্ত দেন না, পাশ থেকে সবকিছু দেখেন। কেবল রেফারিই খেলার মাঠে নামেন, এবং গর্জনরত জনতার সামনে প্রথমবার উপস্থিত হয়ে নিজের বুকে ক্রুশচিহ্ন আঁকাটা তার জন্য অবশ্যই সঠিক। তার কাজই হলো নিজেকে ঘৃণার পাত্র করে তোলা। ফুটবলের একমাত্র সর্বজনীন অনুভূতি হলো: সবাই তাকে ঘৃণা করে।

সে শুধু বিদ্রূপই পায়, কখনো প্রশংসা পায় না।



এর চেয়ে বেশি কেউ দৌড়ায় না। এই অনধিকার প্রবেশকারী, যার হাঁপানোর শব্দ বাইশজন খেলোয়াড়ের সবার কানে বাজে, তাকে পুরো ম্যাচ জুড়ে একটানা দৌড়াতে হয়। ঘোড়ার মতো দৌড়ে সে কোমর ভেঙে ফেলে, আর তার এই কষ্টের বিনিময়ে দর্শকরা তার শিরশ্ছেদ চেয়ে চিৎকার করে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সে সাদা বলটার পেছনে ছুটতে ছুটতে সমুদ্র পরিমাণ ঘাম ঝরায়, যে বলটা বাকি সবার পায়ের ফাঁকে ফাঁকে লাফিয়ে চলে। অবশ্যই সে খেলতে ভালোবাসে, কিন্তু তাকে সেই সুযোগ কখনও দেওয়া হয়নি।

যখন বলটা দৈবক্রমে তার গায়ে লাগে, তখন পুরো স্টেডিয়াম তার মাকে অভিশাপ দেয়। কিন্তু

তবুও, শুধুমাত্র সেই পবিত্র সবুজ প্রাঙ্গণে থাকার জন্য, যেখানে বলটা ভেসে বেড়ায় ও গড়িয়ে চলে, সে অপমান, বিদ্রূপ, পাথর ছোড়া এবং অভিশাপ সহ্য করতেও রাজি।



মাঝে মাঝে, যদিও তা খুব কমই ঘটে, তার বিচার ভক্তদের ইচ্ছার সাথে মিলে যায়, কিন্তু তখনও তিনি অক্ষত থাকেন না। পরাজিতদের হারের জন্য তিনিই দায়ী এবং বিজয়ীরা তাকে উপেক্ষা করেই জয়লাভ করে। প্রতিটি ভুলের বলির পাঁঠা, প্রতিটি দুর্ভাগ্যের কারণ—তার অস্তিত্ব না থাকলে ভক্তদের তাকে তৈরি করে নিতে হতো। তারা তাকে যত ঘৃণা করে, ততই তাকে তাদের প্রয়োজন হয়।

এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে রেফারি শোকের পোশাকে সজ্জিত ছিলেন। কার জন্য? কিসের জন্য? নিজেই। এখন সে তার কষ্ট ঢাকতে উজ্জ্বল রঙের পোশাক পরে।

ব্যবস্থাপক

আগের দিনে একজন প্রশিক্ষক ছিলেন এবং কেউই তাঁর কথায় তেমন কান দিত না।
আমি তিনি নিঃশব্দে মারা গেলেন যখন খেলাটি আর খেলা থাকল না এবং পেশাদার ফুটবলে খেলোয়াড়দের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য একটি প্রযুক্তিতন্ত্রের প্রয়োজন হলো।
তখনই ম্যানেজারের জন্ম হয়েছিল। তাঁর লক্ষ্য ছিল: তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকে বাধা দেওয়া, স্বাধীনতা সীমিত করা এবং খেলোয়াড়দের কার্যকারিতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া, যারা এখন শৃঙ্খলাপরায়ণ ক্রীড়াবিদ হতে বাধ্য ছিল।

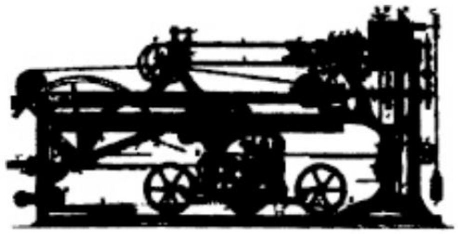
প্রশিক্ষক বলতেন, "চলো খেলি।"

ম্যানেজার বলেন, "চলো কাজে যাই।"

আজকাল তারা সংখ্যা দিয়ে কথা বলে। বিংশ শতাব্দীর ফুটবলের ইতিহাস, যা দুঃসাহস থেকে ভয়ের দিকে এক যাত্রা, তা হলো ৪-৩-৩ এবং ৪-৪-২ এর মধ্য দিয়ে ২-৩-৫ থেকে ৫-৪-১ ফর্মেশনে উত্তরণের এক সফর। সামান্য সাহায্য পেলেই যেকোনো অজ্ঞ ব্যক্তি এইটুকু বুঝতে পারবে, কিন্তু বাকিটা অসম্ভব। ম্যানেজার এমন সব সূত্র উদ্ভাবন করেন যা নিষ্কলঙ্ক গর্ভধারণের মতোই রহস্যময়, এবং সেই সূত্র ব্যবহার করে তিনি এমন সব কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরি করেন যা পবিত্র ত্রিত্বের মতোই দুর্বোধ্য।

পুরোনো ব্ল্যাকবোর্ড থেকে ইলেকট্রনিক স্ক্রিন: এখন দুর্দান্ত সব কৌশল পরিকল্পনা করে কম্পিউটার আর শেখায় ভিডিও। ম্যাচ সম্প্রচারের সময় এই স্বপ্নীল কৌশলগুলো খুব কমই দেখানো হয়। টেলিভিশন বরং ম্যানেজারের কপালের ভাঁজের ওপরই বেশি মনোযোগ দিতে পছন্দ করে। আমরা দেখি তিনি মুঠি কামড়াচ্ছেন অথবা এমন সব নির্দেশ চিৎকার করে দিচ্ছেন, যা যদি কেউ বুঝতে পারত, তবে নিশ্চিতভাবেই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিত।

ম্যাচ-পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকরা তাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেন, কিন্তু তিনি তার জয়ের রহস্য কখনো প্রকাশ করেন না, যদিও পরাজয়ের ক্ষেত্রে তিনি প্রশংসনীয় ব্যাখ্যা দেন। যখন দল কোনো দুর্বল প্রতিপক্ষের কাছে বড় ব্যবধানে হারে, তখন তিনি বলেন, "নির্দেশনা স্পষ্ট ছিল, কিন্তু ওরা শোনেনি।"
অথবা তিনি নিজের সম্পর্কে তৃতীয় পুরুষে কথা বলে সব সন্দেহ দূর করেন, অনেকটা এইভাবে: "আজ দল যে বিপর্যয়ের শিকার হয়েছে, তা সেই ধারণাগত স্বচ্ছতার অর্জনকে কখনোই ম্লান করতে পারবে না, যেটিকে এই ম্যানেজার একসময় সত্যিকারের কার্যকর হয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় বহুবিধ ত্যাগের সংশ্লেষণ হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন।"



প্রদর্শনীর যন্ত্র তার পথের সবকিছু পিষে ফেলে, কোনো কিছুই বেশিদিন টেকে না, এবং ব্যবস্থাপকও ভোগবাদী সমাজের অন্য যেকোনো পণ্যের মতোই বর্জনীয়। আজ জনতা চিৎকার করে, “কখনো মরবেন না!” আর পরের রবিবারই তারা তাকে আত্মহত্যা করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়।

ম্যানেজার বিশ্বাস করেন ফুটবল একটি বিজ্ঞান এবং মাঠ একটি গবেষণাগার, কিন্তু মালিক ও সমর্থকদের জন্য আইনস্টাইনের প্রতিভা আর ফ্রয়েডের সূক্ষ্মতা যথেষ্ট নয়। তারা লর্ডসের দেবীর মতো অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন একজনকে চান, যার থাকবে গান্ধীর মতো অদম্য মনোবল।



থিয়েটার

টি এই অনুষ্ঠানের শিল্পীরা দর্শকদের সামনে পা দিয়ে অভিনয় করেন। হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা গ্যালারি থেকে বা তাদের বাসস্থান থেকে দেখে আত্মারা উত্তাল, কক্ষগুলো যেন টালমাটাল। নাটকটা লেখে কে—ব্যবস্থাপক? এই নাটকটি তার রচয়িতাকে উপহাস করে, নিজের খেয়ালখুশিমতো এবং অভিনেতাদের সামর্থ্য অনুযায়ী উন্মোচিত হয়। এটি পুরোপুরি ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল, যা বাতাসের মতো যেদিকে বয়। একারণেই এর পরিণতি দর্শক এবং চরিত্র উভয়ের কাছেই সবসময় বিস্ময়কর হয়, ঘুষ বা ভাগ্যের অন্য কোনো অনিবার্য পরিহাসের ক্ষেত্র ছাড়া।

ফুটবলের এই বিশাল রঙ্গমঞ্চে কতগুলো ছোট ছোট নাট্যমঞ্চ রয়েছে? সবুজ ঘাসের ঐ আয়তক্ষেত্রের মধ্যে কতগুলো মঞ্চ আঁটে? সব খেলোয়াড় শুধু তাদের পা দিয়েই খেলে না। কেউ কেউ আবার সতীর্থদের নাজেহাল করার শিল্পে ওস্তাদ।
এমন একজন খেলোয়াড়, যে কিনা একটা মাছিরও ক্ষতি করতে পারে না এমন সাধুর মুখোশ পরে, তার প্রতিপক্ষের দিকে থুতু ফেলবে, তাকে অপমান করবে, ধাক্কা দেবে, তার চোখে ময়লা ছুঁড়ে মারবে, চিবুকে সজোরে কনুইয়ের গুঁতো দেবে, আরেকটা কনুই দিয়ে তার পাঁজরে খোঁচা দেবে, তার চুল বা জামা ধরে টানবে, সে থামলে তার পায়ের উপর বা পড়ে গেলে তার হাতের উপর পা দিয়ে মাড়িয়ে দেবে—আর এই সবকিছুই ঘটবে রেফারির চোখের আড়ালে, যখন লাইনসম্যানরা আকাশের দিকে ভেসে যাওয়া মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকবে।

কেউ কেউ সুবিধা আদায়ের শিল্পে জাদুকর। একজন হতভাগা, নির্বোধের মুখোশ পরে, যে আসলে একটা আহাম্মক, এমন খেলোয়াড়ের মতো আচরণ করে, সে রেফারির দেখানো জায়গা থেকে বহু দূর থেকে পেনাল্টি, ফ্রি-কিক বা থ্রো-ইন নিয়ে নেয়। আর যখন তাকে মানবপ্রাচীর গড়তে হয়, তখন সে সাবলীলভাবে এগিয়ে যায়।

পা না তুলে খুব ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট জায়গাটার দিকে এগিয়ে যায়, যতক্ষণ না জাদুর কার্পেটটি তাকে ঠিক সেই খেলোয়াড়টির উপরে নামিয়ে দেয় যে বলটি কিক করতে যাচ্ছিল।

সময় নষ্ট করার শিল্পে অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতারা আছেন। সদ্য ক্রুশবিদ্ধ কোনো শহীদের মুখোশ পরে, এমন একজন খেলোয়াড় যন্ত্রণায় গড়াগড়ি খায়, হাঁটু বা মাথা আঁকড়ে ধরে, এবং তারপর ঘাসের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে। মিনিট কেটে যায়। শামুকের গতিতে বেরিয়ে আসে সেই মোটাসোটা মালিশকারী, সেই পবিত্র হাত—ঘামে ভেজা, মলমের গন্ধে ভরা, গলায় তোয়ালে জড়ানো, এক হাতে জলের বোতল আর অন্য হাতে কোনো অব্যর্থ মহৌষধ। ঘণ্টা কেটে যায়, বছর কেটে যায়, যতক্ষণ না রেফারি সেই মৃতদেহটিকে মাঠ থেকে সরিয়ে নিতে আদেশ দেয়।

আর হঠাৎ, হুশ করে খেলোয়াড়টি লাফিয়ে ওঠে এবং পুনরুত্থানের অলৌকিক ঘটনাটি ঘটে।



বিশেষজ্ঞরা

বি ম্যাচের আগে, কলাম লেখকরা তাদের উদ্বেগজনক রূপরেখা তৈরি করেন। প্রশ্ন: "আপনি কি জেতার জন্য প্রস্তুত?"

এবং তারা এক বিস্ময়কর উত্তর পায়: "বিজয় লাভের জন্য আমরা সম্ভাব্য সবকিছুই করব।"

পরে, সম্প্রচারকারীরা কথা বলতে আসেন। টিভি অ্যাঙ্কররা জানেন যে তাঁরা ছবির সাথে পাল্লা দিতে পারবেন না, তাই তাঁরা ছবির সঙ্গেই থাকেন। অন্যদিকে, রেডিও ধারাভাষ্যকাররা ততটা ভীরু নন। সাসপেন্সের এই ওস্তাদরা খেলোয়াড়দের চেয়ে বেশি দৌড়ান এবং বলের চেয়ে বেশি পিছলে যান। মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো গতিতে তাঁরা এমন একটি খেলার বর্ণনা দেন, যার সাথে আপনি যা দেখছেন তার সামান্যই মিল থাকে। শব্দের সেই স্রোতে, যে শটটিকে আপনি আকাশ ছুঁয়ে যেতে দেখছেন, সেটি ক্রসবার ঘেঁষে যাচ্ছে, এবং যে জালে গোলরক্ষক হাই তুলছে আর মাকড়সা শান্তভাবে এক পোস্ট থেকে আরেক পোস্টে জাল বুনছে, সেই জালটি একটি আসন্ন গোলের মুখোমুখি।

কংক্রিটের সেই বিশাল অট্টালিকার প্রাণবন্ত দিনটি যখন শেষ হয়, তখন সমালোচকদের পালা আসে। এর মধ্যেই তারা খেলোয়াড়দের কী করতে হবে তা বলার জন্য বেশ কয়েকবার সম্প্রচার থামিয়েছে, কিন্তু খেলোয়াড়রা শোনেনি কারণ তারা ভুল করতেই বেশি ব্যস্ত ছিল। এমডব্লিউ-এর (যা একই জিনিস কিন্তু পশ্চাৎপদ) বিরুদ্ধে ডব্লিউএম গঠনের এই মতাদর্শীরা এমন এক ভাষায় কথা বলে যেখানে বৈজ্ঞানিক পাণ্ডিত্য, যুদ্ধ-প্রচারণা এবং গীতিময় ভাবাবেগ পর্যায়ক্রমে আসে। আর তারা সবসময় বহুবচনে কথা বলে, কারণ তারা সংখ্যায় অনেক।

ফুটবল ডাক্তারদের ভাষা

এল আসুন আমরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সংক্ষেপে তুলে ধরি এবং সংঘটিত প্রতিযোগিতার কৌশলগত, প্রযুক্তিগত ও ভৌত সমস্যাগুলোর একটি প্রাথমিক ধারণা তৈরি করি।
আজ বিকেলে ইউনিডোস ভেনসেরেমোস সকার ক্লাবের মাঠে, এই বিষয়ের সাথে বেমানান সরলীকরণের আশ্রয় না নিয়ে—যেটি নিঃসন্দেহে আরও গভীর ও বিশদ বিশ্লেষণ দাবি করে—এবং এমন কোনো অস্পষ্টতার আশ্রয় না নিয়ে যা ক্রীড়াপ্রেমী জনসাধারণের সেবায় আমাদের আজীবন উৎসর্গের কাছে অতীতেও ছিল, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না।

আমাদের পক্ষে নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া এবং স্বাগতিক দলের এই বিপর্যয়ের জন্য তাদের খেলোয়াড়দের সংযত পারফরম্যান্সকে দায়ী করা সহজ হতো, কিন্তু আজকের ম্যাচে প্রতিবার বল পাওয়ার পর তারা যে অনস্বীকার্য অতিরিক্ত মন্থরতা প্রদর্শন করেছে, তা কোনোভাবেই—ভদ্রমহোদয়গণ, আমাকে ভালোভাবে বুঝুন— এই ধরনের একটি সাধারণীকৃত এবং ফলস্বরূপ অন্যায্য সমালোচনার ন্যায্যতা প্রমাণ করে না । না, না, এবং না। আপোস করা আমাদের স্বভাব নয়, যেমনটা আপনারা যারা আমাদের দীর্ঘ কর্মজীবন ধরে অনুসরণ করেছেন তারা ভালো করেই জানেন—শুধু আমাদের প্রিয় দেশেই নয়, বরং আন্তর্জাতিক এবং এমনকি বিশ্বব্যাপী ক্রীড়ামঞ্চেও, যেখানেই আমাদের এই সামান্য দায়িত্ব পালনের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। তাই, আমাদের অভ্যাসমতো, আমরা প্রতিটি শব্দের প্রতিটি অক্ষর স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে যাচ্ছি: এই সংগ্রামরত দলটির অনুসৃত খেলার পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা সফলতায় পৌঁছায়নি, কারণ দলটি বৃহত্তর আক্রমণাত্মক বিস্তারের জন্য তাদের প্রত্যাশাকে প্রতিপক্ষের গোলের দিকে যথাযথভাবে চালিত করতে ক্রমাগত অক্ষম। আমরা গত রবিবারেই এই কথা বলেছিলাম এবং আজকেও মাথা উঁচু করে ও নির্ভয়ে তা পুনর্ব্যক্ত করছি, কারণ আমরা বরাবরই যা সত্য তাই বলেছি এবং আমরা সত্য বলতেই থাকব, যদিও তাতে কষ্ট হয়, যে-ই পড়ে যাক না কেন, এবং এর জন্য যে মূল্যই দিতে হোক না কেন।



পরিকল্পিত যুদ্ধ

ফুটবলে, যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক উত্তরণ, হাফপ্যান্ট পরা এগারোজন পুরুষই হলো তলোয়ার।
আমি পাড়া, শহর বা দেশের। এই যোদ্ধারা ছাড়া
অস্ত্র বা বর্ম জনতার অসুরদের বিতাড়িত করে এবং তাদের বিশ্বাসকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে: দুই পক্ষের প্রতিটি সংঘর্ষে, পিতা থেকে পুত্রে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পুরোনো ঘৃণা ও পুরোনো ভালোবাসা দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়।

স্টেডিয়ামটিতে দুর্গের মতো মিনার ও ব্যানার রয়েছে, সেইসাথে মাঠের চারপাশে একটি গভীর ও প্রশস্ত পরিখা আছে। মাঝখানে, একটি সাদা রেখা বিবাদমান এলাকাগুলোকে বিভক্ত করে। প্রতিটি প্রান্তে উড়ন্ত বল দিয়ে আঘাত হানার জন্য গোলপোস্ট রয়েছে। গোলপোস্টগুলোর ঠিক সামনের এলাকাটিকে “বিপজ্জনক অঞ্চল” বলা হয়।

মাঠের মাঝের বৃত্তে, প্রথা অনুযায়ী অধিনায়কেরা পতাকা বিনিময় করেন এবং হাত মেলান। রেফারি বাঁশি বাজান এবং বলটি, যেন আরেক শিস দেওয়া বাতাস, চলতে শুরু করে। বলটি এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে, একজন খেলোয়াড় তাকে কাবু করে ফেলে এবং ঘোরাতে থাকে, যতক্ষণ না সে এক ট্যাকলে প্রচণ্ড মার খেয়ে হাত-পা ছড়িয়ে মাটিতে পড়ে যায়। শিকারটি আর ওঠে না। সবুজ প্রান্তরের বিশালতায় খেলোয়াড়টি উপুড় হয়ে পড়ে থাকে। গ্যালারির বিশালতা থেকে কণ্ঠস্বর গর্জে ওঠে। প্রতিপক্ষ দলের সমর্থকেরা বন্ধুত্বপূর্ণ গর্জন করে ওঠে: “মরে যা!”

“দেবী মোরিরে!”
“Tuez-le!”
“Mach ihn nieder!”
ওকে মরতে দাও!
মারো, মারো, মারো!

যুদ্ধের ভাষা

ইউ তাদের পরিকল্পিত কৌশলের একটি উপযুক্ত কৌশলগত রূপ ব্যবহার করে, আমাদের দলটি ঝাঁপিয়ে পড়ে আক্রমণ করল, শত্রুকে অপ্রস্তুত অবস্থায় হতবাক করে দিয়ে। এটা ছিল এক নৃশংস আক্রমণ। যখন স্বদেশের সৈন্যরা শত্রুর এলাকায় প্রবেশ করল, আমাদের দুর্গ ভাঙার যন্ত্রটি প্রতিরক্ষা প্রাচীরের সবচেয়ে দুর্বল অংশে একটি ফাটল তৈরি করে বিপদজনক এলাকায় প্রবেশ করল। গোলন্দাজটি গোলাটি গ্রহণ করে নিপুণ কৌশলে গুলি করার অবস্থানে চলে গেল, চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হলো এবং একটি কামানের গোলা দিয়ে প্রহরীকে নিশ্চিহ্ন করে আক্রমণটির চূড়ান্ত পরিণতি ঘটাল। তারপর, আপাতদৃষ্টিতে দুর্ভেদ্য দুর্গের রক্ষক, পরাজিত প্রহরীটি দুহাতে মুখ ঢেকে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল, আর যে জল্লাদ তাকে গুলি করেছিল, সে উল্লাসিত জনতার উদ্দেশে হাত তুলে ধরল।

শত্রু পিছু হটেনি, কিন্তু তাদের পদদলন আমাদের পরিখায় আতঙ্ক ছড়াতে পারেনি, এবং বারবার তারা আমাদের সুসজ্জিত পশ্চাৎরক্ষী বাহিনীর উপর আছড়ে পড়ছিল। তাদের সৈন্যরা ভেজা বারুদ দিয়ে গুলি চালাচ্ছিল, আমাদের সিংহের মতো লড়া গ্ল্যাডিয়েটরদের বীরত্বের কাছে তারা শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল। যখন আমাদের দুজন সৈন্য লড়াই থেকে ছিটকে পড়ল, জনতা বৃথা সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানাল, কিন্তু যুদ্ধের উপযোগী এবং ফুটবলের মতো মহৎ খেলার ভদ্রোচিত নিয়মের প্রতি অসম্মানজনক এই ধরনের নৃশংসতা বিনা শাস্তিতে চলতেই থাকল।

অবশেষে, যখন বধির ও অন্ধ রেফারি প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ঘোষণা করলেন, একটি যথার্থ বাঁশির শব্দে পরাজিত দলটিকে বিদায় জানানো হলো। তারপর বিজয়ী জনতা দুর্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল এই মহাকাব্যিক কীর্তি, এই মহৎ কীর্তি, এই মহান কীর্তির এগারোজন বীরকে কাঁধে তুলে নিতে, যার জন্য ব্যয় হয়েছিল অজস্র রক্ত, ঘাম আর অশ্রু। আর আমাদের অধিনায়ক, আমাদের পিতৃভূমির সেই পতাকায় আবৃত হয়ে, যা পরাজয়ের দ্বারা আর কখনো কলঙ্কিত হবে না, ট্রফিটি তুলে ধরলেন এবং সেই মহান রূপার পেয়ালায় চুম্বন করলেন। সে ছিল গৌরবের চুম্বন!

স্টেডিয়াম

এইচ আপনি কি কখনো কোনো খালি স্টেডিয়ামে ঢুকেছেন? একবার চেষ্টা করে দেখুন। মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ান। মাঠের দিকে তাকাও এবং শোনো। একটি শূন্যের চেয়ে কম শূন্য আর কিছুই নেই। স্টেডিয়াম। দর্শকশূন্য গ্যালারির চেয়ে নীরব আর কিছুই নেই।

ওয়েম্বলিতে, ইংল্যান্ডের জেতা ১৯৬৬ বিশ্বকাপের উল্লাসধ্বনি এখনও প্রতিধ্বনিত হয়, এবং খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলে ১৯৫৩ সালের সেই আর্তনাদও শোনা যায়, যখন হাঙ্গেরির কাছে ইংল্যান্ড হেরে গিয়েছিল। মন্টেভিডিওর সেন্টেনারিও স্টেডিয়াম উরুগুয়ের ফুটবলের গৌরবময় দিনগুলোর স্মৃতিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। মারাকানা এখনও ব্রাজিলের ১৯৫০ বিশ্বকাপের পরাজয়ে কাঁদছে। বুয়েনস আইরেসের বোমবোনেরায় অর্ধশতাব্দী আগের ঢাকের গর্জন শোনা যায়। অ্যাজটেকা স্টেডিয়ামের গভীর থেকে প্রাচীন মেক্সিকান বল খেলার আনুষ্ঠানিক ধ্বনি শোনা যায়। বার্সেলোনার ক্যাম্প ন্যু-এর কংক্রিটের গ্যালারিগুলো কাতালান ভাষায় কথা বলে, এবং বিলবাওয়ের সান মামেসের স্ট্যান্ডগুলো বাস্ক ভাষায় কথা বলে। মিলানে, জিউসেপ্পে মেয়াৎসার প্রেতাত্মা এমন সব গোল করে যা তার নামে থাকা স্টেডিয়ামটিকে কাঁপিয়ে দেয়।

জার্মানির জেতা ১৯৭৪ বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচটি মিউনিখের অলিম্পিক স্টেডিয়ামে দিনরাত ধরে খেলা হয়। সৌদি আরবের কিং ফাহদ স্টেডিয়ামে মার্বেল ও সোনার বক্স এবং কার্পেট পাতা গ্যালারি আছে, কিন্তু এর কোনো স্মৃতি নেই, বলার মতোও তেমন কিছু নেই।

বল

টি চীনারা চামড়া দিয়ে তৈরি এবং শণ দিয়ে ভরা একটি বল ব্যবহার করত। ফারাওদের সময়ে মিশরীয়রা খড় দিয়ে তৈরি একটি বল ব্যবহার করত অথবা রঙিন কাপড়ে মোড়ানো বীজের খোসা। গ্রিক ও রোমানরা ষাঁড়ের মূত্রথলি ফুলিয়ে সেলাই করে বন্ধ করে দিত। মধ্যযুগ ও রেনেসাঁর ইউরোপীয়রা ঘোড়ার চুলে ভরা ডিম্বাকৃতির বল দিয়ে খেলত।

আমেরিকায় বলটা রাবারের তৈরি ছিল এবং অন্য যেকোনো জায়গার চেয়ে ভালোভাবে লাফাতো। স্প্যানিশ রাজসভার ইতিহাসবিদরা বর্ণনা করেন, কীভাবে হের্নান কোর্তেস সম্রাট চার্লসের বিস্ফারিত চোখের সামনে একটি মেক্সিকান বলকে উঁচুতে বাতাসে ছুড়ে দিয়েছিলেন।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে, কানেকটিকাটের আমেরিকান চার্লস গুডইয়ারের প্রতিভার বদৌলতে, বাতাসে স্ফীত ও চামড়ায় মোড়ানো রাবারের চেম্বারটির জন্ম হয়। এবং তার অনেক পরে, কর্ডোবার তিন আর্জেন্টাইন তোসোলিনি, ভালবোনেসি ও পোলোর প্রতিভার বদৌলতে ফিতাবিহীন বলের জন্ম হয়। তাঁরা ইনজেকশনের মাধ্যমে স্ফীত করা যায় এমন একটি ভালভযুক্ত চেম্বার আবিষ্কার করেন, এবং ১৯৩৮ সালের বিশ্বকাপ থেকে, একসময় বলকে বেঁধে রাখা ফিতার আঘাত ছাড়াই হেড করা সম্ভব হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বলটি বাদামী রঙের ছিল। তারপর সাদা। আজকাল এটি সাদা পটভূমিতে কালো রঙের বিভিন্ন নকশায় পাওয়া যায়। এখন এর কোমর ষাট সেন্টিমিটার এবং এটি পলিথিন ফোমের উপর পলিইউরেথেন দিয়ে মোড়ানো থাকে। জলরোধী এই বলটির ওজন এক পাউন্ডেরও কম এবং এটি পুরনো চামড়ার বলের চেয়ে দ্রুত চলে, যা বৃষ্টির দিনে প্রায় নড়তই না।

একে নানা নামে ডাকা হয়: গোলক, গোলাকার, যন্ত্র, গ্লোব, বেলুন, প্রক্ষেপণ বস্তু। ব্রাজিলে বল যে একজন নারী, এ নিয়ে কারও কোনো সন্দেহ নেই। ব্রাজিলিয়ানরা তাকে মোটাসোটা (গোরডুচিনহা) বা বাচ্চা (মেনিনা) বলে ডাকে এবং মারিকোটা, লিওনর বা মার্গারিটার মতো নাম রাখে।

পেলে মারাকানায় তাঁর হাজারতম গোল করার পর তাঁকে চুম্বন করেছিলেন এবং দি স্তেফানো তাঁর বাড়ির সামনে তাঁর জন্য একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন, একটি ব্রোঞ্জের বল।

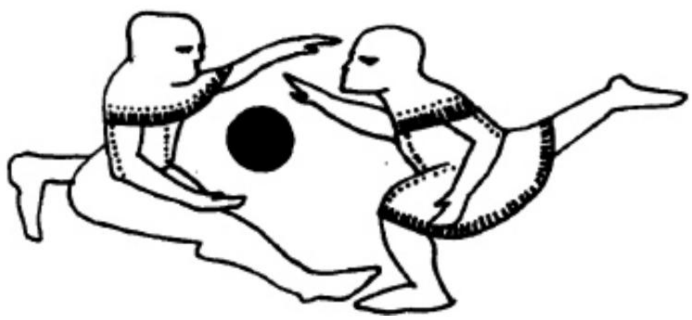
ফলকটিতে লেখা আছে: ধন্যবাদ, বুড়ি।

সে অনুগত। ১৯৩০ সালের বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচে, উভয় দলই নিজেদের বল দিয়ে খেলার জন্য জেদ ধরেছিল। সলোমনের মতো বিচক্ষণ রেফারি সিদ্ধান্ত নিলেন যে প্রথমার্ধ আর্জেন্টিনার বল দিয়ে এবং দ্বিতীয়ার্ধ উরুগুয়ের বল দিয়ে খেলা হবে। আর্জেন্টিনা প্রথমার্ধে জিতেছিল এবং উরুগুয়ে দ্বিতীয়ার্ধে। বলও খামখেয়ালী হতে পারে; মাঝপথে মন পরিবর্তন করে বাঁক খেয়ে দূরে সরে যাওয়ায় সে গোলে প্রবেশ করতে অস্বীকার করে। আসলে, সে খুব সহজেই অপমানিত হয়। বিদ্বেষবশত লাথি বা আঘাত সে একদম সহ্য করতে পারে না। সে চায় তাকে আদর করা হোক, চুম্বন করা হোক, বুকে বা পায়ে জড়িয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হোক। সে গর্বিত, হয়তো কিছুটা অহংকারীও, এবং এর কারণ বোঝা সহজ: সে খুব ভালো করেই জানে যে যখন সে সুরুচিপূর্ণভাবে ওঠে, তখন সে বহু হৃদয়ে আনন্দ নিয়ে আসে, আবার যখন সে বাজেভাবে অবতরণ করে, তখন বহু হৃদয় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়।



মিং রাজবংশের এই খোদাইচিত্রটি পঞ্চদশ শতাব্দীর, কিন্তু বলটি অ্যাডিডাসের তৈরিও হতে পারত।





দুটি ঐতিহাসিক চিত্র। প্রথমটি মেক্সিকোর তেওতিহুয়াকানের তেপানতিতলায় হাজার বছরেরও বেশি আগে আঁকা একটি ম্যুরালের খণ্ডাংশ: যেখানে হুগো সানচেজের পূর্বপুরুষ তাঁর বাম হাত দিয়ে বল চালনা করছেন। দ্বিতীয়টি ইংল্যান্ডের গ্লস্টারের ক্যাথেড্রালের একটি মধ্যযুগীয় রিলিফ ভাস্কর্যের শৈল্পিক অঙ্কন।



উৎপত্তি

ফুটবলে, অন্য প্রায় সবকিছুর মতোই, চীনারা প্রথম ছিল। পাঁচ
আমি হাজার বছর আগে, চীনা জাগলারদের পায়ের উপর বল নাচত,
এবং অচিরেই তারা প্রথম ম্যাচগুলোর আয়োজন করল। মাঠের মাঝখানে জাল পাতা ছিল এবং খেলোয়াড়দের হাত ব্যবহার না করে বলটিকে মাটিতে পড়তে না দেওয়ার জন্য আটকাতে হতো। খেলাটি এক রাজবংশ থেকে আরেক রাজবংশে প্রচলিত ছিল, যার প্রমাণ মেলে খ্রিস্টপূর্ব যুগের কিছু ভাস্কর্য স্মৃতিস্তম্ভে এবং পরবর্তী মিং রাজবংশের খোদাইচিত্রে, যেখানে দেখা যায় মানুষ এমন একটি বল দিয়ে খেলছে যা অ্যাডিডাসের তৈরি বলেও মনে হতে পারে।

আমরা জানি যে প্রাচীনকালে মিশরীয় এবং জাপানিরা বল লাথি মেরে মজা করত। খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ শতাব্দীর একটি গ্রিক সমাধির মার্বেল পৃষ্ঠে একজন মানুষকে হাঁটু দিয়ে বল মারতে দেখা যায়। অ্যান্টিফেনেসের নাটকে "লম্বা বল," "ছোট পাস," এবং "সামনের পাস"-এর মতো তাৎপর্যপূর্ণ অভিব্যক্তি রয়েছে। বলা হয় যে জুলিয়াস সিজার পায়ে খুব দ্রুত ছিলেন এবং নিরো গোল করতে পারতেন না। যাই হোক, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে যিশু যখন ক্রুশে মৃত্যুবরণ করছিলেন, তখন রোমানরা সকারের মতোই কিছু একটা খেলছিল।

রোমান সৈন্যদল বলটিকে লাথি মেরে একেবারে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল। শত শত বছর পরে, ১৩১৪ সালে, রাজা দ্বিতীয় এডওয়ার্ড খেলাটিকে সাধারণ মানুষের খেলা এবং দাঙ্গার আখ্যা দিয়ে একটি রাজকীয় ফরমান জারি করেন: "যেহেতু বড় বড় বল নিয়ে ধাক্কাধাক্কির কারণে শহরে প্রচণ্ড শোরগোল হয়, তা থেকে অনেক অমঙ্গলের উদ্ভব হতে পারে, যা ঈশ্বর না করুন।" ফুটবল, যা তখন এই নামেই পরিচিত ছিল, বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটায়। ম্যাচগুলো দলবদ্ধভাবে খেলা হতো এবং খেলোয়াড়ের সংখ্যা, ম্যাচের দৈর্ঘ্য বা অন্য কোনো কিছুর উপর কোনো সীমা ছিল না।

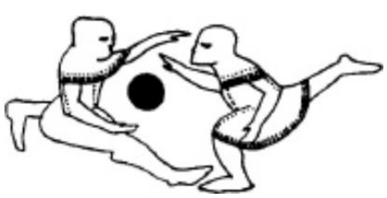
একটি গোটা শহর অন্য একটি শহরের বিরুদ্ধে খেলত, লাথি ও ঘুষি মেরে গোলের দিকে এগিয়ে যেত, যা সেই সময়ে ছিল একটি দূরের উইন্ডমিল। এই ম্যাচগুলো বেশ কয়েকটি লীগ জুড়ে এবং বেশ কয়েক দিন ধরে চলত এবং এতে বহু প্রাণহানি ঘটত। রাজারা বারবার এই রক্তাক্ত খেলাগুলোকে নিষিদ্ধ করেছিলেন: ১৩৪৯ সালে, তৃতীয় এডওয়ার্ড ফুটবলকে "বোকা এবং সম্পূর্ণ অকেজো" খেলার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন, এবং ১৪১০ সালে চতুর্থ হেনরি ও ১৪৪৭ সালে ষষ্ঠ হেনরি এই খেলার বিরুদ্ধে রাজকীয় ফরমান জারি করেন। যত বেশি এটি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, তত বেশি এটি খেলা হয়েছিল, যা কেবল এটাই প্রমাণ করে যে নিষেধাজ্ঞা মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

১৫৯২ সালে 'দ্য কমেডি অফ এররস'- এ শেক্সপিয়ার ফুটবলের দিকে ঝুঁকেছিলেন
একটি চরিত্রের অভিযোগ গঠন করুন:

আমি কি তোমার সাথে ততটাই গোলগাল, যতটা তুমি আমার
সাথে, যে ফুটবলের মতো তুমি আমাকে এভাবে ঝেড়ে ফেলো?
তুমি আমাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিলে, সে আমাকে এখানে তাড়িয়ে দেবে: যদি এই
সেবায় আমি টিকে থাকি, তবে তোমাকে আমাকে চামড়ার আবরণে মোড়াতে হবে।

এবং এর কয়েক বছর পর কিং লিয়ার নাটকে আর্ল অফ কেন্ট বিদ্রূপ করে বলেছিলেন: “নরও হোঁচট খায়নি, তুই একটা নিচু স্তরের ফুটবল খেলোয়াড়!”

ফ্লোরেন্সে ফুটবলকে ক্যালসিও বলা হতো, যেমনটা এখনও সমগ্র ইতালি জুড়ে প্রচলিত। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি ছিলেন এর একনিষ্ঠ অনুরাগী এবং ম্যাকিয়াভেলিও খেলতে ভালোবাসতেন। খেলাটি সাতাশ জন খেলোয়াড়ের তিনটি সারিতে বিভক্ত হয়ে খেলা হতো এবং তাদের বল মারতে ও প্রতিপক্ষের পেটে আঘাত করতে হাত ও পা ব্যবহার করার অনুমতি ছিল। বিশাল চত্বরগুলোতে এবং আর্নো নদীর হিমায়িত জলের উপর অনুষ্ঠিত এই ম্যাচগুলো দেখতে প্রচুর লোক সমাগম হতো। ফ্লোরেন্স থেকে দূরে, ভ্যাটিকানের বাগানে, পোপ সপ্তম ক্লেমেন্ট, নবম লিও এবং অষ্টম আরবান তাদের যাজকীয় পোশাক গুটিয়ে ক্যালসিও খেলতেন।





মেক্সিকো এবং মধ্য আমেরিকায়, প্রায় ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে অনুষ্ঠিত একটি পবিত্র অনুষ্ঠানে সূর্যের পরিবর্তে একটি রাবারের বল ব্যবহৃত হতো। কিন্তু আমেরিকার অনেক জায়গায় ফুটবল কখন শুরু হয়েছিল তা আমরা জানি না। বলিভিয়ার আমাজন অঞ্চলের আদিবাসীরা বলেন যে, তারা স্মরণাতীত কাল থেকে হাত ব্যবহার না করে একটি ভারী রাবারের বলকে তাড়া করে দুটি খুঁটির মাঝে ফেলার চেষ্টা করে আসছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে, উচ্চ পারানার জেসুইট মিশনের একজন স্প্যানিশ যাজক গুয়ারানিদের একটি প্রাচীন প্রথার বর্ণনা দিয়েছিলেন: "তারা আমাদের মতো হাত দিয়ে বল ছোড়ে না; বরং, তারা তাদের খালি পায়ের উপরের অংশ দিয়ে বলটিকে চালিত করে।" মেক্সিকো এবং মধ্য আমেরিকার আদিবাসীদের মধ্যে, বলটি সাধারণত কোমর বা বাহু দিয়ে আঘাত করা হতো, যদিও তেওতিহুয়াকান এবং চিচেন-ইৎজার চিত্রকর্মগুলিতে পা এবং হাঁটু দিয়ে বল লাথি মারতে দেখা যায়। তেপানতিতলায় এক হাজার বছরেরও বেশি আগে তৈরি একটি ম্যুরালে হুগো সানচেজের একজন পূর্বপুরুষকে তার বাম হাত দিয়ে বল চালনা করতে দেখা যায়। খেলাটি শেষ হতো যখন বলটি তার গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছাত: সূর্য মৃত্যুর রাজ্য ভ্রমণ করে ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে এসে পৌঁছাত। তারপর, সূর্যোদয়ের জন্য রক্তের ধারা বইত। যারা এ বিষয়ে জানতেন, তাদের মতে, অ্যাজটেকদের বিজয়ীদের বলি দেওয়ার অভ্যাস ছিল। তাদের মাথা কাটার আগে, তারা শরীরে লাল দাগ এঁকে দিত। দেবতাদের মনোনীতরা তাদের রক্ত উৎসর্গ করত, যাতে পৃথিবী উর্বর হয় এবং স্বর্গ উদার হয়।

খেলার নিয়মাবলী

একটি শতাব্দী ধরে সরকারি অস্বীকৃতির পর, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ অবশেষে তা মেনে নিল। বল তার ভাগ্যে। রানী ভিক্টোরিয়ার আমলে সকারকে গ্রহণ করা হয়নি শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের দোষ হিসেবে নয়, বরং অভিজাতদের গুণ হিসেবে। সমাজের ভবিষ্যৎ নেতারা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ফুটবল খেলে জিততে শিখেছিল। সেখানে উচ্চবিত্ত পরিবারের উচ্ছৃঙ্খল ছেলেরা তাদের তারুণ্যের আবেগ প্রকাশ করত, শৃঙ্খলা শাণিত করত, ক্রোধ সংযত করত এবং বুদ্ধিকে শাণিত করত। সামাজিক স্তরের অপর প্রান্তে থাকা শ্রমিকদের নিজেদের শরীরের সীমা পরীক্ষা করার কোনো প্রয়োজন ছিল না, কারণ সেই কাজের জন্যই ছিল কারখানা ও কর্মশালা। কিন্তু শিল্প পুঁজিবাদের মাতৃভূমি আবিষ্কার করল যে, গণমানুষের আবেগ ফুটবল দরিদ্রদের বিনোদন ও সান্ত্বনা দেয় এবং ধর্মঘট ও অন্যান্য অশুভ চিন্তা থেকে তাদের মনোযোগ সরিয়ে রাখে।

এর আধুনিক রূপটি এসেছে ১৮৬৩ সালের শরৎকালে লন্ডনের একটি পানশালায় বারোটি ইংলিশ ক্লাবের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি ভদ্রস্থ চুক্তি থেকে। ক্লাবগুলো কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুন মেনে চলতে সম্মত হয়েছিল। কেমব্রিজে সকার রাগবি থেকে পৃথক হয়ে যায়: হাতে করে বল বহন করা নিষিদ্ধ ছিল, যদিও তা স্পর্শ করার অনুমতি ছিল, এবং প্রতিপক্ষকে লাথি মারাও নিষিদ্ধ ছিল। একটি নিয়মে সতর্ক করা হয়েছিল, “লাথি শুধুমাত্র বল লক্ষ্য করে মারতে হবে।” দেড় শতাব্দী পরেও কিছু খেলোয়াড় আকৃতির সাদৃশ্যের কারণে বলকে তাদের প্রতিপক্ষের মাথার খুলি বলে ভুল করে।

লন্ডন চুক্তি অনুযায়ী খেলোয়াড়ের সংখ্যা, মাঠের আকার, গোলের উচ্চতা বা খেলার দৈর্ঘ্যের উপর কোনো সীমা ছিল না। ম্যাচগুলো দুই বা তিন ঘণ্টা ধরে চলত এবং যখনই বল দূরে উড়ে যেত, খেলোয়াড়রা গল্পগুজব ও ধূমপান করত। একটি আধুনিক নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল: অফসাইড। প্রতিপক্ষের পেছন থেকে গোল করাটা ছিল বিশ্বাসঘাতকতা।

সেই দিনগুলিতে মাঠে কেউ কোনো নির্দিষ্ট অবস্থানে খেলত না। তারা সবাই আনন্দের সাথে বলের পিছনে ছুটত, প্রত্যেকে যেখানে খুশি যেত, এবং প্রত্যেকেই ইচ্ছামতো অবস্থান পরিবর্তন করত। ১৮৭০ সালের দিকে রক্ষণভাগ, মধ্যমাঠ এবং আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের নিয়ে দল গঠনের দায়িত্ব স্কটল্যান্ডের উপর বর্তায়। ততদিনে প্রতিটি দলে এগারোজন খেলোয়াড় থাকত। ১৮৬৯ সাল থেকে তাদের কেউই হাত দিয়ে বল স্পর্শ করতে পারত না, এমনকি ধরার জন্যও নয়।

এবং কিক করার জন্য বলটা নামিয়ে দেওয়া। ১৮৭১ সালে সেই নিষেধাজ্ঞার ব্যতিক্রমের জন্ম হয়: গোলরক্ষক গোল রক্ষার জন্য তার পুরো শরীর ব্যবহার করতে পারতেন।



গোলরক্ষক আজকের দিনের চেয়ে সংকীর্ণ এবং অনেক উঁচু একটি বর্গাকার দুর্গ রক্ষা করতেন। এটি মাটি থেকে সাড়ে পাঁচ মিটার উঁচুতে একটি বেল্ট দিয়ে যুক্ত দুটি খুঁটি নিয়ে গঠিত ছিল। ১৮৭৫ সালে বেল্টটির পরিবর্তে একটি কাঠের ক্রসবার বসানো হয়। খুঁটিগুলোর উপরেই একটি ছোট খাঁজ কেটে আক্ষরিক অর্থেই গোল করা হতো। বর্তমানে গোলগুলো ইলেকট্রনিক স্কোরবোর্ডে নথিভুক্ত করা হয়, কিন্তু “গোল করা” এই অভিব্যক্তিটি রয়ে গেছে। কিছু দেশে আমরা গোলমুখকে ‘ আর্কো’ এবং যে এটি রক্ষা করে তাকে ‘ আর্কেরো’ বলি, যদিও এটি সম্পূর্ণ সমকোণ এবং মোটেও কোনো খিলান নয়; সম্ভবত এর কারণ হলো, ইংল্যান্ডের কলেজগুলোর ছাত্ররা উঠোনের খিলানগুলোকে গোলপোস্ট হিসেবে ব্যবহার করত।

১৮৭২ সালে রেফারির আবির্ভাব ঘটে। তার আগে পর্যন্ত খেলোয়াড়েরাই ছিলেন নিজেদের বিচারক, এবং সংঘটিত যেকোনো ফাউলের শাস্তি তারাই দিতেন। ১৮৮০ সালে, হাতে ক্রোনোমিটার নিয়ে রেফারিই ঠিক করতেন কখন ম্যাচ শেষ হবে এবং কখন কাউকে মাঠ থেকে বের করে দেওয়া হবে, যদিও তিনি তখনও মাঠের পাশ থেকে চিৎকার করেই সবকিছু পরিচালনা করতেন। ১৮৯১ সালে রেফারি প্রথমবারের মতো খেলার মাঠে পা রাখেন; ইতিহাসের প্রথম পেনাল্টি কিকের ডাক দিতে তিনি বাঁশি বাজান এবং কিকটি নেওয়ার স্থান নির্দেশ করতে বারো কদম হাঁটেন। বেশ কিছুদিন ধরে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম পেনাল্টির পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছিল, কারণ গোলপোস্টের সামনে খেলোয়াড়দের কিছু সুরক্ষার প্রয়োজন ছিল, যা ছিল এক অবিশ্বাস্য হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য। ওয়েস্টমিনস্টার গেজেটে নিহত খেলোয়াড় এবং ভাঙা হাড়ের এক লোমহর্ষক তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল।

১৮৮২ সালে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ‘থ্রো-ইন’ পদ্ধতির অনুমতি দেয়। আট বছর পর মাঠের এলাকাগুলো চুন দিয়ে চিহ্নিত করা হয় এবং একটি বৃত্ত আঁকা হয়।

কেন্দ্র। সেই একই বছরে গোলপোস্টে একটি জাল লাগানো হয়, যা বলকে আটকে দিত এবং গোল হয়েছে কি না, সে বিষয়ে সমস্ত সন্দেহ দূর করে দিত।

এরপর সেই শতাব্দীর অবসান ঘটল, এবং তার সাথে ব্রিটিশ একাধিপত্যেরও। ১৯০৪ সালে ফিফা (Fédération Internationale de Football Association)-এর জন্ম হয়, যা তখন থেকে সারা বিশ্বে বল ও পায়ের সম্পর্ক পরিচালনা করে আসছে। সমস্ত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জুড়ে, খেলাটিকে প্রথম সংগঠিত করা ব্রিটিশ নিয়মগুলিতে সামান্যই পরিবর্তন আনা হয়েছে।



ইংরেজ আক্রমণ

ও বুয়েনস আইরেসের একটি পাগলাগারদের বাইরে, একটি খালি জায়গায়, কয়েকজন স্বর্ণকেশী ছেলেরা বল নিয়ে খেলছিল।

"ওরা কারা?" একটি শিশু জিজ্ঞাসা করল।

"পাগল লোক," তার বাবা উত্তর দিলেন। "পাগল ইংরেজ।"

সাংবাদিক হুয়ান হোসে দে সোইজা রেইলি তাঁর শৈশবের এই ঘটনাটি স্মরণ করেন। শুরুতে, রিভার প্লেটে ফুটবলকে এক পাগলের খেলা বলে মনে হতো। কিন্তু সাম্রাজ্য বিস্তারের সাথে সাথে, ফুটবল ম্যানচেস্টারের কাপড়, রেলপথ, বেয়ারিংসের ঋণ বা মুক্ত বাণিজ্য নীতির মতোই একটি ব্রিটিশ রপ্তানি পণ্যে পরিণত হয়। এটি বুয়েনস আইরেস এবং মন্টেভিডিওর বাঁধের ধারে খেলা নাবিকদের পায়ে ভর করে পৌঁছেছিল, যখন মহারানী ভিক্টোরিয়ার জাহাজগুলো কম্বল, বুট এবং ময়দা খালাস করত এবং পৃথিবীর অপর প্রান্তে আরও কম্বল, বুট এবং ময়দা তৈরির জন্য পশম, চামড়া এবং গম বোঝাই করত। ইংরেজ নাগরিকরা—কূটনীতিক এবং রেলপথ ও গ্যাস কোম্পানির ব্যবস্থাপকরা—প্রথম স্থানীয় দলগুলো গঠন করেন। মন্টেভিডিও এবং বুয়েনস আইরেসের ইংরেজরা ১৮৮৯ সালে উরুগুয়ের প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে, যেখানে রানী ভিক্টোরিয়ার একটি বিশাল প্রতিকৃতি ছিল, যার চোখ অবজ্ঞার মুখোশে নত ছিল। সমুদ্রের রানীর আরেকটি প্রতিকৃতি ১৮৯৫ সালে প্রথম ব্রাজিলিয়ান ফুটবল ম্যাচের তত্ত্বাবধান করেছিল, যা গ্যাস কোম্পানি এবং সাও পাওলো রেলওয়ের ব্রিটিশ প্রজাদের মধ্যে খেলা হয়েছিল।

পুরোনো ছবিগুলোতে এই অগ্রগামীদের সেপিয়া টোনে দেখা যায়। তারা ছিলেন যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষিত যোদ্ধা। তুলা ও পশমের বর্ম তাদের পুরো শরীর ঢেকে রাখত, যাতে...

উপস্থিত মহিলাদের অসন্তুষ্ট না করার জন্য, যাঁরা রেশমি ছাতা মেলে ধরেছিলেন এবং লেসের রুমাল নাড়াচ্ছিলেন। খেলোয়াড়দের শরীরের কেবল সেই অংশটুকুই উন্মুক্ত ছিল যা টুপি বা হ্যাটের নিচে মোম দিয়ে পাকানো গোঁফের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছিল তাদের গম্ভীর মুখগুলো।
তাদের পায়ে ভারী ম্যান্সফিল্ড জুতো পরানো ছিল।

এই সংক্রামক খেলাটি ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগেনি। অচিরেই, স্থানীয় সমাজের জন্মসূত্রে ভদ্রলোকেরা সেই অদ্ভুত ইংরেজ খেলাটি খেলতে শুরু করলেন। লন্ডন থেকে তারা শার্ট, জুতো, মোটা গোড়ালি মোজা এবং বুক থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত লম্বা প্যান্ট আমদানি করল। বলগুলো আর শুল্ক কর্মকর্তাদের বিভ্রান্ত করত না, যারা প্রথমে এই বস্তুটিকে কীভাবে শ্রেণীবদ্ধ করতে হয় তা জানত না। জাহাজগুলো দক্ষিণ আমেরিকার এই সুদূর উপকূলে খেলার নিয়মাবলীও নিয়ে এসেছিল, এবং তার সাথে এমন কিছু শব্দও এসেছিল যা বহু বছর ধরে প্রচলিত ছিল: ফিল্ড, স্কোর, গোল, গোলকিপার, ব্যাক, হাফ, ফরোয়ার্ড, আউট বল, পেনাল্টি, অফসাইড।

রিভার প্লেটে প্রচলিত প্রথম ফুটবল নিয়মাবলী অনুসারে, একটি 'ফাউল'-এর জন্য 'রেফারি' কর্তৃক শাস্তি প্রাপ্য ছিল, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত খেলোয়াড় দোষী পক্ষের কাছ থেকে ক্ষমা গ্রহণ করতে পারতেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত সেই ক্ষমা আন্তরিক হতো এবং সঠিক ইংরেজিতে প্রকাশ করা হতো'।

ইতিমধ্যে, ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের লাতিন আমেরিকান দেশগুলোর কথ্য ভাষায় অন্যান্য ইংরেজি শব্দও অন্তর্ভুক্ত হচ্ছিল: পিচার, ক্যাচার, ইনিংস। মার্কিন প্রভাবাধীন হয়ে এই দেশগুলো গোল কাঠের ব্যাট দিয়ে বল মারতে শিখেছিল। মেরিন সেনারা যখন রক্ত ও আগুনের মাধ্যমে এই অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল, তখন তারা তাদের রাইফেলের পাশে ব্যাটও কাঁধে তুলে নিত।

ক্যারিবীয় অঞ্চলের মানুষের জন্য বেসবল ঠিক তেমনই হয়ে উঠেছে, যেমনটা আমাদের জন্য ফুটবল।



ক্রিওল সকার

টি আর্জেন্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন স্প্যানিশদের অনুমতি দেয়নি এর পরিচালকদের সভায় এবং উরুগুয়ে অ্যাসোসিয়েশনে বক্তব্য রাখেন। ফুটবল লীগ রবিবারের ম্যাচ নিষিদ্ধ করেছিল, কারণ শনিবারে খেলাটা ছিল ব্রিটিশদের প্রথা। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, রিভার প্লেটের তীরে সকার একটি জনপ্রিয় ও স্থানীয় খেলায় পরিণত হচ্ছিল। এই খেলাটি, যা প্রথমে অবস্থাপন্নদের অলস সন্তানদের বিনোদনের জন্য আমদানি করা হয়েছিল, তা তার উঁচু গণ্ডি পেরিয়ে মাটিতে নেমে এসেছিল এবং শিকড় গাড়তে শুরু করেছিল।

এই প্রক্রিয়াটি ছিল অপ্রতিরোধ্য। ট্যাঙ্গো নৃত্যের মতোই, ফুটবলও বস্তিগুলোতে বিকশিত হয়েছিল। এর জন্য কোনো অর্থের প্রয়োজন ছিল না এবং শুধুমাত্র প্রবল ইচ্ছাশক্তি দিয়েই এটি খেলা যেত। মাঠে, গলিতে এবং সৈকতে, স্থানীয় ছেলেমেয়েরা আর তরুণ অভিবাসীরা পুরোনো মোজার ভেতরে ছেঁড়া কাপড় বা কাগজ ভরে তৈরি বল এবং গোলপোস্ট হিসেবে দুটো পাথর দিয়ে খেলা খেলত। ফুটবলের ভাষার কল্যাণে, যা শীঘ্রই সর্বজনীন হয়ে উঠেছিল, গ্রাম থেকে বিতাড়িত শ্রমিকরা ইউরোপ থেকে বিতাড়িত শ্রমিকদের সাথে অনায়াসে যোগাযোগ করতে পারত। বলের এই এস্পেরান্তো ভাষা স্থানীয় দরিদ্রদের সাথে সেইসব পেওনদের সংযুক্ত করেছিল, যারা আমেরিকা গড়ার স্বপ্ন নিয়ে ভিগো, লিসবন, নেপলস, বৈরুত বা বেসারাবিয়া থেকে সমুদ্র পার হয়ে এসেছিল—ইট বিছিয়ে, বোঝা বহন করে, রুটি সেঁকে বা রাস্তা ঝাড়ু দিয়ে এক নতুন বিশ্ব গড়ার স্বপ্ন নিয়ে। ফুটবল এক মনোরম যাত্রা সম্পন্ন করেছিল: প্রথমে ইংল্যান্ডের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সংগঠিত হয়ে, এটি দক্ষিণ আমেরিকানদের জীবনে আনন্দ এনেছিল, যারা কখনো কোনোদিন স্কুলে পা রাখেনি।

বুয়েনস আইরেস এবং মন্টেভিডিওর খেলার মাঠে একটি শৈলীর জন্ম হয়েছিল। ফুটবল খেলার এক দেশীয় পদ্ধতি, ঠিক যেমন মিলোঙ্গা ক্লাবগুলোতে নাচের দেশীয় পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছিল। নর্তকরা একটিমাত্র মেঝের টালির ওপর সূক্ষ্ম নকশা আঁকত এবং ফুটবল খেলোয়াড়রা সেই ক্ষুদ্র পরিসরে তাদের নিজস্ব ভাষা তৈরি করেছিল, যেখানে তারা বল লাথি মারার পরিবর্তে তা ধরে রাখতে ও অধিকার করতে বেছে নিয়েছিল, যেন তাদের পা দুটি চামড়া বুনে চলা হাত। প্রথম ক্রেওল গুণীজনদের পায়েই জন্ম হয়েছিল 'এল তোকে', অর্থাৎ স্পর্শের: বলটিকে এমনভাবে বাজানো হতো যেন তা একটি গিটার, সঙ্গীতের এক উৎস।

একই সময়ে, রিও ডি জেনেইরো এবং সাও পাওলোতে দরিদ্রদের দ্বারা ফুটবলের স্থানীয়করণ ঘটছিল, যারা এটিকে আত্মসাৎ করার পাশাপাশি সমৃদ্ধও করেছিল। অনুকরণ করে খেলা মুষ্টিমেয় সচ্ছল যুবকদের সম্পত্তি না থেকে, এই বিদেশী খেলাটি ব্রাজিলীয় হয়ে উঠল, যা একে আবিষ্কার করা মানুষদের সৃজনশীল শক্তিতে উর্বর হয়েছিল। আর এভাবেই জন্ম হয়েছিল বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর ফুটবলের, যা নিতম্বের মোচড়, ধড়ের ঢেউ এবং উড়ন্ত পায়ের চালনায় গঠিত; যার সবকিছুই এসেছিল কৃষ্ণাঙ্গ দাসদের যোদ্ধাদের নৃত্য 'ক্যাপোইরা ' এবং বড় শহরের বস্তিগুলোর আনন্দময় নাচের পদক্ষেপ থেকে।

ফুটবল যখন একটি জনপ্রিয় নেশায় পরিণত হলো এবং এর লুকানো সৌন্দর্য উন্মোচিত হলো, তখন এটি একটি মর্যাদাপূর্ণ বিনোদন হিসেবে তার যোগ্যতা হারাল। ১৯১৫ সালে ফুটবলের গণতন্ত্রীকরণ রিও ডি জেনিরোর ' স্পোর্টস' পত্রিকায় অভিযোগের জন্ম দেয়: “আমাদের মধ্যে যাদের সমাজে একটি নির্দিষ্ট অবস্থান আছে, তারা শ্রমিক, চালকদের সাথে খেলতে বাধ্য হচ্ছি। ... এই খেলাটি একটি যন্ত্রণা, একটি ত্যাগ হয়ে উঠছে, কখনোই বিনোদন নয়।”

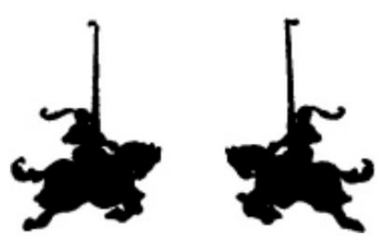
ফ্লা এবং ফ্লুর গল্প

টি ১৯১২ সালে ব্রাজিলীয় ফুটবলের ইতিহাসে প্রথম ক্লাসিক ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল: প্রথম ফ্লা-ফ্লু। ফ্লুমিনেন্সে ৩-২ ব্যবধানে ফ্লামেঙ্গোকে হারিয়েছে।

এটি ছিল এক উত্তেজনাপূর্ণ ও হিংস্র ম্যাচ, যার কারণে দর্শকদের মধ্যে অনেকেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। বক্সগুলো ফুল, ফল, পালক, অবসন্ন মহিলা এবং কোলাহলপূর্ণ পুরুষদের দিয়ে সাজানো ছিল। পুরুষরা যখন প্রতিটি গোল উদযাপন করতে তাদের খড়ের টুপি খেলার মাঠে ছুঁড়ে ফেলছিলেন, তখন মহিলারা তাদের পাখা ফেলে দিচ্ছিলেন এবং গোলের উত্তেজনায় অথবা গরম ও কর্সেটের চাপে ভেঙে পড়ছিলেন।

এর কিছুদিন আগেই ফ্লামেঙ্গোর জন্ম হয়েছিল, যখন অনেক দম্ভোক্তি আর অশেষ প্রসব যন্ত্রণার পর ফ্লুমিনেন্স বিভক্ত হয়ে যায়। শীঘ্রই বাবার আফসোস হলো যে তিনি তাঁর এই চালাক ছেলেকে দোলনাতেই শ্বাসরোধ করে হত্যা করেননি, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল।
ফ্লুমিনেন্স নিজেই নিজের অভিশাপ ডেকে এনেছিল এবং কিছুই করার ছিল না।

তারপর থেকে, বাবা ও ছেলে—বিদ্রোহী ছেলে, পরিত্যক্ত বাবা—পরস্পরকে ঘৃণা করার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে। প্রতিটি ফ্লা-ফ্লু ক্লাসিক যেন এক অন্তহীন যুদ্ধের নতুন এক লড়াই। দুজনেই ভালোবাসে একই শহরকে—অলস, পাপী রিও ডি জেনেইরোকে; এমন এক শহর যা অলসভাবে নিজেকে ভালোবাসতে দেয়, দুজনের সাথেই খেলা করে কিন্তু কারোর কাছেই আত্মসমর্পণ করে না। বাবা ও ছেলে সেই প্রেমিকার জন্য অভিনয় করে, যে তাদের নিয়ে খেলা করে। তার জন্যই তারা লড়াই করে, আর সে প্রতিটি দ্বন্দ্বে পার্টির সাজে উপস্থিত হয়।



জনগণের আফিম?

এইচ ফুটবল কীভাবে ঈশ্বরের মতো? প্রতিটিই বিশ্বাসীদের মধ্যে ভক্তি জাগিয়ে তোলে এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অবিশ্বাস।

১৯০২ সালে লন্ডনে রুডইয়ার্ড কিপলিং ফুটবল এবং যারা 'গোলের কাছে থাকা কাদামাখা আনাড়িদের' নিয়ে সন্তুষ্ট থাকত, তাদের নিয়ে ঠাট্টা করেছিলেন। এর পঁচাত্তর বছর পর বুয়েনস আইরেসে হোর্হে লুইস বোর্হেস ছিলেন আরও সূক্ষ্ম: ১৯৭৮ সালের বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা যখন তাদের প্রথম ম্যাচ খেলছিল, ঠিক সেই দিনে ও সেই সময়েই তিনি অমরত্ব বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন।

অনেক রক্ষণশীল বুদ্ধিজীবীর বিদ্রূপের কারণ হলো তাদের এই বিশ্বাস যে, ফুটবলের প্রতি অন্ধ ভক্তি ঠিক সেই কুসংস্কার যা মানুষের প্রাপ্য।
বলের নেশায় মত্ত হয়ে খেটে খাওয়া মানুষগুলো পা দিয়েই চিন্তা করে, যা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, এবং আদিম উন্মাদনায় তাদের স্বপ্ন পূরণ করে। পশু প্রবৃত্তি মানব বিবেককে ছাপিয়ে যায়, অজ্ঞতা সংস্কৃতিকে পিষে ফেলে, এবং অসভ্যরা যা চায় তা পেয়ে যায়।



এর বিপরীতে, অনেক বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ফুটবলকে হেয় করেন, কারণ এটি জনগণকে নপুংসক করে তোলে এবং তাদের বিপ্লবী উদ্দীপনাকে বিপথে চালিত করে। রুটি আর সার্কাস, কিন্তু রুটি ছাড়া সার্কাস: বলের দ্বারা সম্মোহিত হয়ে, যা এক বিকৃত আকর্ষণ সৃষ্টি করে, শ্রমিকেরা নিজেদের পরিচয় ভুলে যায় এবং শ্রেণীশত্রুদের দ্বারা ভেড়ার পালের মতো চালিত হতে দেয়।

রিভার প্লেটে, ইংরেজ ও ধনীরা খেলাটির দখল হারানোর পর, রেলপথের কর্মশালা এবং জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্রে প্রথম জনপ্রিয় ক্লাবগুলো সংগঠিত হয়েছিল। বেশ কয়েকজন নৈরাজ্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক নেতা এই ক্লাবগুলোকে ধর্মঘট ঠেকানো এবং শ্রেণি বিভাজন ঢাকার জন্য বুর্জোয়াদের একটি কৌশল হিসেবে নিন্দা করেছিলেন।

সারা বিশ্বে ফুটবলের বিস্তার ছিল নিপীড়িত জনগণকে এক চিরন্তন শৈশবে বন্দী করে রাখার একটি সাম্রাজ্যবাদী কৌশল।

কিন্তু আর্জেন্টিনোস জুনিয়র্স ক্লাবটির জন্ম হয়েছিল সেই নৈরাজ্যবাদী শ্রমিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নিজেদের ‘শিকাগো শহীদ’ নাম দিয়ে, এবং বুয়েনস আইরেসের একটি নৈরাজ্যবাদী গ্রন্থাগারে ‘চাকারিতা’ ক্লাবটি চালু করার জন্য ১লা মে দিনটি বেছে নেওয়া হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর সেই প্রথম বছরগুলোতে, বহু বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ফুটবলকে চেতনার প্রশান্তিদায়ক হিসেবে প্রত্যাখ্যান করার পরিবর্তে এর জয়গান গেয়েছিলেন।

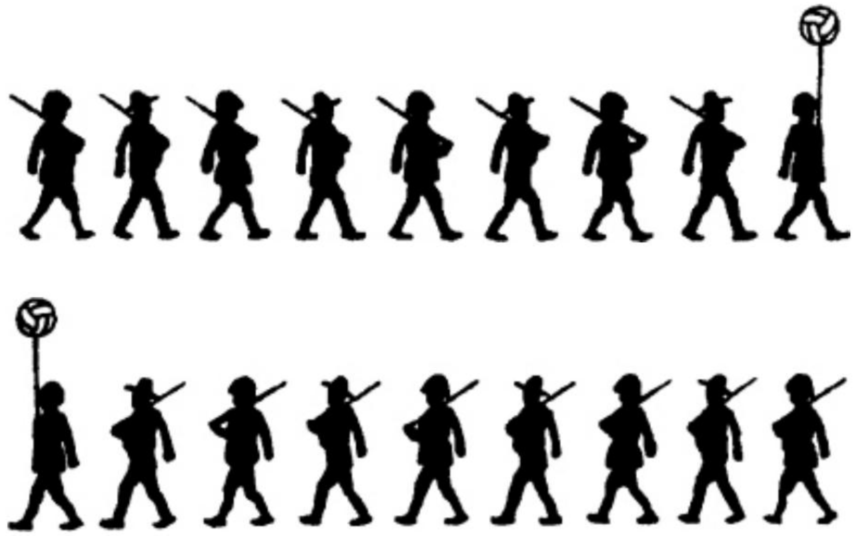
তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইতালীয় মার্ক্সবাদী আন্তোনিও গ্রামসি, যিনি “মানব আনুগত্যের এই উন্মুক্ত রাজ্যের” প্রশংসা করেছিলেন।

একটি চলমান পতাকা

ডি ১৯১৬ সালের গ্রীষ্মকালে, বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন, নেভিল নামের একজন ইংরেজ ক্যাপ্টেন একটি বল লাথি মেরে আক্রমণ শুরু করেছিলেন।
তিনি কিছুটা আড়াল দেওয়া প্রাচীরের পেছন থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এসে বলটিকে তাড়া করে জার্মান পরিখার দিকে ছুটলেন। তার রেজিমেন্ট প্রথমে ইতস্তত করলেও তাকে অনুসরণ করল। ক্যাপ্টেন গোলাগুলির আঘাতে নিহত হন, কিন্তু ইংল্যান্ড সেই নো-ম্যান'স-ল্যান্ড জয় করে নেয় এবং এই যুদ্ধকে সম্মুখ সমরে ব্রিটিশ ফুটবলের প্রথম বিজয় হিসেবে উদযাপন করে।

বহু বছর পরে, শতাব্দীর শেষের দিকে, মিলানের মালিক স্টেডিয়ামগুলো থেকে ভেসে আসা “ফোরজা ইতালিয়া!” ধ্বনির মধ্যে দিয়ে ইতালীয় নির্বাচনে জয়লাভ করেন। সিলভিও বেরলুসকোনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি সর্বকালের সেরা সুপারটিম মিলানকে যেভাবে বাঁচিয়েছিলেন, ঠিক সেভাবেই ইতালিকেও বাঁচাবেন, এবং ভোটাররা ভুলে গিয়েছিল যে তার বেশ কয়েকটি কোম্পানি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ছিল।

ফুটবল এবং স্বদেশ একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, এবং রাজনীতিবিদ ও স্বৈরশাসকরা প্রায়শই পরিচয়ের এই বন্ধনকে কাজে লাগায়। ইতালীয় দল ১৯৩৪ এবং ১৯৩৮ সালের বিশ্বকাপ জিতেছিল স্বদেশ এবং মুসোলিনির নামে, এবং খেলোয়াড়রা প্রতিটি ম্যাচ শুরু ও শেষ করত ডান হাত প্রসারিত করে দর্শকদের অভিবাদন জানিয়ে এবং ইতালির জন্য তিনবার জয়ধ্বনি দিয়ে।



নাৎসিদের কাছেও ফুটবল ছিল রাষ্ট্রের বিষয়। ইউক্রেনে একটি স্মৃতিস্তম্ভে ১৯৪২ সালের ডায়নামো কিয়েভ দলের খেলোয়াড়দের স্মরণ করা হয়। জার্মান দখলদারিত্বের সময় তারা স্থানীয় স্টেডিয়ামে হিটলারের দলকে পরাজিত করার মতো এক উন্মাদসুলভ কাজ করেছিল। "জিতলে মরতে হবে"—এই সতর্কবাণী শুনে তারা হার মেনে নিয়েই খেলা শুরু করেছিল, ভয় ও ক্ষুধায় কাঁপছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা দমন করতে পারেনি। ম্যাচ শেষে, ক্লাবের জার্সি পরা অবস্থাতেই এগারোজন খেলোয়াড়কেই একটি খাড়া পাহাড়ের কিনারায় গুলি করে হত্যা করা হয়।

ফুটবল ও স্বদেশ, স্বদেশ ও ফুটবল: ১৯৩৪ সালে যখন বলিভিয়া ও প্যারাগুয়ে চ্যাকো যুদ্ধে মানচিত্রের এক জনমানবহীন কোণ নিয়ে একে অপরকে নিশ্চিহ্ন করতে ব্যস্ত ছিল, তখন প্যারাগুয়ের রেড ক্রস একটি ফুটবল দল গঠন করে। সেই দলটি আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ের বিভিন্ন শহরে খেলে উভয় পক্ষের আহতদের চিকিৎসার জন্য যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করেছিল।

তিন বছর পর, যখন জেনারেল ফ্রাঙ্কো হিটলার ও মুসোলিনির সাথে হাত মিলিয়ে স্প্যানিশ প্রজাতন্ত্রে বোমা বর্ষণ করছিলেন, তখন একটি বাস্ক দল ইউরোপ সফরে ছিল এবং বার্সেলোনা ক্লাব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোতে খেলছিল। বাস্ক সরকার তাদের উদ্দেশ্য প্রচার করতে এবং প্রতিরক্ষার জন্য তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ইউজকাডি দলকে ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশে পাঠিয়েছিল; বার্সেলোনাও একই উদ্দেশ্য নিয়ে আমেরিকার উদ্দেশে যাত্রা করেছিল। সালটা ছিল ১৯৩৭ এবং বার্সেলোনার অধিনায়ক ততদিনে ফ্রাঙ্কোর গুলিতে নিহত হয়েছিলেন। ফুটবল মাঠে এবং মাঠের বাইরে, এই দুটি পরিযায়ী দল অবরুদ্ধ গণতন্ত্রের প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

যুদ্ধের সময় বার্সেলোনার মাত্র চারজন খেলোয়াড় স্পেনে ফিরতে পেরেছিলেন।
বাস্কদের মধ্যে মাত্র একজন। প্রজাতন্ত্র পরাজিত হলে, ফিফা নির্বাসিত খেলোয়াড়দের বিদ্রোহী হিসেবে ঘোষণা করে এবং তাদের স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করার হুমকি দেয়, কিন্তু তাদের মধ্যে কয়েকজন লাতিন আমেরিকার দলগুলোতে কাজ খুঁজে পেতে সক্ষম হন। বেশ কয়েকজন বাস্ক মেক্সিকোতে 'এস্পানিয়া' ক্লাবটি গঠন করেন, যারা শুরুর বছরগুলোতে অপরাজেয় ছিল। ইউজকাদির সেন্টার ফরোয়ার্ড, ইসিদ্রো লাঙ্গারা, ১৯৩৯ সালে আর্জেন্টিনায় অভিষেক করেন। তার প্রথম ম্যাচেই তিনি চারটি গোল করেন।

সেটা ছিল সান লরেঞ্জোর হয়ে, যেখানে অ্যাঞ্জেল জুবিয়েতা, যিনি ইউজকাদির মিডফিল্ডে খেলেছিলেন, তিনিও তারকা খ্যাতি লাভ করেন। পরবর্তীতে, মেক্সিকোতে, ল্যাঙ্গারা ১৯৪৫ সালের চ্যাম্পিয়নশিপে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় শীর্ষে ছিলেন।

ফ্রাঙ্কোর স্পেনের আদর্শ ক্লাব, রিয়াল মাদ্রিদ, ১৯৫৬ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে বিশ্ব শাসন করেছিল। এই বিস্ময়কর দলটি স্প্যানিশ লীগে টানা চারটি কাপ, পাঁচটি ইউরোপিয়ান কাপ এবং একটি ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ জিতেছিল। রিয়াল মাদ্রিদ যেখানেই যেত, সেখানেই সবাইকে হতবাক করে দিত। ফ্রাঙ্কোর স্বৈরশাসন এমন এক ভ্রাম্যমাণ দূতাবাস খুঁজে পেয়েছিল যাকে হারানো অসম্ভব ছিল। রেডিওতে সম্প্রচারিত গোলগুলো বিজয়ের আরও কার্যকর জয়ধ্বনি ছিল।

জাতীয় সঙ্গীত 'কারা আল সোল'-এর চেয়েও। ১৯৫৯ সালে শাসকগোষ্ঠীর অন্যতম রাজনৈতিক কর্তা হোসে সোলিস খেলোয়াড়দের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেছিলেন: "তোমাদের ধন্যবাদ, যারা একসময় আমাদের ঘৃণা করত, তারা এখন আমাদের বোঝে।" এল সিডের মতোই রিয়াল মাদ্রিদ অমর স্পেনের সমস্ত গুণাবলীর মূর্ত প্রতীক ছিল, যদিও এর বিখ্যাত স্কোয়াডটিকে দেখতে অনেকটা ফরেন লিজিয়নের মতো লাগত: ফরাসি কোপা, আর্জেন্টাইন দি স্তেফানো ও রিয়াল, উরুগুয়ের সান্তামারিয়া এবং হাঙ্গেরির পুসকাস।

ফেরেনৎস পুসকাসকে তাঁর বাম পায়ের বিধ্বংসী ক্ষমতার জন্য 'লিটল ক্যানন বুম' বলা হতো, যা দিয়ে তিনি দস্তানার মতো বল ধরতে পারতেন। লাসলো কুবালা, জোলতান সিবোর এবং সান্দর কোসিসের মতো অন্যান্য হাঙ্গেরীয়রাও সেই বছরগুলোতে বার্সেলোনার তারকা ছিলেন। ১৯৫৪ সালে কুবালার জন্য নির্মিত বার্সেলোনার বিশাল স্টেডিয়াম ক্যাম্প ন্যু-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। তাঁর নিখুঁত পাস এবং মারাত্মক শটে উল্লাস করতে আসা জনসমুদ্রকে পুরোনো স্টেডিয়ামটি ধারণ করতে পারত না। অন্যদিকে, সিবোরের জুতো থেকে যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ বের হতো। বার্সেলোনার আরেক হাঙ্গেরীয়, কোসিস, ছিলেন একজন দুর্দান্ত হেডার। তাঁকে 'হেড অফ গোল্ড' বা 'সোনার মাথা' বলা হতো এবং তাঁর গোল উদযাপনের জন্য রুমালের সমুদ্র বয়ে যেত। বলা হয়, চার্চিলের পর ইউরোপে কোসিসের মাথাই ছিল সেরা।



এর আগে ১৯৫০ সালে কুবালা একটি নির্বাসিত হাঙ্গেরীয় দল গঠন করেছিলেন, যার জন্য ফিফা তাকে দুই বছরের জন্য নিষিদ্ধ করে। এছাড়াও, ১৯৫৬ সালের শেষে সোভিয়েত ট্যাঙ্কগুলো গণবিদ্রোহ দমন করার পর আরেকটি নির্বাসিত দলে খেলার জন্য পুসকাস, সিজবোর, কোসিস এবং অন্যান্য হাঙ্গেরীয়দের এক বছরেরও বেশি সময়ের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

১৯৫৮ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে আলজেরিয়া একটি ফুটবল দল গঠন করে, যেটি প্রথমবারের মতো জাতীয় দলের জার্সি পরেছিল। দলটিতে ছিলেন রশিদ মাখলুফি, বেন তিফুর এবং ফ্রান্সে পেশাদারভাবে খেলা অন্যান্য আলজেরীয় খেলোয়াড়রা।

ঔপনিবেশিক শক্তির দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে আলজেরিয়া কেবল মরক্কোর বিপক্ষেই খেলতে পেরেছিল —যে দেশটিকে এমন পাপ করার জন্য বেশ কয়েক বছরের জন্য ফিফা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল —এবং বিভিন্ন আরব ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশের ক্রীড়া সংগঠনগুলো দ্বারা আয়োজিত কয়েকটি গুরুত্বহীন ম্যাচে অংশ নিতে পেরেছিল। ফিফা আলজেরীয় দলের জন্য সব দরজা বন্ধ করে দেয় এবং ফরাসি ফুটবল লীগ খেলোয়াড়দের কালো তালিকাভুক্ত করে। চুক্তির জালে বন্দী হয়ে, তাদের আর কখনো পেশাদার খেলায় ফেরার সুযোগ ছিল না।

কিন্তু আলজেরিয়া স্বাধীনতা লাভ করার পর, ফরাসিদের কাছে ভক্তদের কাঙ্ক্ষিত খেলোয়াড়দের ডেকে পাঠানো ছাড়া আর কোনো বিকল্প ছিল না।

কৃষ্ণাঙ্গরা

আমি ১৯১৬ সালে প্রথম দক্ষিণ আমেরিকান চ্যাম্পিয়নশিপে উরুগুয়ে চিলিকে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত করে। পরের দিন, চিলির প্রতিনিধিদল ম্যাচটি বাতিল করার দাবি জানায়, "কারণ উরুগুয়ের দলে দুজন আফ্রিকান খেলোয়াড় ছিলেন।" তারা হলেন ইসাবেলিনো গ্রাডিন এবং হুয়ান দেলগাদো। চারটি গোলের মধ্যে দুটি করেছিলেন গ্রাডিন।

গ্রাডিন মন্টেভিডিওতে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি ছিলেন ক্রীতদাসদের প্রপৌত্র। তিনি এমন একজন মানুষ ছিলেন যিনি অবিশ্বাস্য গতিতে ছুটে এসে দর্শকদের আসন থেকে তুলে দিতেন এবং এমন সহজে বলের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতেন যেন তিনি হেঁটে চলেছেন। তিনি এক মুহূর্তও না থেমে প্রতিপক্ষকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতেন এবং দৌড়ের ওপরেই গোল করতেন। তাঁর মুখমণ্ডল ছিল দেবালয়ের মতো এবং তিনি ছিলেন সেই ধরনের একজন, যাঁরা খারাপ সাজার ভান করলে কেউ বিশ্বাস করত না।

জুয়ান দেলগাদো, যিনি নিজেও দাসদের প্রপৌত্র ছিলেন, উরুগুয়ের গ্রামাঞ্চলের ফ্লোরিডা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। দেলগাদো কার্নিভালে ঝাড়ু হাতে এবং মাঠে বল নিয়ে নেচে নিজের বাহাদুরি দেখাতে পছন্দ করতেন। খেলার সময় তিনি কথা বলতেন এবং প্রতিপক্ষকে ঠাট্টা করতে ভালোবাসতেন: বল উঁচুতে পাঠিয়ে তিনি বলতেন, "আঙুরের থোকাটা তুলে দাও।" আর শট নেওয়ার সময় তিনি গোলরক্ষককে বলতেন, "লাফ দাও, বালিটা নরম।"

তখন উরুগুয়েই ছিল বিশ্বের একমাত্র দেশ, যাদের জাতীয় দলে কৃষ্ণাঙ্গ খেলোয়াড় ছিল।



জামোরা

এইচ তিনি ষোল বছর বয়সে প্রথম বিভাগে অভিষেক করেছিলেন, তখনও তিনি পরতেন ছোট প্যান্ট। বার্সেলোনার এস্পানিওলের হয়ে মাঠে নামার আগে, তিনি রোদ এবং অন্যান্য আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য তিনি একটি উঁচু গলার ইংলিশ জার্সি, দস্তানা এবং হেলমেটের মতো একটি শক্ত টুপি পরতেন। সালটা ছিল ১৯১৭ এবং আক্রমণগুলো ছিল অশ্বারোহী বাহিনীর আক্রমণের মতো। রিকার্ডো জামোরা এক বিপজ্জনক পেশা বেছে নিয়েছিলেন। গোলরক্ষকের চেয়েও বেশি বিপদে ছিলেন রেফারি, যিনি সেই সময়ে “দ্য নাজারেথ” নামে পরিচিত ছিলেন, কারণ দর্শকদের প্রতিশোধ থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য মাঠগুলোতে কোনো ডাগআউট বা বেড়া ছিল না। প্রতিটি গোলের পর খেলা দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে যেত, কারণ লোকজন হয় একে অপরকে আলিঙ্গন করতে অথবা ঘুষি মারতে মাঠে ছুটে আসত।

বছরের পর বছর ধরে ওই পোশাকে জামোরার ছবিটি বিখ্যাত হয়ে ওঠে। সে স্ট্রাইকারদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিত। তারা তার দিকে তাকালেই দিশেহারা হয়ে যেত: গোলে জামোরা থাকলে জালটা ছোট হয়ে আসত আর গোলপোস্টগুলো দূরে মিলিয়ে যেত।

তারা তাকে ‘ঐশ্বরিক’ বলে ডাকত। বিশ বছর ধরে তিনি ছিলেন বিশ্বের সেরা গোলরক্ষক। তিনি কনিয়াক পছন্দ করতেন এবং দিনে তিন প্যাকেট সিগারেট খেতেন, সাথে মাঝে মাঝে চুরুটও।



বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বার্সেলোনায় প্রকাশিত একটি ফুটবল ম্যানুয়াল থেকে নেওয়া চিত্রাবলী।



সমিতিয়ার

এল জামোরার মতো, জোসেপ সামিটিয়ার ষোল বছর বয়সে প্রথম বিভাগে অভিষেক করেন। ১৯১৮ সালে তিনি একটি চুক্তির বিনিময়ে বার্সেলোনার সাথে চুক্তিবদ্ধ হন।

অন্ধকারে জ্বলজ্বলে ডায়ালওয়ালা একটি ঘড়ি, যা সে আগে কখনো দেখেনি, এবং ওয়েস্টকোটসহ একটি স্যুট।

অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি দলের সেরা খেলোয়াড় হয়ে উঠলেন এবং শহরের সর্বত্র দোকানে দোকানে তাঁর জীবনকাহিনী ছড়িয়ে পড়ল। ক্যাবারে গায়কদের মুখে মুখে তাঁর নাম, মঞ্চে তাঁর নাম নিয়ে আলোচনা চলত, এবং ক্রীড়া কলামগুলোতে তিনি পূজনীয় হয়ে উঠতেন, যেখানে জামোরা ও সামিটিয়ারের উদ্ভাবিত "ভূমধ্যসাগরীয় শৈলী"-র প্রশংসা করা হতো।

বিধ্বংসী শটের অধিকারী স্ট্রাইকার সামিটিয়ার তার বুদ্ধিমত্তা, বলের ওপর আধিপত্য, যুক্তির নিয়মের প্রতি চরম অবজ্ঞা এবং স্থান-কালের সীমানার প্রতি অলিম্পিকসুলভ তাচ্ছিল্যের জন্য আলাদাভাবে পরিচিত ছিলেন।

মাঠে মৃত্যু

একটি বডন পোর্তে, যিনি উরুগুয়ের ক্লাব ন্যাসিওনালের জার্সি পরতেন চার বছরে দুই শতাধিক ম্যাচ, সবসময় ড্র হয়েছে। করতালি এবং মাঝে মাঝে উল্লাস, যতক্ষণ না তার সৌভাগ্যের নক্ষত্রটি খসে পড়ল।

তাকে প্রথম একাদশ থেকে বাদ দেওয়া হলো। সে অপেক্ষা করল, ফেরার অনুরোধ করল এবং ফিরলও। কিন্তু কোনো লাভ হলো না; তার ফর্মের অবনতি চলতেই থাকল, দর্শকরা শিস দিতে লাগল। রক্ষণে কচ্ছপও তাকে ছাড়িয়ে যেত, আক্রমণে সে একটিও গোল করতে পারল না।

১৯১৮ সালের গ্রীষ্মের শেষে, ন্যাসিওনাল স্টেডিয়ামে আবদোন পোর্তে আত্মহত্যা করেন। মধ্যরাতে তিনি মাঠের ঠিক মাঝখানে নিজেকে গুলি করেন, যে মাঠটি সকলের ভালোবাসা পেয়েছিল। সব আলো নিভে গিয়েছিল। গুলির শব্দ কেউ শুনতে পায়নি।

ভোরবেলা তাকে খুঁজে পাওয়া গেল। তার এক হাতে ছিল একটি রিভলভার, অন্য হাতে একটি চিঠি।



ফ্রিডেনরাইখ

১৯১৯ সালে ব্রাজিল উরুগুয়েকে ১-০ গোলে পরাজিত করে দক্ষিণ আমেরিকার চ্যাম্পিয়ন হয়।
আমি রিও ডি জেনিরোর রাস্তায় মানুষের ঢল নামে। উদযাপনের নেতৃত্বে, পতাকার মতো উঁচিয়ে ধরা হয়েছিল একটি কাদামাখা ফুটবল বুট, যাতে একটি ছোট ফলকে লেখা ছিল: "ফ্রিডেনরাইখের গৌরবময় পা।" পরের দিন, জয়সূচক গোল করা সেই জুতোটি শহরের কেন্দ্রস্থলের একটি গহনার দোকানের শো-কেসে স্থান পায়।

জার্মান অভিবাসী ও এক কৃষ্ণাঙ্গ ধোপানির সন্তান আর্তুর ফ্রিডেনরাইখ ছাব্বিশ বছর ধরে প্রথম বিভাগে খেলেছেন এবং এক পয়সাও উপার্জন করেননি। ফুটবলের ইতিহাসে তাঁর চেয়ে বেশি গোল আর কেউ করেননি, এমনকি ব্রাজিলের আরেক মহান গোলন্দাজ পেলে-ও নন, যিনি এখনও পেশাদার ফুটবলের সর্বোচ্চ গোলদাতা। ফ্রিডেনরাইখ গোল করেছিলেন ১,৩২৯টি, আর পেলে ১,২৭৯টি।

এই সবুজ চোখের মিশ্রবর্ণের মানুষটিই ব্রাজিলীয় খেলার শৈলীর ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তিনি, অথবা তাঁর পায়ের তলা দিয়ে ঢুকে পড়া কোনো শয়তান, ইংরেজদের খেলার সমস্ত নিয়মকানুন ভেঙে দিয়েছিলেন: শ্বেতাঙ্গদের গম্ভীর স্টেডিয়ামে ফ্রিডেনরাইখ নিয়ে এসেছিলেন সেই বাদামী ছেলেদের ঔদ্ধত্য, যারা বস্তিতে ছেঁড়া কাপড়ের বল নিয়ে মারামারি করে নিজেদের বিনোদন দিত। এভাবেই জন্ম হয়েছিল কল্পনাপ্রবণ এক শৈলীর, যা ফলাফলের চেয়ে আনন্দকে বেশি প্রাধান্য দেয়। ফ্রিডেনরাইখের সময় থেকে ব্রাজিলীয় ফুটবলে কোনো সমকোণ নেই, ঠিক যেমন রিও ডি জেনিরোর পাহাড়ে বা অস্কার নিয়েমায়ারের দালানগুলোতেও নেই।

অঙ্গহানি থেকে মহিমায়

১৯২১ সালে বুয়েনস আইরেসে দক্ষিণ আমেরিকান কাপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি
আমি এপিতাসিও পেসোয়া একটি ফরমান জারি করেন: দেশপ্রেমিক মর্যাদার কারণে ব্রাজিলের জাতীয়
দলে কোনো বাদামী চামড়ার মানুষ থাকবে না।
দল। তারা যে তিনটি ম্যাচ খেলেছিল, তার মধ্যে সাদা দল দুটিতে হেরেছিল।

ফ্রিডেনরাইখ সেই চ্যাম্পিয়নশিপে খেলেননি। তখন ব্রাজিলিয়ান ফুটবলে কৃষ্ণাঙ্গ হওয়াটা ছিল প্রায় অসম্ভব, আর মিশ্রবর্ণের হওয়াটা ছিল এক চরম পরীক্ষা।
ফ্রিডেনরাইখ সবসময় দেরিতে শুরু করতেন কারণ ড্রেসিংরুমে চুল ইস্ত্রি করতে তার আধ ঘণ্টা সময় লাগত।
ফ্লুমিনেন্সের একমাত্র মুলাটো খেলোয়াড়, কার্লোস আলবার্তো, চালের গুঁড়ো দিয়ে তার মুখ ফর্সা করতেন।

পরবর্তীতে, ক্ষমতার মালিকদের বাধা সত্ত্বেও, পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে। সময়ের সাথে সাথে, বর্ণবাদের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত পুরোনো ফুটবল এক বহুবর্ণময় জাঁকজমকের ফুটবলের জন্ম দেয়। এত বছর পর এটা স্পষ্ট যে, ফ্রিডেনরাইখ থেকে রোমারিও পর্যন্ত, এবং এর মধ্যে ডোমিঙ্গোস দা গুইয়া, লিওনিদাস, জিজিনহো, গারিঞ্চা, দিদি ও পেলে পর্যন্ত ব্রাজিলের সেরা খেলোয়াড়রা সবাই ছিলেন কৃষ্ণাঙ্গ এবং মিশ্রবর্ণের। তাঁরা সবাই দারিদ্র্য থেকে উঠে এসেছিলেন, এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার সেই দারিদ্র্যেই ফিরে গিয়েছিলেন। এর বিপরীতে, ব্রাজিলের গাড়ি-দৌড়ের চ্যাম্পিয়নদের মধ্যে কখনও কোনো কৃষ্ণাঙ্গ বা মিশ্রবর্ণের খেলোয়াড় ছিলেন না, যে খেলাটির জন্যও টেনিসের মতোই অর্থের প্রয়োজন হয়।





বৈশ্বিক সামাজিক পিরামিডে কৃষ্ণাঙ্গরা সর্বনিম্ন এবং শ্বেতাঙ্গরা সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে। ব্রাজিলে, যেখানে একে “বর্ণগত গণতন্ত্র” বলা হয়, সেখানে ফুটবল হলো এমন অল্প কয়েকটি গণতান্ত্রিক ক্ষেত্রের মধ্যে একটি, যেখানে অশ্বেতাঙ্গরা একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সমানভাবে প্রতিযোগিতা করতে পারে। এমনকি ফুটবলেও কেউ কেউ অন্যদের চেয়ে বেশি সমান।
তাদের সবারই সমান অধিকার আছে, কিন্তু যে খেলোয়াড় ক্ষুধার্ত অবস্থায় বড় হয়েছে আর যে ক্রীড়াবিদ কখনো না খেয়ে থাকেনি, তারা আসলে সমান প্রতিযোগিতার ময়দানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে না। অন্তত ফুটবল একজন দরিদ্র শিশুর জন্য সামাজিক উন্নতির একটি সুযোগ করে দেয়, যে সাধারণত কৃষ্ণাঙ্গ বা মিশ্র বর্ণের হয় এবং যার বল ছাড়া আর কোনো খেলনা ছিল না। বলটিই একমাত্র পরীর মতো রক্ষাকর্ত্রী, যার ওপর সে বিশ্বাস রাখতে পারে। হয়তো সে তাকে খাওয়াবে, হয়তো তাকে নায়ক বানাবে, হয়তো দেবতাও বানিয়ে দেবে।

দুঃখ তাকে ফুটবল অথবা অপরাধের জন্য প্রস্তুত করে। জন্মের মুহূর্ত থেকেই সেই শিশুটি তার দুর্বলতাকে অস্ত্রে পরিণত করতে বাধ্য হয়, এবং অচিরেই সে শৃঙ্খলার সেইসব নিয়মকানুনকে পাশ কাটিয়ে চলতে শেখে যা তাকে কোনো স্থান দেয় না। সে সব ধরনের কাজের কৌশল শিখে নেয় এবং ভান করা, চমকে দেওয়া, অপ্রত্যাশিতভাবে বাধা ভেঙে বেরিয়ে আসা, আর শত্রুকে এক দফা চালে বা শয়তানের গানের ভাণ্ডার থেকে অন্য কোনো কৌশলে ঘায়েল করার শিল্পে পারদর্শী হয়ে ওঠে।

আমেরিকার দ্বিতীয় আবিষ্কার

এফ পেদ্রো আরিস্পের কাছে জন্মভূমির কোনো অর্থ ছিল না। এটা ছিল তার জন্মস্থান, যার কোনো গুরুত্বই তার কাছে ছিল না, কারণ এ ব্যাপারে তার কোনো হাত ছিল না। এখানেই তিনি একটি প্যাকিং হাউসে মজুর হিসেবে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেছিলেন, এবং দেশ নির্বিশেষে তার কাছে একজন মালিক অন্য যেকোনো মালিকের মতোই ছিল। কিন্তু যখন উরুগুয়ে ফ্রান্সে ১৯২৪ সালের অলিম্পিক জিতল, আরিস্পে ছিলেন সেই বিজয়ী খেলোয়াড়দের একজন। যখন তিনি দেখলেন সূর্য ও চারটি হালকা নীল ডোরাকাটা পতাকাটি সম্মানের দণ্ডের ওপর ধীরে ধীরে উঠছে—সব পতাকার কেন্দ্রে এবং অন্য যেকোনো পতাকার চেয়ে উঁচুতে—আরিস্পের মনে হলো যেন তার হৃদয় ফেটে যাচ্ছে।

চার বছর পর, উরুগুয়ে নেদারল্যান্ডসে অনুষ্ঠিত অলিম্পিকে আবারও স্বর্ণপদক জয় করে। একজন বিশিষ্ট উরুগুয়েবাসী, আটিলিয়ো নারানসিও—যিনি ১৯২৪ সালে খেলোয়াড়দের যাতায়াতের খরচ জোগাতে নিজের বাড়ি বন্ধক রেখেছিলেন—মন্তব্য করেন: "আমরা এখন আর বিশ্বের মানচিত্রে শুধু একটি ক্ষুদ্র বিন্দু নই।" আকাশী-নীল জার্সিটি ছিল জাতিটির অস্তিত্বের প্রমাণ: উরুগুয়ে কোনো ভুল ছিল না। ফুটবল এই ক্ষুদ্র দেশটিকে বিশ্বব্যাপী বিস্মৃতির ছায়া থেকে টেনে বের করে এনেছিল।

'২৪ এবং '২৮ সালের বিস্ময়কর কীর্তিগুলোর নেপথ্যে ছিলেন সাধারণ শ্রমিক ও ভবঘুরেরা, যারা ফুটবল থেকে খেলার আনন্দ ছাড়া আর কিছুই পেতেন না। পেদ্রো আরিস্পে ছিলেন একজন মাংস প্রক্রিয়াকারী। হোসে নাসাজ্জি মার্বেল পাথর কাটতেন। "পেরুচো" পেত্রোনে ছিলেন একজন মুদি দোকানদার।
পেদ্রো চেয়া বরফ বিক্রি করত। হোসে লিয়ান্দ্রো আন্দ্রেদে ছিল একজন সার্কাসের সঙ্গীতশিল্পী এবং জুতো পালিশকারী। তাদের সবার বয়স ছিল কুড়ি বছর বা তার চেয়ে কিছুটা বেশি, যদিও ছবিতে তাদের বৃদ্ধের মতো দেখায়। তারা লবণ-জল, ভিনেগারের প্রলেপ এবং কয়েক গ্লাস ওয়াইন দিয়ে তাদের ক্ষত সারাত।





১৯২৪ সালে তাঁরা জাহাজের তৃতীয় শ্রেণীর স্টিয়ারেজে করে ইউরোপে পৌঁছান এবং এরপর ধার করা টাকায় দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় ভ্রমণ করেন। থাকা-খাওয়ার বিনিময়ে তাঁরা কাঠের বেঞ্চে ঘুমাতেন এবং একের পর এক ম্যাচ খেলতেন। প্যারিস অলিম্পিকের আগে তাঁরা স্পেনে নয়টি ম্যাচ খেলেন এবং সবকটিতেই জয়লাভ করেন।

এই প্রথম কোনো লাতিন আমেরিকান দল ইউরোপে খেলেছিল।
তাদের প্রথম অলিম্পিক ম্যাচ ছিল যুগোস্লাভিয়ার বিপক্ষে। যুগোস্লাভরা অনুশীলন পর্বে গুপ্তচর পাঠিয়েছিল। উরুগুয়ের খেলোয়াড়রা ব্যাপারটা ধরে ফেলে এবং মাটিতে লাথি মেরে বল আকাশে উড়িয়ে দিয়ে অনুশীলন করতে থাকে, প্রতি পদক্ষেপে হোঁচট খায় এবং একে অপরের সাথে ধাক্কা খায়। গুপ্তচররা রিপোর্ট করেছিল: "এটা দেখে দুঃখ হয়, এই বেচারা ছেলেরা এত দূর থেকে এসেছে।"

মাত্র দুই হাজারের কিছু বেশি সমর্থক উপস্থিত হয়েছিল। উরুগুয়ের পতাকা উল্টো করে ওড়ানো হয়েছিল, সূর্যটা ছিল পতাকার মাথার উপর, এবং জাতীয় সঙ্গীতের পরিবর্তে একটি ব্রাজিলীয় মার্চ সঙ্গীত বাজানো হচ্ছিল। সেই বিকেলে উরুগুয়ে যুগোস্লাভিয়াকে ৭-০ গোলে পরাজিত করে।

এবং তারপর আমেরিকার দ্বিতীয় আবিষ্কারের মতো কিছু একটা ঘটেছিল।
একটার পর একটা ম্যাচে, কাঠবিড়ালির মতো ক্ষিপ্র সেই মানুষগুলোকে দেখতে দর্শকরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকত, যারা বল নিয়ে দাবা খেলত। ইংলিশ দলটি লম্বা পাস এবং উঁচু বলের খেলায় পারদর্শী হয়ে উঠেছিল, কিন্তু সুদূর আমেরিকায় জন্ম নেওয়া এই বঞ্চিত সন্তানেরা তাদের বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করেনি। তারা সরাসরি পায়ে কাছের পাসের এক নতুন খেলা উদ্ভাবন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যেখানে ছিল ছন্দের বিদ্যুৎগতি পরিবর্তন এবং দ্রুতগতির ড্রিবলিং। আঁরি দ্য মঁতেরলঁ, একজন অভিজাত লেখক, তাঁর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন: "এক নতুন দিগন্ত! এই তো আমরা পেলাম আসল ফুটবল।"

এর তুলনায়, আমরা আগে যা জানতাম, যা খেলতাম, তা একজন স্কুলছাত্রের শখের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না।



'২৪ ও '২৮ সালের অলিম্পিকে উরুগুয়ের সাফল্য এবং পরবর্তীকালে ১৯৩০ ও ১৯৫০ সালের বিশ্বকাপ জয়ের পেছনে সরকারের শারীরিক শিক্ষার প্রসারের জন্য দেশজুড়ে খেলার মাঠ তৈরির নীতির বড় অবদান ছিল। এখন, বহু বছর পর, রাষ্ট্রের সেই সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং সেই মহান ফুটবলের যা কিছু অবশিষ্ট আছে, তা হলো কেবলই স্মৃতিচারণ। এনজো ফ্রান্সেসকোলির মতো বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় পুরোনো কলাকৌশলকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়ে সেটিকে নতুন রূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন, কিন্তু সাধারণভাবে উরুগুয়ের ফুটবল এখন আর আগের মতো নেই। কম সংখ্যক শিশু এটি খেলে এবং কম সংখ্যক পুরুষ এটি সুন্দরভাবে খেলে। তা সত্ত্বেও, এমন কোনো উরুগুয়েবাসী নেই যিনি নিজেকে কৌশল ও রণনীতির পিএইচডি এবং ফুটবল ইতিহাসের পণ্ডিত বলে মনে করেন না। উরুগুয়েবাসীদের ফুটবলের প্রতি এই আবেগ সেই সুদূর অতীত থেকেই এসেছে এবং এর গভীর শিকড় আজও জীবন্ত। জাতীয় দল যখনই খেলে, প্রতিপক্ষ যেই হোক না কেন, পুরো দেশ রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে। রাজনীতিবিদ, গায়ক এবং সার্কাসের ঘোষকেরা মুখ বন্ধ করে, প্রেমিক-প্রেমিকারা তাদের আলিঙ্গন স্থগিত রাখে, আর মাছিরা নড়তে অস্বীকার করে।



আন্দ্রেড

ই ইউরোপ কখনো কোনো কৃষ্ণাঙ্গকে ফুটবল খেলতে দেখেনি।

১৯২৪ সালের অলিম্পিকে উরুগুয়ের হোসে লিয়ান্দ্রো আন্দ্রেদে তার অসাধারণ নৈপুণ্য দিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করেছিলেন। এই রাবারের মতো দেহের বিশালদেহী মিডফিল্ডার প্রতিপক্ষকে স্পর্শ না করেই বল নিয়ে মাঠের অনেকটা পথ এগিয়ে যেতেন, এবং যখন আক্রমণ শুরু করতেন, তখন শরীর দুলিয়ে সবাইকে ছত্রভঙ্গ করে দিতেন। এক ম্যাচে তিনি মাথায় বল নিয়ে মাঠের অর্ধেকটা পথ পাড়ি দিয়েছিলেন। দর্শকরা তাকে উল্লাসে মুখরিত করে তুলেছিল, ফরাসি সংবাদমাধ্যম তাকে 'দ্য ব্ল্যাক মার্ভেল' বা 'কৃষ্ণবর্ণ বিস্ময়' বলে অভিহিত করেছিল।

টুর্নামেন্ট শেষ হওয়ার পর, আন্দ্রাদে কিছুকাল প্যারিসে ভবঘুরে বোহেমিয়ান এবং ক্যাবারেগুলোর রাজা হিসেবে ঘুরে বেড়ান। মন্টেভিডিও থেকে আনা তার ঝোপালো শণের স্যান্ডেলের বদলে তিনি পরেন পেটেন্ট লেদারের জুতো এবং তার জীর্ণ টুপির জায়গায় আসে একটি টপ হ্যাট। তৎকালীন সংবাদপত্রের কলামগুলোতে পিগালের রাতের সেই সম্রাটের ব্যক্তিত্বের প্রশংসা করা হতো: তার প্রাণবন্ত পদক্ষেপ, চওড়া হাসি, আর সর্বদা দূর দিগন্তে তাকিয়ে থাকা আধবোজা চোখ। আর তার পোশাকও ছিল চোখধাঁধানো: রেশমি রুমাল, ডোরাকাটা জ্যাকেট, উজ্জ্বল হলুদ দস্তানা এবং রুপোর হাতলওয়ালা একটি ছড়ি।

বহু বছর পর মন্টেভিডিওতে আন্দ্রেড মারা যান। তাঁর বন্ধুরা তাঁর জন্য বেশ কয়েকটি সাহায্য তহবিলের আয়োজন করেছিল, কিন্তু সেগুলোর কোনোটিই বাস্তবায়িত হয়নি। তিনি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন।

তিনি ছিলেন কৃষ্ণাঙ্গ, দক্ষিণ আমেরিকান এবং দরিদ্র, প্রথম আন্তর্জাতিক আইডল।
ফুটবল।

রিংলেট

টি উরুগুয়ের খেলোয়াড়রা পরপর আট আকৃতির যে নকশা তৈরি করেছিল, সেগুলোকে তারা কাজে লাগিয়েছিল। মাঠের মোনাস, কোঁকড়া চুল। ফরাসি সাংবাদিকরা এর রহস্য জানতে চেয়েছিলেন। জাদুবিদ্যা যা প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দের পাথরে পরিণত করত। একজন দোভাষীর মাধ্যমে হোসে লিয়ান্দ্রো আন্দ্রেদে সেই কৌশলটি প্রকাশ করেন: খেলোয়াড়রা এমন মুরগিদের তাড়া করে প্রশিক্ষণ নিত, যেগুলো পালিয়ে গিয়ে মাটিতে 'S' অক্ষর তৈরি করত। সাংবাদিকরা তা বিশ্বাস করে গল্পটি প্রকাশ করেন।

কয়েক দশক পরেও, দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবলে গোলের মতোই জোরালো উল্লাসে সুন্দর কোঁকড়া চুলকে স্বাগত জানানো হতো। আমার শৈশবের স্মৃতি সেগুলোয় পরিপূর্ণ। আমি চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পাই, যেমন, ওয়াল্টার গোমেজকে —সেই মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া অতর্কিত আক্রমণকারীকে, যিনি একের পর এক কোঁকড়া চুল নিয়ে শত্রুদের পায়ের জটলার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তেন এবং পেছনে ফেলে আসতেন ভূপতিত দেহের সারি। গ্যালারির দর্শকরাও স্বীকার করত:

ওয়াল্টার গোমেজের পাস মিস
করার চেয়ে আমরা সবাই বরং দ্রুত দৌড়াতে চাইব।

সে বলটাকে মাখতে, ধরে রাখতে আর আদর করতে ভালোবাসত; বলটা হাত থেকে ফসকে গেলে সে অপমানিত বোধ করত। কোনো কোচই তাকে বলার সাহস করত না, যেমনটা এখন বলা হয়: "যদি মাখতেই চাও, তাহলে বেকারিতে গিয়ে কাজ করো।"

কোঁকড়া চুলগুলো কেবল সামান্য সহনীয় দুষ্টুমি ছিল না, বরং তা ছিল জনতার দাবি করা এক আনন্দ। আজ এই ধরনের শিল্পকর্ম নিষিদ্ধ, অথবা অন্তত গভীর সন্দেহের চোখে দেখা হয়, এবং এগুলোকে স্বার্থপর প্রদর্শনবাদ, দলীয় চেতনার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং আধুনিক লৌহ-দৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ অকেজো বলে মনে করা হয়।

ফুটবল।

অলিম্পিক লক্ষ্য

ডাব্লিউ ১৯২৪ সালের অলিম্পিক থেকে উরুগুয়ের দল ফিরে আসার পর, আর্জেন্টাইনরা বুয়েনস আইরেসে তাদের একটি প্রীতি ম্যাচের জন্য চ্যালেঞ্জ করেছিল। উরুগুয়ে এক গোলে হেরেছে।

লেফট উইং সিজারিও ওনজারি জয়সূচক গোলটির কারিগর ছিলেন। তিনি একটি কর্নার কিক নেন এবং বলটি অন্য কারো স্পর্শ ছাড়াই সরাসরি জালে ঢুকে যায়। ফুটবলের ইতিহাসে তিনিই প্রথম খেলোয়াড় যিনি এভাবে গোল করেন। উরুগুয়ের খেলোয়াড়রা বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। যখন তারা কথা বলার সুযোগ পেল, তখন তারা প্রতিবাদ করল। তাদের দাবি, বলটি যখন বাতাসে ছিল তখন গোলরক্ষক মাজালিকে ধাক্কা দেওয়া হয়েছিল। রেফারি তাদের কথা শোনেননি। এরপর তারা চিৎকার করে বলতে লাগল যে, ওনজারি ইচ্ছাকৃতভাবে জালে শট করেননি এবং গোলটি বাতাসের কারণে হয়েছে।

শ্রদ্ধা জানাতে বা বিদ্রূপ করতে, সেই বিরল ঘটনাটি দক্ষিণ আমেরিকায় 'অলিম্পিক গোল' নামে পরিচিতি লাভ করে। এখনও, যখন এটি কদাচিৎ ঘটে, তখন একে এই নামেই ডাকা হয়।
ওনজারি তার বাকি জীবন ধরে এই শপথ করে গেছেন যে, এটা কোনো কাকতালীয় ঘটনা ছিল না। আর যদিও অনেক বছর কেটে গেছে, অবিশ্বাসটা এখনও রয়ে গেছে: যতবারই কোনো মধ্যস্থতাকারী ছাড়াই কর্নার কিক জালে জড়ায়, দর্শকরা করতালির মাধ্যমে গোলটি উদযাপন করে, কিন্তু ব্যাপারটা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে না।



পিন্ডিবেনের গোল

সালটা ছিল ১৯২৬। গোলদাতা, হোসে পিয়েনডিবেনে, উদযাপন করেননি। পিয়েনডিবেনে,

আমি অসাধারণ দক্ষতা ও তার চেয়েও অসাধারণ বিনয়ের অধিকারী এই মানুষটি কাউকে অসন্তুষ্ট না করার জন্য নিজের গোলগুলো কখনো উদযাপন করতেন না।

উরুগুয়ের ক্লাব পেনিয়ারোল মন্টেভিডিওতে বার্সেলোনার এস্পানিওলের বিপক্ষে খেলছিল, এবং তারা জামোরার রক্ষণে থাকা গোলপোস্ট ভেদ করার কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছিল না। খেলাটি পেছন থেকে শুরু হলো। আনসেলমো দুজন প্রতিপক্ষকে কাটিয়ে সুফিয়াতির দিকে বল বাড়িয়ে দিলেন, এবং তারপর একটি ফিরতি পাসের প্রত্যাশায় দৌড় শুরু করলেন। কিন্তু পিয়েনডিবেনে নিজেই পাসটি চাইলেন। তিনি পাসটি ধরে উরকিজুকে কাটিয়ে গোলের দিকে এগিয়ে গেলেন। জামোরা দেখলেন যে পিয়েনডিবেনে ডান কোণার দিকে শট নিচ্ছেন এবং তিনি তা আটকাতে লাফিয়ে উঠলেন। বলটি নড়েনি; পিয়েনডিবেনে তার পায়ের উপর ভর দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। পিয়েনডিবেনে আলতো করে বলটি ফাঁকা জালের বাম দিকে ছুঁড়ে দিলেন। জামোরা বিড়ালের মতো লাফিয়ে পেছনে সরে আসতে সক্ষম হলেন, এবং যখন অনেক দেরি হয়ে গেছে, তখন তিনি তার আঙুলের ডগা দিয়ে বলটি ছুঁয়ে দিলেন।



বাইসাইকেল কিক

আমন উনজাগা চিলির বন্দর শহরের মাঠে এই কৌশলটি উদ্ভাবন করেছিলেন।
আর তালকাহুয়ানা: শরীর বাতাসে, পিঠ মাটিতে, সে বলটা শট করল।
কাঁচির ব্লেডের মতো হঠাৎ পা দুটো ঝটকা দিয়ে সে পেছনের দিকে সরে গেল।

এর বেশ কিছু বছর পর এই অ্যাক্রোব্যাটিক খেলাটি 'চিলেনা' নামে পরিচিতি লাভ করে । ১৯২৭ সালে, যখন কোলো-কোলো ক্লাব ইউরোপ সফরে যায় এবং স্ট্রাইকার ডেভিড আরেলানো স্পেনের স্টেডিয়ামগুলোতে এটি পরিবেশন করেন, তখন স্প্যানিশ সাংবাদিকরা এই অজানা ক্রীড়ানৈপুণ্যের জাঁকজমকে মুগ্ধ হন এবং এর নামকরণ করেন 'চিলেনা' , কারণ স্ট্রবেরি ও কুয়েকার মতো এটিও চিলি থেকে এসেছিল।

কয়েকটি উড়ন্ত গোলের পর সেই বছরই ভায়াদোলিদের স্টেডিয়ামে একজন ফুলব্যাকের সাথে এক মারাত্মক সংঘর্ষে আরেলানো নিহত হন।

স্কারোন

এফ ব্রাজিলিয়ান পেলে ও কৌতিনহোর চল্লিশ বছর আগে, উরুগুয়ের স্কারোনে ও সিয়া উরুর পাস এবং জিগজ্যাগ দৌড়ের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগকে গুঁড়িয়ে দিতেন। এই পাসে বল একজনের থেকে আরেকজনের কাছে, একেবারে গোল পর্যন্ত যেত; কখনো আপনার, কখনো আমার; কখনো একেবারে পায়ের কাছে; প্রশ্ন ও উত্তর, আহ্বান ও প্রত্যুত্তর। বল এক মুহূর্তও না থেমে ফিরে আসত, যেন কোনো দেয়াল থেকে। সেই দিনগুলোতে রিভার প্লেটের এই আক্রমণশৈলীকে বলা হতো: "দেয়াল"।

হেক্টর স্কারোন যেন নৈবেদ্যের মতো পাস বিলিয়ে দিতেন এবং এমন নিখুঁত নিশানায় গোল করতেন যা তিনি অনুশীলনের সময় ত্রিশ মিটার দূর থেকে বোতল ফেলে শানিয়ে নিয়েছিলেন। আর যদিও তিনি বেশ খাটো ছিলেন, লাফানোর ক্ষেত্রে তিনি বাকিদের চেয়ে অনেক আগেই লাফিয়ে উঠতেন। স্কারোন মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অগ্রাহ্য করে বাতাসে ভেসে থাকতে জানতেন। তিনি বলের জন্য ঝাঁপ দিতেন, প্রতিপক্ষদের থেকে মুক্ত হয়ে ঘুরতেন এবং গোলের দিকে মুখ করতেন। তারপর, তখনও শূন্যে ভাসতে ভাসতে, হেড করে বল জালে জড়িয়ে দিতেন।

তাকে 'জাদুকর' বলা হতো কারণ তিনি যেন লটারির মতো গোল করে ফেলতেন, এবং 'ফুটবলের দেবদূত'ও বলা হতো কারণ খেলার সময় তিনি এমনভাবে গান গাইতেন যা আর কেউ পারত না।

স্কারোনের গোল

সময়টা ছিল ১৯২৮ সাল, অলিম্পিকের ফাইনাল চলাকালীন।

আমি উরুগুয়ে ও আর্জেন্টিনার খেলায় যখন সমতা ছিল, তখন পিরিজ বলটি তারাসকোনির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে পেনাল্টি এলাকার দিকে এগিয়ে যান। বোরহাস গোলপোস্টের দিকে পিঠ করে বলটি পেয়ে হেড করে স্কারোনের দিকে পাঠান এবং চিৎকার করে বলেন, "এটা তোমার, হেক্টর!" আর স্কারোন উড়ন্ত অবস্থাতেই বলটিতে সজোরে লাথি মারেন। আর্জেন্টিনার গোলরক্ষক বসসিও বলটি ধরার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন, কিন্তু ততক্ষণে বল জালে জড়িয়ে গেছে। বলটি অবাধ্যভাবে মাঠের ভেতরে ফিরে আসে। উরুগুয়ের স্ট্রাইকার ফিগেরোয়া দ্রুত এক লাথি মেরে বলটিকে আবার ভেতরে পাঠান, কারণ এভাবে গোলপোস্ট ছেড়ে আসাটা শোভন ছিল।



গুপ্ত শক্তি

একটি উরুগুয়ের খেলোয়াড় আধেমার কানাভেসি নিজেকে উৎসর্গ করে এড়াতে ফাইনাল ম্যাচে তার উপস্থিতি যে ক্ষতি করতে পারত আমস্টারডামে অনুষ্ঠিত ১৯২৮ সালের অলিম্পিক। উরুগুয়ের আর্জেন্টিনার বিপক্ষে খেলার কথা ছিল। যতবারই কানাভেসি আর্জেন্টাইনদের মুখোমুখি হয়েছিলেন, উরুগুয়ে হেরেছিল, এবং শেষবার নিজের দলের বিপক্ষেই গোল করার দুর্ভাগ্য তাঁর হয়েছিল। তাই তিনি খেলোয়াড়দের স্টেডিয়ামে নিয়ে যাওয়া বাস থেকে নেমে গেলেন। আমস্টারডামে, কানাভেসিকে ছাড়াই উরুগুয়ে জিতেছিল।

আগের দিন, কার্লোস গার্দেল আর্জেন্টাইন খেলোয়াড়দের জন্য তাদের হোটেলে গান গেয়েছিলেন। তাদের সৌভাগ্য কামনায়, তিনি ‘ড্যান্ডি’ নামের একটি নতুন ট্যাঙ্গো গেয়েছিলেন। দুই বছর পর, ১৯৩০ বিশ্বকাপের ফাইনালের ঠিক আগে, একই ঘটনা আবার ঘটল: গার্দেল দলের সাফল্য কামনা করে ‘ড্যান্ডি’ গানটি গাইলেন এবং উরুগুয়ে ফাইনালে জিতল। অনেকেই হলফ করে বলেন যে তার উদ্দেশ্য ছিল প্রশ্নাতীত, কিন্তু এমনও অনেকে আছেন যারা বিশ্বাস করেন যে এর মধ্যেই গার্দেল যে একজন উরুগুয়ের নাগরিক ছিলেন তার প্রমাণ নিহিত আছে।

নোলোর গোল

সালটা ছিল ১৯২৯। আর্জেন্টিনা প্যারাগুয়ের বিপক্ষে খেলছিল।

আমি নোলো ফেরেইরা একেবারে পেছন থেকে বলটা নিয়ে এগিয়ে এলেন। তিনি একের পর এক পড়ে যাওয়া খেলোয়াড়দের পেছনে ফেলে একটি পথ তৈরি করলেন, যতক্ষণ না হঠাৎ তিনি নিজেকে দেয়ালের মতো সারিবদ্ধ পুরো রক্ষণভাগের মুখোমুখি দেখতে পেলেন। তারপর নোলো থেমে গেলেন। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে এক পা থেকে অন্য পায়ে, এক পায়ের পাতা থেকে অন্য পায়ে বল পাস করতে থাকলেন, বলটাকে মাটিতে পড়তে দিলেন না। তার প্রতিপক্ষরা একযোগে, সম্মোহিত হয়ে, বাম থেকে ডানে এবং ডান থেকে বামে মাথা ঘোরাতে লাগল, তাদের দৃষ্টি সেই দোলকের মতো বলটির ওপর স্থির ছিল। এই আদান-প্রদান যেন অনন্তকাল ধরে চলল, যতক্ষণ না নোলো একটি ফাঁক খুঁজে পেলেন এবং কোনো সতর্কবার্তা ছাড়াই শট নিলেন: বলটি দেয়াল ভেদ করে জাল কাঁপিয়ে দিল।

অশ্বারোহী পুলিশ তাকে অভিনন্দন জানাতে ঘোড়া থেকে নেমে এল। মাঠে বিশ হাজার লোক ছিল, কিন্তু প্রত্যেক আর্জেন্টাইন হলফ করে বলবে যে তিনি সেখানে ছিলেন।

১৯৩০ সালের বিশ্বকাপ

একটি ভূমিকম্প ইতালির দক্ষিণাঞ্চলকে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল এবং ১,৫০০ জনকে চাপা দিচ্ছিল। একটিনেপোলিটানরা, মার্লিন ডিয়েট্রিচ "প্রেমে পড়া" গাইছিলেন।
আবারও।” স্তালিন রুশ বিপ্লবের ক্ষমতা জবরদখল সম্পন্ন করছিলেন, এবং কবি ভ্লাদিমির মায়াকোভস্কি আত্মহত্যা করছিলেন।
ইংরেজরা মহাত্মা গান্ধীকে কারারুদ্ধ করছিল, যিনি স্বাধীনতার দাবি জানিয়ে ও দেশকে ভালোবেসে ভারতকে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন।
একই পতাকার অধীনে অপর ইন্ডিজে, আমাদের ইন্ডিজে, অগাস্তো সিজার সান্দিনো নিকারাগুয়ার কৃষকদের জাগিয়ে তুলছিলেন এবং মার্কিন মেরিন সেনারা তাঁকে অনাহারে পরাজিত করার জন্য ফসল পুড়িয়ে দিচ্ছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেউ কেউ নতুন বুগি-উগি নাচের তালে নাচছিল, কিন্তু '২৯-এর অর্থনৈতিক ধ্বসের প্রচণ্ড আঘাতে 'গর্জনশীল বিশের দশক'-এর সেই উচ্ছ্বাস একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। যখন নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জের পতন ঘটল, তা আন্তর্জাতিক পণ্যের মূল্যকে বিধ্বস্ত করে দিল এবং লাতিন আমেরিকার বেশ কয়েকটি সরকারকে অতল গহ্বরে টেনে নিয়ে গেল। বৈশ্বিক সংকটের খাদের কিনারা থেকে টিনের দাম হুড়মুড় করে পড়ে গেল, যা বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট হেরনান্দো সিলেসকেও টেনে নিয়ে গেল এবং তার জায়গায় একজন জেনারেলকে বসাল; অন্যদিকে আর্জেন্টিনায় মাংস ও গমের দামের পতন প্রেসিডেন্ট হিপোলিতো ইরিগোয়েনের পতন ঘটাল এবং তার জায়গায় আরেকজন জেনারেলকে বসাল। ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রে, চিনির দাম কমে যাওয়ায় আরেক জেনারেল রাফায়েল লিওনিদাস ত্রুহিলোর একনায়কতন্ত্রের দীর্ঘ অধ্যায়ের সূচনা হয়, যিনি রাজধানী শহর ও বন্দরের নামকরণ নিজের নামে করে তার শাসনের উদ্বোধন করছিলেন।

উরুগুয়েতে অভ্যুত্থানটি সংঘটিত হতে আরও তিন বছর বাকি ছিল। ১৯৩০ সালে দেশটির সমস্ত মনোযোগ ছিল কেবল প্রথম বিশ্বকাপের দিকে। ইউরোপে অনুষ্ঠিত পূর্ববর্তী দুটি অলিম্পিকে উরুগুয়ের বিজয়ের ফলে টুর্নামেন্টটি আয়োজনের জন্য দেশটিই ছিল সবচেয়ে উপযুক্ত পছন্দ।

বারোটি দেশ মন্টেভিডিওর বন্দরে এসে পৌঁছালো। সমগ্র ইউরোপকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, কিন্তু মাত্র চারটি দল সমুদ্র পার হয়ে এই দক্ষিণের তীরে এসেছিল।
ইউরোপীয়রা বলল, “ওটা সবকিছু থেকে অনেক দূরে, আর যাতায়াতের খরচও অনেক বেশি।”



একটি জাহাজ ফ্রান্স থেকে জুল রিমেটের ট্রফিটি নিয়ে এসেছিল, সাথে ছিল ফিফা সভাপতি মসিয়ঁ জুল স্বয়ং এবং অনিচ্ছুক ফরাসি দলটির দ্বারা।

জাঁকজমক ও আড়ম্বরের সাথে উরুগুয়ে সেই বিশাল স্থাপত্যটির উদ্বোধন করল, যা নির্মাণ করতে তাদের আট মাস সময় লেগেছিল। স্টেডিয়ামটির নাম রাখা হয়েছিল 'সেন্টেনারিও', সেই সংবিধানকে উদযাপন করার জন্য, যা এক শতাব্দী আগে নারী, নিরক্ষর এবং দরিদ্রদের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল। ফাইনালে যখন উরুগুয়ে এবং আর্জেন্টিনা মুখোমুখি হয়েছিল, তখন গ্যালারিতে একটি পিনও আঁটত না।

স্টেডিয়ামটি ফেল্টের টুপি আর ট্রাইপড লাগানো ক্যামেরার ওপর ছাউনিতে ছেয়ে গিয়েছিল। গোলরক্ষকরা টুপি পরত এবং রেফারিরা কালো প্লাস ফোরস পরত।

১৯৩০ সালের বিশ্বকাপের ফাইনাল ইতালীয় দৈনিক 'লা গাজেত্তা দেলো স্পোর্ট'-এ কুড়ি লাইনের একটি কলামের বেশি গুরুত্ব পায়নি। সর্বোপরি, এটি ছিল ১৯২৮ সালের আমস্টারডাম অলিম্পিকেরই পুনরাবৃত্তি: রিভার প্লেটের দুটি দেশ বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছিল সেরা ফুটবল কোথায় খেলা হয়, যা ইউরোপকে অপমান করেছিল। '২৮-এর মতোই আর্জেন্টিনা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। প্রথমার্ধে ২-১ গোলে পিছিয়ে থেকেও উরুগুয়ে শেষ পর্যন্ত ৪-২ গোলে জিতে চ্যাম্পিয়ন হয়। ফাইনালটি পরিচালনা করার জন্য বেলজিয়ান জন ল্যাঙ্গেনাস জীবনবীমা দাবি করেছিলেন, কিন্তু গ্যালারিতে কয়েকটি ছোটখাটো হাতাহাতি ছাড়া গুরুতর কিছু ঘটেনি। এরপর, বুয়েনস আইরেসে একদল জনতা উরুগুয়ের দূতাবাসে পাথর নিক্ষেপ করে।

তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যাদের খেলোয়াড়দের মধ্যে ছিলেন সাম্প্রতিক স্কটিশ অভিবাসীদের মধ্যে কয়েকজন এবং চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে যুগোস্লাভিয়া।

একটিও ম্যাচ ড্র হয়নি। আটটি গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় শীর্ষে ছিলেন আর্জেন্টিনার স্তাবিলে, এবং পাঁচটি গোল করে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন উরুগুয়ের সিয়া। মেক্সিকোর বিপক্ষে বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথম গোলটি করেন ফ্রান্সের লুই লরেন্ট।



নাসাজ্জি

এন এমনকি এক্স-রেও তার ভেতর দিয়ে যেতে পারছিল না। তারা তাকে ডেকেছিল। ভয়ঙ্কর।

“মাঠটা একটা কলসির মতো,” তিনি বলতে ভালোবাসতেন। “আর সেই কলসির মুখটা হলো পেনাল্টি এরিয়া।”

সেখানে, বক্সের ভেতরে, সে-ই ছিল বস।

'২৪, '২৮ এবং '৩০ সালের উরুগুয়ে দলের অধিনায়ক হোসে নাসাজ্জি ছিলেন উরুগুয়ে ফুটবলের প্রথম 'কাউদিলো'। তিনি ছিলেন পুরো দলের চালিকাশক্তি, যা তাঁর সতর্কবার্তা, হতাশা এবং উৎসাহব্যঞ্জক চিৎকারের ছন্দে চলত। তাঁকে কেউ কখনো অভিযোগ করতে শোনেনি।

কামু

১৯৩০ সালে আলবার্ট কামু আলজিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল দলের হয়ে ফটকের প্রহরী আমি সেন্ট পিটারের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তিনি ছোটবেলা থেকেই গোলরক্ষক হিসেবে খেলতেন, কারণ এই অবস্থানে জুতো সহজে ক্ষয় হয় না। দরিদ্র পরিবারের সন্তান হওয়ায় কামুর মাঠে দৌড়ানোর বিলাসিতা করার সামর্থ্য ছিল না; প্রতি রাতে তার দাদি তার জুতোর তলা পরীক্ষা করতেন এবং ক্ষয়ে যাওয়া দেখলে তাকে মারধর করতেন।

গোলরক্ষক হিসেবে কাটানো বছরগুলোতে কামু অনেক কিছু শিখেছিলেন: "আমি শিখেছিলাম যে বল কখনোই সেখানে আসে না যেখানে আপনি আশা করেন। এটা আমাকে জীবনে অনেক সাহায্য করেছে, বিশেষ করে বড় শহরগুলোতে, যেখানে মানুষ সাধারণত যা দাবি করে তা হয় না।"

তিনি আরও শিখেছিলেন নিজেকে ঈশ্বর মনে না করে জিততে এবং নিজেকে তুচ্ছ মনে না করে হারতে—যে দক্ষতাগুলো সহজে অর্জন করা যায় না। তিনি মানবাত্মার বিভিন্ন রহস্য উন্মোচন করতেও শিখেছিলেন, যার গোলকধাঁধা তিনি পরবর্তীতে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় এক বিপজ্জনক যাত্রায় অন্বেষণ করেছিলেন।



জগারনটস

ওবিশ্বচ্যাম্পিয়ন উরুগুয়ের অন্যতম খেলোয়াড়, “পেরুচো” পেত্রোনে, সবকিছু গুছিয়ে ইতালিতে চলে যান। ১৯৩১ সালের এক বিকেলে ফিওরেন্তিনার হয়ে অভিষেক ম্যাচে পেত্রোনে এগারোটি গোল করেছিলেন।

তিনি সেখানে বেশিদিন টিকতে পারেননি। তিনি ইতালীয় চ্যাম্পিয়নশিপের সর্বোচ্চ গোলদাতা ছিলেন এবং ফিওরেন্তিনা তাকে সবকিছুই প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু ক্রমবর্ধমান ফ্যাসিবাদী শক্তির দাপটে পেত্রোনে দ্রুতই ক্লান্ত হয়ে পড়েন। বিরক্ত ও ঘরকুনো হয়ে তিনি মন্টেভিডিওতে ফিরে যান, যেখানে কিছুদিন তিনি তার সেই ধ্বংসাত্মক গোলগুলো করা চালিয়ে যান। ত্রিশ বছর বয়স হওয়ার আগেই তাকে চিরতরে ফুটবল ছেড়ে দিতে হয়েছিল।

ফিওরেন্টিনার সাথে চুক্তি ভঙ্গ করার কারণে ফিফা তাকে বের করে দিয়েছে।

লোকে বলে পেত্রোনের শট নাকি দেয়ালও ভেঙে ফেলতে পারে। কে জানে? একজন। একটা বিষয় নিশ্চিত: এটা গোলরক্ষকদের কাবু করত এবং জাল ভেদ করে যেত।

এদিকে, রিভার প্লেটের অপর তীরে, আর্জেন্টিনার বের্নাবে ফেরেইরাও যেন আবিষ্টের মতো গোল করার চেষ্টা করছিলেন। প্রতিটি দলের সমর্থকেরা ‘দ্য ওয়াইল্ড অ্যানিমেল’-কে দেখতে গিয়েছিল, যিনি রক্ষণাত্মক খেলা দিয়ে শুরু করে, প্রতিপক্ষের রক্ষণ ভেদ করে বল জালে জড়িয়ে গোলরক্ষককে পরাস্ত করছিলেন।

প্রতিটি ম্যাচের আগে ও পরে এবং বিরতির সময়েও, বার্নাবের গোলাবর্ষণের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রচিত একটি ট্যাঙ্গো গান লাউডস্পিকারে বাজানো হতো। ১৯৩২ সালে ‘ক্রিটিকা’ পত্রিকা সেই গোলরক্ষকের জন্য একটি মোটা অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করে, যিনি তাকে গোল করা থেকে আটকাতে পারবেন। সেই বছরের এক বিকেলে, বার্নাবেকে একদল সাংবাদিকের সামনে তার জুতো খুলতে হয়েছিল এটা প্রমাণ করার জন্য যে তার জুতোর সামনের অংশে কোনো লোহার রড লুকানো নেই।

পেশাদার হয়ে ওঠা

ই যদিও সাম্প্রতিক কেলেঙ্কারিগুলো ("হাত-পা পরিষ্কার") ইতালির সবচেয়ে বড় ক্লাবগুলোর কর্তাদেরকে বিপাকে ফেলেছে, ফুটবল এখনও দেশটির দশটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের মধ্যে অন্যতম এবং এটি দক্ষিণ আমেরিকান খেলোয়াড়দের জন্য একটি আকর্ষণ কেন্দ্র হিসেবেই রয়ে গেছে।

মুসোলিনির আমল থেকেই ইতালি ছিল এক তীর্থস্থান। পৃথিবীর আর কোথাও এত ভালো পারিশ্রমিক দেওয়া হতো না। খেলোয়াড়রা মালিকদের হুমকি দিত, "আমি ইতালিতে যাচ্ছি," আর সেই জাদুকরী কথাগুলোই টাকার থলি খুলে দিত। কেউ কেউ সত্যিই যেত, বুয়েনস আইরেস, মন্টেভিডিও, সাও পাওলো এবং রিও ডি জেনিরো থেকে জাহাজে করে যাত্রা করত, এবং যদি তাদের ইতালীয় বাবা-মা বা দাদা-দাদি না থাকত, তাহলে রোমের কেউ একজন তৎক্ষণাৎ নাগরিকত্বের জন্য সাথে সাথে একটি ভুয়া পরিবার তৈরি করে দিত।

খেলোয়াড়দের দেশত্যাগ আমাদের দেশগুলোতে পেশাদার ফুটবলের জন্মের অন্যতম কারণ ছিল। ১৯৩১ সালে আর্জেন্টিনা পেশাদার ফুটবলে রূপান্তরিত হয় এবং পরের বছর উরুগুয়েও তাদের পথ অনুসরণ করে। ব্রাজিলে ১৯৩৪ সালে একটি পেশাদার লীগ চালু হয়। তখনই তারা পূর্বে গোপনে করা অর্থপ্রদানকে বৈধতা দেয় এবং খেলোয়াড় একজন কর্মীতে পরিণত হয়। চুক্তিটি তাকে আজীবনের জন্য ক্লাবের সাথে পূর্ণকালীনভাবে আবদ্ধ করে রাখত এবং দল তাকে বিক্রি না করা পর্যন্ত সে তার কর্মস্থল পরিবর্তন করতে পারত না। একজন কারখানার শ্রমিকের মতো, খেলোয়াড় মজুরির বিনিময়ে তার শ্রম দিত এবং মাঠে সে জমিদারের ভূমিদাসের মতোই একজন বন্দীতে পরিণত হতো। কিন্তু শুরুর দিকে পেশাদার ফুটবলের চাহিদা খুব বেশি ছিল না: সপ্তাহে মাত্র দুই ঘণ্টা বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ। আর্জেন্টিনায় ডাক্তারের ছাড়পত্র ছাড়া অনুশীলনে অনুপস্থিত থাকলে পাঁচ পেসো জরিমানা দিতে হতো।



১৯৩৪ সালের বিশ্বকাপ

জে জনি ওয়েইসমুলার তার প্রথম টারজান চিৎকার দিচ্ছিলেন, প্রথম গণ-উৎপাদিত ডিওডোরেন্ট বাজারে আসছিল, এবং লুইজিয়ানা পুলিশ ছিল বনি ও ক্লাইডকে গুলি করে নামানো হচ্ছিল। দক্ষিণ আমেরিকার দুটি দরিদ্রতম দেশ বলিভিয়া ও প্যারাগুয়ে স্ট্যান্ডার্ড অয়েল ও শেলের নামে যুদ্ধ করছিল এবং চ্যাকোতে তেলের জন্য রক্তক্ষরণ করছিল। নিকারাগুয়ায় মেরিনদের পরাজিত করার পর সান্দিনো এক অতর্কিত হামলায় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হচ্ছিলেন এবং সেই হত্যাকারী সোমোজা তার রাজবংশের উদ্বোধন করছিলেন। চীনে মাও তার লং মার্চ শুরু করছিলেন। জার্মানিতে হিটলার থার্ড রাইখের ফ্যুয়েরার হিসেবে অভিষিক্ত হচ্ছিলেন এবং আর্য জাতিকে রক্ষার জন্য এমন আইন জারি করছিলেন, যা অপরাধী ও বংশগত রোগে আক্রান্ত যে কাউকে বাধ্যতামূলকভাবে বন্ধ্যাকরণ করতে বাধ্য করছিল, আর এদিকে ইতালিতে মুসোলিনি দ্বিতীয় বিশ্বকাপের উদ্বোধন করছিলেন।

চ্যাম্পিয়নশিপের পোস্টারগুলোতে দেখা যেত, হারকিউলিস তার পায়ের উপর একটি বল রেখে ফ্যাসিস্ট স্যালুট দিচ্ছে। ইল ডুচের জন্য রোমে অনুষ্ঠিত ১৯৩৪ সালের বিশ্বকাপ ছিল একটি সুপরিকল্পিত প্রচার অভিযান। মুসোলিনি প্রতিটি ম্যাচে উপস্থিত থাকতেন, সম্মানসূচক বক্সে বসে, কালো শার্টে ভরা গ্যালারির দিকে চিবুক তুলে। ইতালীয় দলের এগারোজন খেলোয়াড় তাদের ডান হাত প্রসারিত করে নিজেদের বিজয়গুলো তাকে উৎসর্গ করতেন।



কিন্তু শিরোপা জয়ের পথ সহজ ছিল না। ইতালি ও স্পেনের মধ্যকার দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচটি বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে কষ্টসাধ্য ম্যাচ হিসেবে পরিগণিত হয়। এই লড়াই ২১০ মিনিট ধরে চলেছিল এবং পরের দিন পর্যন্ত শেষ হয়নি, ততদিনে যুদ্ধের ক্ষত বা চরম ক্লান্তির কারণে বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় মাঠের বাইরে চলে গিয়েছিলেন। ইতালি জিতলেও তাদের শুরুর একাদশের চারজন খেলোয়াড়কে ছাড়াই মৌসুম শেষ করে, আর স্পেনের ছিল সাতজন। আহত স্প্যানিশদের মধ্যে ছিলেন দলের সেরা দুই খেলোয়াড়: স্ট্রাইকার লাঙ্গারা এবং গোলরক্ষক জামোরা, যিনি বক্সে পা রাখা যে কাউকেই সম্মোহিত করে ফেলতেন।

ইতালি ন্যাশনাল ফ্যাসিস্ট পার্টি স্টেডিয়ামে চেকোস্লোভাকিয়ার বিপক্ষে ফাইনাল খেলে এবং ২-১ গোলে জয়লাভ করে। সম্প্রতি ইতালীয় নাগরিকত্ব পাওয়া দুই আর্জেন্টাইন খেলোয়াড় তাদের ভূমিকা পালন করেন: ওরসি গোলরক্ষককে ড্রিবল করে প্রথম গোলটি করেন এবং অপর আর্জেন্টাইন, গুয়াইতা, শিয়াভিওকে একটি পাস দেন যা থেকে করা গোলটি ইতালিকে তাদের প্রথম বিশ্বকাপ এনে দেয়।

১৯৩৪ সালে ষোলটি দেশ অংশগ্রহণ করেছিল: ইউরোপ থেকে বারোটি এবং লাতিন আমেরিকা থেকে তিনটি, সাথে বাকি বিশ্বের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে মিশর। তৎকালীন চ্যাম্পিয়ন উরুগুয়ে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, কারণ মন্টেভিডিওতে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্বকাপে ইতালি আসেনি।

জার্মানি ও অস্ট্রিয়া যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করে। চেক প্রজাতন্ত্রের নেজেডলি পাঁচটি গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতা হন, এরপর জার্মানির কোনেন ও ইতালির শিয়াভিও প্রত্যেকে চারটি করে গোল করেন।



রিও ডি জেনিরোতে ঈশ্বর ও শয়তান

ও ১৯৩৭ সাল যখন শেষের দিকে, এক বর্ষণমুখর রাতে শত্রুপক্ষের এক সমর্থক ভাস্কো দা গামার খেলার মাঠে একটি ব্যাঙ পুঁতে দিয়ে অভিশাপ দিয়েছিল: "আগামী বারো বছরে ভাস্কো কোনো চ্যাম্পিয়নশিপ জিতবে না!"

তারা তা করবে না, যদি স্বর্গে কোনো ঈশ্বর থেকে থাকেন!" তিনি একটি সাধারণ দলের সমর্থক ছিলেন, যে দলকে ভাস্কো দা গামা ১২-০ গোলে হারিয়েছিল; তার নাম ছিল আরুবিনহা।

বছরের পর বছর ধরে সমর্থক ও খেলোয়াড় উভয়েই মাঠের ভেতরে ও বাইরে সেই ব্যাঙটিকে খুঁজেছে। তারা কখনোই তাকে খুঁজে পায়নি। খেলার মাঠটা এতটাই খানাখন্দে ভরা ছিল যে, দেখতে চাঁদের পৃষ্ঠের মতো লাগত। ভাস্কো দা গামা ব্রাজিলের সেরা খেলোয়াড়দের দলে নিয়েছিলেন, সত্যিকারের পরাশক্তি হিসেবে দল গড়ে তুলেছিলেন, কিন্তু তারা হারতেই থাকল।

অবশেষে ১৯৪৫ সালে দলটি রিও ট্রফি জিতে অভিশাপ ভাঙল। ১৯৩৪ সালের পর তারা আর চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। এগারো বছরের খরা। "ঈশ্বর আমাদের কিছুটা ছাড় দিয়েছিলেন," ক্লাবের সভাপতি মন্তব্য করলেন।

অনেক পরে, ১৯৫৩ সালে, সমস্যায় থাকা দলটি ছিল ফ্লামেঙ্গো—শুধু রিও ডি জেনিরোতেই নয়, সমগ্র ব্রাজিলের সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্লাব, এবং একমাত্র দল যারা যেখানেই খেলে সেখানেই নিজেদের ঘরের মাঠ হিসেবে খেলে। তাদের সমর্থকেরা, যারা বিশ্বে সবচেয়ে সংখ্যায় ও একনিষ্ঠ, তারা ক্ষুধায় মারা যাচ্ছিল। তখন ফাদার গোয়েস নামের একজন ক্যাথলিক যাজক জয়ের নিশ্চয়তা দিলেন, এই শর্তে যে খেলোয়াড়রা প্রতিটি ম্যাচের আগে তাঁর প্রার্থনাসভায় যোগ দেবে এবং বেদীর সামনে হাঁটু গেড়ে জপমালা পাঠ করবে।

ফ্লামেঙ্গো টানা তিন বছর চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিল। তাদের প্রতিপক্ষরা কার্ডিনাল জাইমে কামারার কাছে প্রতিবাদ জানায়: ফ্লামেঙ্গো নিষিদ্ধ অস্ত্র ব্যবহার করছিল। ফাদার গোয়েস আত্মপক্ষ সমর্থন করে দাবি করেন যে, তিনি কেবল তাদের প্রভুর পথ দেখিয়েছিলেন। খেলোয়াড়রা তাদের কালো ও লাল পুঁতির জপমালা পাঠ করা চালিয়ে যায়, যে রঙগুলো শুধু ফ্লামেঙ্গোরই নয়, বরং আরও অনেকের।

আফ্রিকান দেবতা যিনি একই সাথে যিশু ও শয়তানের রূপ ধারণ করেন। চতুর্থ বছরে ফ্লামেঙ্গো চ্যাম্পিয়নশিপ হেরে যায়। খেলোয়াড়রা উপাসনায় যাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং আর কখনও জপমালা পাঠ করেনি। ফাদার গোয়েস রোমে পোপের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি কখনও উত্তর দেননি।

অন্যদিকে, ফাদার রোমুয়ালদো ফ্লুমিনেন্সে অংশীদার হওয়ার জন্য পোপের অনুমতি লাভ করেন। যাজকটি প্রতিটি অনুশীলন অধিবেশনে উপস্থিত থাকতেন।
খেলোয়াড়রা ব্যাপারটা মোটেও পছন্দ করেনি। ফ্লুমিনেন্সের শেষবার রিও ট্রফি জেতার পর বারো বছর কেটে গেছে, আর মাঠের ধারে ওই বড় কালো পাখিটার দাঁড়িয়ে থাকাটা ছিল অশুভ। খেলোয়াড়রা তাকে গালিগালাজ করতে লাগল, তারা জানত না যে ফাদার রোমুয়ালদো জন্ম থেকেই বধির ছিলেন।

একদিন ফ্লুমিনেন্স জিততে শুরু করল। তারা একটার পর একটা চ্যাম্পিয়নশিপ জিতল। এখন খেলোয়াড়রা শুধু ফাদার রোমুয়ালদোর ছায়ায় অনুশীলন করত। প্রত্যেক গোলের পর তারা তাঁর যাজকের পোশাকে চুম্বন করত। সপ্তাহান্তে যাজক সম্মানের বক্স থেকে খেলা দেখতেন এবং রেফারি ও প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে কী যে বিড়বিড় করতেন, তা কে জানে।





দুর্ভাগ্যের উৎস

ই সবাই জানে যে ব্যাঙ বা গাছের ছায়ার উপর পা রাখা, মইয়ের নিচ দিয়ে হাঁটা, উল্টো হয়ে বসা বা ঘুমানো, ঘরের ভেতরে ছাতা খোলা, নিজের দাঁত গোনা বা আয়না ভাঙা অশুভ। কিন্তু

ফুটবল যা কেবল উপরিভাগকেই স্পর্শ করে।

১৯৮৬ এবং ১৯৯০ সালের বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা দলের কোচ কার্লোস বিলার্দো তাঁর খেলোয়াড়দের মুরগির মাংস খেতে দিতেন না, কারণ তাঁর মতে এটি দুর্ভাগ্য বয়ে আনত। তিনি তাদের গরুর মাংস খাওয়াতেন, যা খাওয়ার ফলে তাদের শরীরে ইউরিক অ্যাসিড তৈরি হতো।

মিলানের মালিক সিলভিও বেরলুসকোনি সমর্থকদের ক্লাবের ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীত “মিলান, মিলান” গাইতে নিষেধ করেছিলেন, কারণ এর অশুভ কম্পন তার খেলোয়াড়দের পা অসাড় করে দিত; ১৯৮৭ সালে তিনি “মিলান নেই নোস্ত্রি কুওরি” নামে একটি নতুন সঙ্গীত তৈরি করান।

কলম্বিয়ার কৃষ্ণকায় দৈত্য ফ্রেডি রিনকন '৯৪ বিশ্বকাপে তার অসংখ্য ভক্তকে হতাশ করেছিলেন। তিনি বিন্দুমাত্র উৎসাহ ছাড়াই খেলেছিলেন। পরে আমরা জানতে পারলাম যে, এর কারণ ইচ্ছার অভাব ছিল না, বরং ছিল অতিরিক্ত ভয়। কলম্বিয়ার উপকূলে রিনকনের বাড়ি বুয়েনাভেন্তুরার এক ভবিষ্যদ্বক্তা চ্যাম্পিয়নশিপের ফলাফল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যা ঠিক ভবিষ্যদ্বাণীর মতোই ঘটেছিল, এবং সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, রিনকন খুব সতর্ক না হলে তার পা ভেঙে যাবে। তিনি বলের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, “ফ্রিকলস দেওয়া মেয়েটির থেকে সাবধান, এবং হেপাটাইটিসে আক্রান্ত ছেলেটির থেকে, আর রক্তে মাখা ছেলেটির থেকে,” যা রেফারির হলুদ ও লাল কার্ডের দিকে ইঙ্গিত করছিল।

সেই কাপের ফাইনালের প্রাক্কালে, ইতালীয় জাদুবিদ্যার বিশেষজ্ঞরা ঘোষণা করেছিলেন যে তাদের দেশ জিতবে। ইতালীয় জাদুকর সমিতি সংবাদমাধ্যমকে আশ্বস্ত করে বলেছিল, “কালো জাদুর অসংখ্য অশুভ আত্মা ব্রাজিলকে পরাজিত করবে।” এর বিপরীত ফলাফল এই পেশার মর্যাদা বাড়াতে পারেনি।



তাবিজ এবং মন্ত্র

এম যেকোনো খেলোয়াড় যখন প্রথমে তাদের ডান পা রাখে এবং নিজেদের বুকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকে তারা মাঠে প্রবেশ করে। কেউ কেউ সরাসরি খালি গোলের দিকে যায় এবং একটা লাথি মেরে ভেতরে ঢোকাও বা পোস্টে চুমু খাও। অন্যরা ঘাস ছুঁয়ে নিয়ে আসে। তাদের আঙুলগুলো ঠোঁটে।

প্রায়শই দেখা যায় কোনো খেলোয়াড়ের গলায় একটা ছোট পদক বা কব্জিতে একটা জাদুর ব্যান্ড বাঁধা। তার পেনাল্টি কিক যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তার কারণ হলো কেউ বলে থুতু দিয়েছে। সে যদি একটা সহজ শট মিস করে, তার কারণ হলো কোনো ডাইনি শত্রুপক্ষের গোলপোস্ট বন্ধ করে দিয়েছে। আর সে যদি ম্যাচটা হেরে যায়, তার কারণ হলো গত জয়ের পর সে তার জার্সিটা বিলিয়ে দিয়েছে।

আর্জেন্টিনার ক্লাব রিভার প্লেটের গোলরক্ষক আমাদেও কারিজো দিনরাত পরা একটি টুপির কৃপায় আটটি ম্যাচে তার গোলপোস্ট অক্ষত রেখেছিলেন। সেই টুপিটি গোলপোস্টের সমস্ত অশুভ শক্তিকে দূর করে দিত। একদিন বিকেলে বোকা জুনিয়র্সের খেলোয়াড় অ্যাঞ্জেল ক্লেমেন্তে রোজাস সেটি চুরি করে নিয়ে যায়। সেই রক্ষাকবচ ছাড়া কারিজো দুটি গোল হজম করেন এবং রিভার ম্যাচটি হেরে যায়।

স্পেনের একজন শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড়, পাবলো এর্নান্দেস করোনাদো বলেন যে, রিয়াল মাদ্রিদ যখন তাদের স্টেডিয়াম সংস্কার করেছিল, তখন দলটি টানা ছয় বছর কোনো শিরোপা জিততে পারেনি। অবশেষে একজন ভক্ত খেলার মাঠের মাঝখানে এক কোয়া রসুন পুঁতে দিয়ে সেই অভিশাপ ভাঙেন। বার্সেলোনার বিখ্যাত ফরোয়ার্ড লুইস সুয়ারেজ অভিশাপে বিশ্বাস করতেন না, কিন্তু তিনি জানতেন যে খাওয়ার সময় যখনই তিনি ওয়াইনের গ্লাস ফেলে দিতেন, তখনই তিনি কয়েকটি গোল করবেন।

পরাজয়ের অশুভ শক্তিকে আহ্বান করতে সমর্থকেরা শত্রুপক্ষের মাঠে লবণ ছিটিয়ে দেয়। তাদের ভয় দেখানোর জন্য, তারা নিজেদের জমিতে মুঠো মুঠো গম বা ধান বপন করে। অন্যরা মোমবাতি জ্বালায়, পৃথিবীকে আখের মদ নিবেদন করে, অথবা সমুদ্রে ফুল নিক্ষেপ করে।

কিছু ভক্ত নাজারেথের যিশু এবং আগুনে পুড়ে, ডুবে বা পথ হারিয়ে মৃত্যুবরণকারী পুণ্যবান আত্মাদের কাছে প্রার্থনা করে সুরক্ষা খোঁজেন। বেশ কয়েকটি স্থানে সেন্ট জর্জের বর্শা এবং তাঁর আফ্রিকান যমজ ভাই ওগুমের বর্শা কুদৃষ্টির ড্রাগনের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে।

চিন্তাশীল অঙ্গভঙ্গি প্রশংসিত হয়। দেবতাদের কৃপাধন্য ভক্তরা দলের পতাকায় নিজেদের জড়িয়ে খাড়া ঢাল বেয়ে হাঁটু গেড়ে ওঠেন, অথবা তারা তাদের বাকি জীবনটা শপথ নেওয়া লক্ষ লক্ষ জপমালা ফিসফিস করে পাঠ করে কাটান। ১৯৫৭ সালে যখন বোটাফোগো চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল, দিদি ড্রেসিংরুমে না গিয়েই মাঠ ছেড়েছিলেন এবং তখনও ইউনিফর্ম পরা অবস্থাতেই তার পৃষ্ঠপোষক সাধুকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছিলেন: তিনি রিও ডি জেনিরো শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছিলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যপীড়িত ফুটবল খেলোয়াড়দের সাহায্যে এগিয়ে আসার মতো সময় দেবতাদের সবসময় থাকে না। ১৯৩০ সালের বিশ্বকাপে মেক্সিকান দলটি হতাশাবাদী ভবিষ্যদ্বাণীতে জর্জরিত হয়েই এসেছিল। ফ্রান্সের বিপক্ষে ম্যাচের ঠিক আগে, মেক্সিকান কোচ হুয়ান লুকে দে সেরালোঙ্গা মন্টেভিডিওতে তার হোটেলে খেলোয়াড়দের উৎসাহমূলক বক্তৃতা দেন। তিনি তাদের আশ্বাস দেন যে, তেপেয়াক পাহাড়ে তাদের নিজ দেশে ভার্জিন অফ গুয়াদালুপে তাদের জন্য প্রার্থনা করছেন।

কোচকে ভার্জিনের ব্যস্ত সময়সূচী সম্পর্কে জানানো হয়নি। ফ্রান্স চারটি গোল করেছিল এবং মেক্সিকো সর্বশেষ স্থানে ছিল।



এরিকো

ডি চাকো যুদ্ধের সময়, যখন বলিভিয়া ও প্যারাগুয়েের কৃষকেরা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন প্যারাগুয়েের ফুটবল খেলোয়াড়েরা অন্যান্য দেশে খেলছিল সেইসব অসহায়ভাবে আহতদের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, যারা এমন এক মরুভূমিতে প্রাণ হারিয়েছিল যেখানে কোনো পাখি গান গাইত না এবং মানুষের কোনো পদচিহ্ন থাকত না।
এভাবেই আর্সেনিও এরিকো বুয়েনস আইরেসে এসেছিলেন এবং সেখানেই থেকে যান। আর্জেন্টিনার সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা ছিলেন একজন প্যারাগুয়েয়ান। এরিকো এক মৌসুমে চল্লিশটিরও বেশি গোল করতেন।

সেই জাদুকরের শরীরে যেন গোপন স্প্রিং লুকানো ছিল। সে হাঁটু না বাঁকিয়েই লাফ দিতে পারত, এবং তার মাথা সবসময় গোলকিপারের হাতের চেয়েও উঁচুতে পৌঁছাত। তার পা দুটো যত বেশি শিথিল দেখাত, ততই শক্তিশালীভাবে সেগুলো গোলে আছড়ে পড়ত। প্রায়শই এরিকো তার হিল দিয়ে সজোরে বল জালে জড়াত। ফুটবলের ইতিহাসে এর চেয়ে মারাত্মক ব্যাকহিল আর ছিল না।

যখন এরিকো গোল করছিলেন না, তখন তিনি যেন গোলগুলো সাজিয়ে দিচ্ছিলেন।
তার সতীর্থদের। কাতুলো কাস্তিলো তাকে একটি ট্যাঙ্গো উৎসর্গ করেছিলেন:

> আপনার হিল বা হেড দিয়ে করা পাস এমনই এক
> বিস্ময়কর কীর্তি যে
> হাজার বছরেও এর পুনরাবৃত্তি দেখা যাবে না।

এবং তিনি তা করেছিলেন একজন নৃত্যশিল্পীর সাবলীল ভঙ্গিতে। তাঁকে খেলতে দেখে ফরাসি লেখক পল মোরান্ড মন্তব্য করেছিলেন, “ইনিই নিজিনস্কি।”



১৯৩৮ সালের বিশ্বকাপ

এম অ্যাক্স থেইলার হলুদ জ্বরের জন্য একটি টিকা আবিষ্কার করছিলেন, রঙ ফটোগ্রাফির জন্ম হচ্ছিল, ওয়াল্ট ডিজনি 'স্নো' চালু করছিলেন। হোয়াইট, এবং আইজেনস্টাইন আলেকজান্ডার নেভস্কির চিত্রগ্রহণ করছিলেন । এর কিছুদিন আগেই হার্ভার্ডের এক অধ্যাপকের দ্বারা আবিষ্কৃত নাইলন দিয়ে প্যারাসুট এবং মহিলাদের মোজা তৈরি করা হচ্ছিল।

আর্জেন্টিনার কবি আলফোনসিনা স্তোর্নি ও লিওপোল্ডো লুগোনেস আত্মহত্যা করছিলেন। লাজারো কার্দেনাস মেক্সিকোর তেল জাতীয়করণ করছিলেন এবং একটি অবরোধ ও অন্যান্য পশ্চিমা আক্রোশের সম্মুখীন হচ্ছিলেন। অরসন ওয়েলস সরলমনাদের ভয় দেখানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রে মঙ্গলগ্রহের আক্রমণের কথা প্রচার করছিলেন, অন্যদিকে স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কার্দেনাসের ধর্মদ্রোহিতার শাস্তি দিতে এবং তার হীন দৃষ্টান্তের অবসান ঘটাতে মেক্সিকোতে একটি সত্যিকারের আক্রমণের দাবি জানাচ্ছিল।

ইতালিতে 'ম্যানিফেস্টো অন রেস' লেখা হচ্ছিল এবং ইহুদি-বিদ্বেষী হামলা বাড়ছিল। জার্মানি অস্ট্রিয়া দখল করছিল; হিটলার ইহুদিদের খুঁজে খুঁজে হত্যা করছিলেন এবং ভূখণ্ড গ্রাস করছিলেন। ইংরেজ সরকার জনগণকে খাদ্য মজুত করার নির্দেশ দিচ্ছিল এবং বিষাক্ত গ্যাসের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার কৌশল শেখাচ্ছিল। ফ্রাঙ্কো স্প্যানিশ প্রজাতন্ত্রের শেষ ঘাঁটিগুলোকে কোণঠাসা করছিলেন এবং ভ্যাটিকানের স্বীকৃতি পাচ্ছিলেন। প্যারিসে সিজার ভ্যালেহো মৃত্যুবরণ করছিলেন, সম্ভবত মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে, আর সার্ত্র তখন প্রকাশ করছিলেন 'নসিয়া'। আর সেখানেই, প্যারিসে, আসন্ন যুদ্ধের ঘনিয়ে আসা ছায়ার নিচে, যেখানে সেই কলঙ্কজনক সময়ের নিন্দা জানাতে পিকাসোর ' গের্নিকা' প্রদর্শিত হচ্ছিল, তৃতীয় বিশ্বকাপ শুরু হতে যাচ্ছিল। কলম্বেস স্টেডিয়ামে ফরাসি রাষ্ট্রপতি আলবার্ট লেব্রুন আনুষ্ঠানিক কিকঅফ করলেন: তিনি বল লক্ষ্য করে লাথি মারলেও তা মাটিতে গিয়ে লাগল।



আগের কাপের মতোই, এটিও ছিল একটি ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপ। ইউরোপের এগারোটি দেশের সাথে মাত্র দুটি দক্ষিণ আমেরিকান দেশ যোগ দিয়েছিল। ইন্দোনেশিয়ার একটি দল, যা তখনও ডাচ ইস্ট ইন্ডিজ নামে পরিচিত ছিল, বাকি বিশ্বের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে প্যারিসে এসেছিল।

জার্মানির দলে সদ্য অধিগ্রহণ করা অস্ট্রিয়া থেকে পাঁচজন খেলোয়াড়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এভাবে শক্তিশালী হয়ে, বুকে স্বস্তিকা চিহ্ন এবং হাতে নাৎসি শক্তির সমস্ত প্রতীক নিয়ে জার্মান দলটি অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে এবং নিজেদের অপরাজেয় দাবি করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানের সুইজারল্যান্ডের কাছে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। এই জার্মান পরাজয়ের কয়েকদিন পরেই নিউইয়র্কে আর্য আধিপত্য আরেকটি বড় ধাক্কা খায়, যখন কৃষ্ণাঙ্গ বক্সার জো লুইস জার্মান চ্যাম্পিয়ন ম্যাক্স শ্মেলিংকে গুঁড়িয়ে দেন।

অন্যদিকে, ইতালি আগের বিশ্বকাপের লড়াইয়েরই পুনরাবৃত্তি ঘটাল। সেমিফাইনালে আজ্জুরিরা ব্রাজিলকে পরাজিত করে। একটি পেনাল্টি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল, কিন্তু ব্রাজিলের প্রতিবাদ বৃথা যায়। '৩৪-এর মতোই, সব রেফারিই ছিলেন ইউরোপীয়।

এরপর এলো ফাইনাল: ইতালি বনাম হাঙ্গেরি। মুসোলিনির কাছে জয়লাভ করাটা ছিল রাষ্ট্রীয় বিষয়। ম্যাচের আগের দিন ইতালীয় খেলোয়াড়রা রোম থেকে ফ্যাসিস্ট নেতার স্বাক্ষরিত তিন শব্দের একটি টেলিগ্রাম পায়: "জিতো অথবা মরো।"
তাদের মরতে হয়নি, কারণ ইতালি ৪-২ গোলে জিতেছিল। পরের দিন বিজয়ীরা ইল ডুচের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাপনী অনুষ্ঠানে সামরিক পোশাক পরেছিল।

দৈনিক লা গাজেত্তা দেলো স্পোর্ট "জাতির এই বিজয়ের দ্বারা প্রতীকায়িত ফ্যাসিবাদী ক্রীড়ার পরাকাষ্ঠা"-কে মহিমান্বিত করেছিল। এর কিছুদিন আগেই, সরকারি সংবাদমাধ্যম ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ইতালির বিজয়কে এই শব্দে উদযাপন করেছিল: "আমরা নিগ্রোদের পাশবিক শক্তির ওপর ইতালীয় বুদ্ধিমত্তার বিজয়কে অভিবাদন জানাই।"

কিন্তু আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমই টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়দের বেছে নিয়েছিল, যাদের মধ্যে ছিলেন দুই কৃষ্ণাঙ্গ—ব্রাজিলিয়ান লিওনিদাস ও দোমিঙ্গোস দা গুইয়া। সাতটি গোল করে লিওনিদাস ছিলেন সর্বোচ্চ গোলদাতা, এবং ছয়টি গোল করে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন হাঙ্গেরিয়ান জেঙ্গেলার। লিওনিদাসের করা সবচেয়ে সুন্দর গোলটি এসেছিল পোল্যান্ডের বিপক্ষে। মুষলধারে ঝড়ের মধ্যে খেলতে গিয়ে তিনি পেনাল্টি এলাকার কাদায় তার জুতো হারিয়ে ফেলেন এবং খালি পায়েই গোলটি করেন।



মেয়াজ্জার গোল

ঘটনাটি ছিল ১৯৩৮ সালের বিশ্বকাপের। সেমিফাইনালে ইতালি ও ব্রাজিল ছিল

আমি হয় সব, নয়তো কিছুই না—এই দুইয়ের জন্য জীবন বাজি রাখা।

ইতালীয় স্ট্রাইকার পিওলা যেন গুলিবিদ্ধ হওয়ার মতো হঠাৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন এবং আঙুলের শেষ প্রাণশক্তিটুকু দিয়ে ব্রাজিলীয় ডিফেন্ডার ডোমিঙ্গোস দা গুইয়ার দিকে ইশারা করলেন। রেফারি তাঁর কথা বিশ্বাস করে বাঁশি বাজালেন: পেনাল্টি।

ব্রাজিলিয়ানরা যখন তীব্র চিৎকারে ফেটে পড়ছিল এবং পিওলা উঠে দাঁড়িয়ে নিজের গা ঝাড়ছিলেন, ঠিক তখনই জিউসেপ্পে মেয়াৎজা বলটিকে একেবারে ফায়ারিং পয়েন্টে রাখলেন।

মেয়াৎজা ছিল ছবির নায়ক-চতুর পুরুষ। খাটো, সুদর্শন এই ল্যাটিন প্রেমিক এবং পেনাল্টি কিকের দক্ষ গোলন্দাজ সে; চূড়ান্ত আক্রমণের আগে একজন ম্যাটাডোরের মতো সে গোলরক্ষকের দিকে চিবুক তুলে ধরল। তার পা, হাতের মতোই কোমল ও দক্ষ, কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হতো না। কিন্তু ব্রাজিলিয়ান গোলরক্ষক ওয়াল্টার পেনাল্টি কিক আটকাতে পারদর্শী ছিল এবং বেশ আত্মবিশ্বাসী ছিল।

মেয়াৎজা দৌড় শুরু করলেন এবং কিকটা নেওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে তাঁর শর্টস খুলে গেল। দর্শকরা হতবাক হয়ে গেল এবং রেফারি প্রায় তাঁর বাঁশি গিলে ফেলেছিলেন। কিন্তু মেয়াৎজা এক মুহূর্তও না থেমে এক হাতে নিজের প্যান্ট তুলে নিলেন এবং হাসিতে অসহায় গোলরক্ষককে মাটিতে ফেলে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য করলেন।

ওই গোলটিই ইতালিকে ফাইনালে পৌঁছে দিয়েছিল।

লিওনিডাস

এইচ তার আকার, গতি এবং ধূর্ততা ছিল মশার মতো। '৩৮-এর দশকে বিশ্বকাপে প্যারিসের একজন সাংবাদিক ম্যাচে তার ছয়টি পা গণনা করা হয়েছিল এবং এর জন্য কালো জাদু দায়ী বলে ইঙ্গিত করা হয়েছিল। আমি জানি না সাংবাদিকটি খেয়াল করেছিলেন কিনা, কিন্তু লিওনিদাসের অসংখ্য পা-গুলোর কয়েক গজ পর্যন্ত লম্বা হয়ে ভাঁজ হয়ে যাওয়া বা গিঁট পাকিয়ে ফেলার এক শয়তানি ক্ষমতা ছিল।

যেদিন ব্রাজিলের কিংবদন্তি আর্থার ফ্রিডেনরাইখ, যাঁর বয়স তখন চল্লিশের কোঠায়, অবসর নিলেন, সেদিনই লিওনিদাস দা সিলভা মাঠে নেমেছিলেন। সেই প্রবীণ গুরুর কাছ থেকে রাজদণ্ড গ্রহণ করলেন লিওনিদাস। এর কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর নামে একটি সিগারেটের ব্র্যান্ড এবং একটি ক্যান্ডি বারের নামকরণ করা হলো। তিনি একজন চলচ্চিত্র তারকার চেয়েও বেশি ভক্তদের চিঠি পেতেন; সেই চিঠিগুলোতে তাঁর কাছে একটি ছবি, একটি অটোগ্রাফ অথবা একটি সরকারি চাকরির জন্য অনুরোধ করা হতো।

লিওনিদাস অনেক গোল করেছিলেন কিন্তু সেগুলো কখনো গণনা করেননি। কয়েকটি গোল তিনি শূন্যে করতেন, গোলপোস্টের দিকে পিঠ করে উল্টো হয়ে পা ঘুরিয়ে। তিনি ‘ চিলেনা’ নামক অ্যাক্রোব্যাটিক্সে দক্ষ ছিলেন, যেটিকে ব্রাজিলিয়ানরা ‘বাইসাইকেল’ বলে।

লিওনিদাসের গোলগুলো এতটাই সুন্দর ছিল যে এমনকি গোলরক্ষকও উঠে তাকে অভিনন্দন জানাতেন।



ডোমিঙ্গোস

টি পূর্বে, চীনের মহাপ্রাচীর। পশ্চিমে, ডোমিঙ্গোস দা গুইয়া।

ফুটবলের সমগ্র ইতিহাসে তার চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য ফুলব্যাক আর কেউ ছিল না।

ডোমিঙ্গোস চারটি শহরে—রিও ডি জেনেইরো, সাও পাওলো, মন্টেভিডিও এবং বুয়েনস আইরেস—চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন এবং এই চারটি শহরেই তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি যখন খেলতেন, স্টেডিয়ামগুলো সবসময় কানায় কানায় পূর্ণ থাকত।

ফুলব্যাকরা আক্রমণকারী স্ট্রাইকারদের গায়ে পাল্টে থাকত এবং যত দ্রুত সম্ভব বল কেড়ে নিয়ে পা পুড়িয়ে দেওয়ার আগেই আকাশে উড়িয়ে দিত। এর বিপরীতে, ডোমিঙ্গোস তার প্রতিপক্ষদের বৃথা দৌড়ে যেতে দিয়ে নিজে বল কেড়ে নিত; তারপর বক্স থেকে বল বের করে আনতে সে অফুরন্ত সময় নিত। অবিচলিত স্বভাবের এই মানুষটি সবসময় শিস দিত আর অন্যদিকে তাকিয়ে থাকত। সে গতিকে ঘৃণা করত। সাসপেন্সের ওস্তাদ, অবসরের প্রেমিক, সে স্লো-মোশনে খেলত: ধীরে, শান্তভাবে বল বের করে আনার এই শিল্পের নাম দেওয়া হয়েছিল ' ডোমিঙ্গাদা'। অবশেষে যখন সে বল ছাড়ত, তখন দৌড়ানো ছাড়াই এবং না দৌড়ে, কারণ বল ছাড়া একা হয়ে যাওয়াটা তাকে ব্যথিত করত।



ডোমিঙ্গোস এবং সে

টি তার এই বলটা আমাকে অনেক সাহায্য করেছে। সে অথবা তার বোনেরা, তাই না? এটা একটা পরিবার। যার কাছে আমি কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ। পৃথিবীতে আমার জীবনে তিনিই ছিলেন... মূল চাবিকাঠি। কারণ তাকে ছাড়া কেউই বাজাতে পারে না। আমার শুরুটা হয়েছিল বাঙ্গু ক্লাবের কারখানায়। কাজ, কাজ, করতে করতে এখানে আমার বন্ধুর সাথে দেখা হয়। আর আমি তাকে পেয়ে খুব খুশি ছিলাম।

আমি সারা বিশ্ব দেখেছি, অনেক ভ্রমণ করেছি, অনেক নারীর সান্নিধ্য পেয়েছি। নারীরাও তো আনন্দের, তাই না?

(রবার্তো মৌরার একটি সাক্ষাৎকার থেকে)

আটিলিওর গোল

সালটা ছিল ১৯৩৯। মন্টেভিডিওর ন্যাসিওনাল এবং বুয়েনোস আইরেসের বোকা জুনিয়র্স।

আমি আইরেস ও আইরেস দুই গোলে সমতায় ছিল এবং সময় ফুরিয়ে আসছিল। ন্যাসিওনাল

আক্রমণে ছিল; পিছু হটে বোকা তাদের আটকে রাখছিল। এরপর আতিলিও গার্সিয়া বল পেয়ে পায়ের জটলার মুখোমুখি হন এবং ডানদিকে একটি পথ তৈরি করে একে একে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করে মাঠের অনেকটা অংশ জুড়ে এগিয়ে যেতে থাকেন।

আতিলিও লাথি খেতে অভ্যস্ত ছিল। ওরা সর্বশক্তি দিয়ে ওর পেছনে লাগত; ওর পা দুটো যেন ছিল ক্ষতের মানচিত্র। সেদিন বিকেলে গোলের দিকে যাওয়ার পথে অ্যাঞ্জেলেত্তি আর সুয়ারেজ ওকে কড়াভাবে ট্যাকল করে, আর দুবার ও দুজনকেই ফাঁকি দেওয়ার সৌভাগ্য ওর হয়েছিল। ভালুসি ওর জামা ছিঁড়ে ফেলে, ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে লাথি মারে, আর বিশালদেহী ইবানেজ ওর পথ আটকে দেয় যখন ও পুরো গতিতে দৌড়াচ্ছিল। কিন্তু আতিলিওকে থামানো যাচ্ছিল না। বলটা ছিল ওর শরীরেরই অংশ আর ওর শরীরটা ছিল এক টর্নেডো, খেলোয়াড়দের ছেঁড়া পুতুলের মতো আছাড় মেরে ফেলে দিচ্ছিল, অবশেষে আতিলিও এমন এক ভয়ঙ্কর সজোরে বলটা ছুড়ে দিল যা প্রায় ফেটেই দিচ্ছিল।

নেট।

বাতাসে বারুদের গন্ধ ছিল। বোকার খেলোয়াড়রা রেফারিকে ঘিরে ধরে তাদের করা ফাউলের কারণে গোলটি বাতিল করার দাবি জানাচ্ছিল ।

তিনি তাদের কথায় কান দিলেন না, এবং খেলোয়াড়েরা ক্ষুব্ধ হয়ে মাঠ ছেড়ে চলে গেল।

নিখুঁত চুম্বন অনন্য হতে চায়

প্রশ্ন বেশ কিছু আর্জেন্টাইন বুকে হাত রেখে হলফ করে বলে যে এনরিকে গার্সিয়া তিনিই ছিলেন সেই ব্যক্তি। "ব্যান্ডিলেগ" নামে পরিচিত গার্সিয়া দলের হয়ে লেফট উইং-এ খেলতেন। ক্লাব রেসিং। ঠিক যেমন অনেক উরুগুয়েবাসী ঠোঁটে আঙুল ক্রস করে হলফ করে বলে যে, ইনিই ছিলেন পেনিয়ারোলের স্ট্রাইকার পেদ্রো লাগো, 'মিউলটিয়ার'। হয় ইনি, নয়তো ইনি, কিংবা সম্ভবত দুজনেই।

অর্ধশতাব্দী বা তার কিছু বেশি সময় আগে, লাগো বা গার্সিয়া একটি নিখুঁত গোল করেছিলেন, যা তার প্রতিপক্ষদের ক্রোধ ও প্রশংসায় স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। তারপর তিনি জালের পেছন থেকে বলটি তুলে নিয়ে বগলে চেপে, পা টেনে টেনে ধীর পায়ে নিজের পথে ফিরে যেতেন। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন, নিজের পদচিহ্ন মুছে ফেলার জন্য প্রচুর ধুলো উড়িয়ে দিতেন, যাতে আর কেউ সেই খেলার অনুকরণ করতে না পারে।



মেশিন

১৯৪০-এর দশকের শুরুতে আর্জেন্টিনার ক্লাব রিভার প্লেটের সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবল দল ছিল।

আমি

"কেউ ভেতরে যায়, অন্যরা বেরিয়ে আসে, সবাই সামনে এগোয়, সবাই পেছনে সরে আসে," ব্যাখ্যা করলেন কার্লোস পেউসেল, এই দলটির অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব। খেলোয়াড়রা একটি স্থায়ী আবর্তনের মাধ্যমে নিজেদের জায়গা বদল করত, রক্ষণকারীরা আক্রমণ করত, আক্রমণকারীরা রক্ষণ করত: "ব্ল্যাকবোর্ডে এবং মাঠে," পেউসেল বলতে ভালোবাসতেন, "আমাদের কৌশলগত পরিকল্পনা গতানুগতিক ১-২-৩-৫ নয়। এটা হলো ১-১০।"

যদিও রিভার দলের সবাই সবকিছুই করত, আক্রমণভাগটিই ছিল সেরা। মুনোজ, মোরেনো, পেদেরনেরা, লাব্রুনা এবং লুস্তাও একসাথে মাত্র আঠারোটি ম্যাচ খেলেছিলেন, কিন্তু তাঁরা ইতিহাস গড়েছিলেন এবং আজও তাঁদের নিয়ে আলোচনা হয়। এই পাঁচজন পরিস্থিতি বুঝে খেলতেন; মাঠের উপরের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এবং বলকে ডাকার জন্য একে অপরকে শিস দিতেন, আর বলটা একটা খুশি কুকুরের মতো তাদের অনুসরণ করত এবং কখনও পথ হারাত না।

তাদের নিখুঁত খেলার জন্য লোকেরা সেই কিংবদন্তী দলটিকে 'দ্য মেশিন' বলে ডাকত। যদিও এটি একটি সন্দেহজনক প্রশংসা ছিল: এই স্ট্রাইকাররা খেলতে এতটাই মজা পেত যে তারা গোলে শট নিতেই ভুলে যেত। একটি যন্ত্রের যান্ত্রিক শীতলতার সাথে তাদের কোনো মিলই ছিল না। ভক্তরা তাদের 'নাইটস অফ অ্যাঙ্গুইশ' বলে ডাকলে তা আরও ন্যায্য হতো, কারণ ওই বদমাশগুলো একটি গোলের স্বস্তি দেওয়ার আগে তাদের ভক্তদের ঘাম ঝরিয়ে ছাড়ত।



মোরেনো

টি তারা তাকে "এল চারো" বলে ডাকত, কারণ তাকে দেখতে মেক্সিকান সিনেমার চরিত্রের মতো লাগত। তারকা, কিন্তু তিনি ছিলেন বুয়েনস আইরেসের উজানের গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দা।

রিভার ব্যান্ডের 'মেশিন' দলের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলোয়াড় হোসে ম্যানুয়েল মোরেনো তার প্রতিপক্ষদের ধাঁধায় ফেলতে ভালোবাসতেন। তার জলদস্যুর মতো পা দুটো একদিকে আঘাত হানলেও অন্যদিকে চলে যেত, আর তার দস্যুর মতো মাথাটা এক গোলপোস্টে শট নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও বলটা গিয়ে লাগত অন্য গোলপোস্টে।

যখনই কোনো প্রতিপক্ষ লাথি মেরে তাকে মাটিতে ফেলে দিত, মোরেনো কোনো অভিযোগ ছাড়াই নিজে থেকেই উঠে দাঁড়াত এবং যতই গুরুতর আঘাত পাক না কেন, সে খেলা চালিয়ে যেত। সে ছিল গর্বিত, দাম্ভিক এবং লড়াকু, যে একাই প্রতিপক্ষের গ্যালারি এবং নিজের গ্যালারিকেও ঘুষি মেরে উড়িয়ে দিতে পারত, কারণ তার ভক্তরা তাকে ভালোবাসলেও, রিভারের প্রতিটি হারের পর তাকে অপমান করার এক জঘন্য অভ্যাস তাদের ছিল।

ভালো সঙ্গীত ও ভালো বন্ধুদের অনুরাগী, বুয়েনস আইরেসের রাত্রির নায়ক মোরেনো ভোরের আলো দেখতেন হয় কারো চুলে জড়িয়ে, নয়তো কোনো ক্যাফের কাউন্টারে কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে।

তিনি বলতে ভালোবাসতেন, "প্রশিক্ষণের সেরা উপায় হলো ট্যাঙ্গো: আপনি একটি ছন্দ বজায় রাখেন, তারপর সামনে পা ফেলার সময় তা পরিবর্তন করেন, আপনি নাচের ধরণগুলো শেখেন, এবং আপনার কোমর ও পায়ের ব্যায়াম করেন।"

প্রতি রবিবার দুপুরে প্রতিটি ম্যাচের আগে, সে এক বড় বাটি মুরগির মাংসের স্টু গোগ্রাসে খেত এবং বেশ কয়েক বোতল রেড ওয়াইন শেষ করত। রিভারের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা তাকে তার এই উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন ত্যাগ করার আদেশ দেন, যা একজন পেশাদার ক্রীড়াবিদের জন্য শোভন ছিল না। সে তার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিল। পুরো এক সপ্তাহ সে রাতে ঘুমাত এবং দুধ ছাড়া আর কিছুই পান করত না। তারপর সে তার জীবনের সবচেয়ে বাজে ম্যাচটি খেলেছিল। যখন সে গেল

আবার ফুর্তি করতে শুরু করায় ক্লাব তাকে বরখাস্ত করে। এই অদম্য ভবঘুরে ছেলেটির প্রতি সংহতি জানিয়ে তার সতীর্থরা ধর্মঘটে যায় এবং রিভারকে বদলি খেলোয়াড় নিয়ে নয়টি ম্যাচ খেলতে হয়।

উৎসবের জয় হোক: ফুটবলের ইতিহাসে অন্যতম দীর্ঘতম ক্যারিয়ারের অধিকারী ছিলেন মোরেনো। তিনি আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো, চিলি, উরুগুয়ে এবং কলম্বিয়ার প্রথম বিভাগের ক্লাবগুলোতে বিশ বছর খেলেছেন। ১৯৪৬ সালে মেক্সিকো থেকে ফেরার পর, রিভারের সমর্থকরা তার দুঃসাহসিক আক্রমণ ও কৌশল দেখার জন্য এতটাই উদগ্রীব ছিল যে তারা স্টেডিয়াম উপচে ফেলেছিল। তার ভক্তরা বেড়া ভেঙে খেলার মাঠে ঢুকে পড়ে। তিনি তিনটি গোল করেন এবং তারা তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে যায়। ১৯৫২ সালে মন্টেভিডিওর ন্যাসিওনাল তাকে একটি লোভনীয় প্রস্তাব দেয়, কিন্তু তিনি তার পরিবর্তে উরুগুয়ের আরেকটি দল ডিফেন্সরের হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নেন। এটি ছিল একটি ছোট ক্লাব যা তাকে সামান্য বা প্রায় কোনো পারিশ্রমিকই দিতে পারত না, কারণ সেখানে তার বন্ধু ছিল। সেই বছর, মোরেনো ডিফেন্সরের পতন থামিয়ে দেন।

১৯৬১ সালে অবসর গ্রহণের পর তিনি কলম্বিয়ার মেডেলিনের কোচ হন। মেডেলিন আর্জেন্টিনার বোকা জুনিয়র্সের বিপক্ষে একটি ম্যাচে হারছিল এবং খেলোয়াড়রা গোলের দিকে কোনোভাবেই এগোতে পারছিল না। তাই তখন পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সী মোরেনো তাঁর সাধারণ পোশাক ছেড়ে মাঠে নামলেন এবং দুটি গোল করলেন। মেডেলিন জিতে গেল।

পেডেরনেরা

টি আমি যে পেনাল্টি কিকটি আটকে দিয়েছিলাম, তা ইতিহাসে লেখা থাকবে।
“লেতিসিয়া,” কলম্বিয়া থেকে লেখা এক চিঠিতে এক তরুণ আর্জেন্টাইন লিখেছিলেন।
তাঁর নাম ছিল আর্নেস্তো গুয়েভারা এবং তিনি তখনও ‘চে’ হয়ে ওঠেননি। ১৯৫২ সালে তিনি লাতিন আমেরিকায় ভবঘুরে জীবনযাপন করছিলেন। আমাজন নদীর তীরে, লেতিসিয়ায়, তিনি একটি ফুটবল দলকে প্রশিক্ষণ দিতেন। গুয়েভারা তাঁর ভ্রমণসঙ্গীকে ‘পেদেরনেরিতা’ বলে ডাকতেন। তাঁর প্রশংসা করার জন্য এর চেয়ে ভালো কোনো উপায় তাঁর জানা ছিল না।

অ্যাডলফো পেডেরনেরা ছিলেন রিভারের ‘মেশিন’-এর মূল চালিকাশক্তি। এই একাই একশ খেলোয়াড় আক্রমণভাগের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত প্রতিটি পজিশনেই খেলতেন। পেছন থেকে তিনি আক্রমণ তৈরি করতেন, সূঁচের ছিদ্র দিয়ে নিখুঁতভাবে বল পাস করতেন, খেলার গতি পরিবর্তন করতেন, অপ্রত্যাশিতভাবে পাল্টা আক্রমণে যেতেন; আর সামনে তিনি গোলরক্ষকদের উড়িয়ে দিতেন।

খেলার তীব্র ইচ্ছাটা তার সারা শরীরে সুড়সুড়ি দিচ্ছিল। সে কখনোই চাইত না ম্যাচগুলো শেষ হোক। রাত নামলে স্টেডিয়ামের কর্মীরা তাকে অনুশীলন থামাতে বৃথা চেষ্টা করত। তারা তাকে ফুটবল থেকে সরিয়ে আনতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি: খেলাটি তাকে ছাড়তে রাজি ছিল না।





সেভেরিনোর গোল

সালটা ছিল ১৯৪৩। বোকা জুনিয়র্স খেলছিল রিভার প্লেটের 'মেশিন'-এর বিপক্ষে।
আমি আর্জেন্টিনার ফুটবল ক্লাসিকে।

বোকা এক গোলে পিছিয়ে ছিল, এমন সময় রিভারের বক্সের প্রান্তে রেফারি ফাউলের বাঁশি বাজালেন। সোসা ফ্রি-কিকটি নিলেন। গোলে শট না করে, তিনি সেভেরিনো ভারেলার মাথা লক্ষ্য করে একটি সেন্টার পাস দিলেন। বলটি ভারেলার অনেক সামনে গিয়ে পড়ল। রিভারের রক্ষণভাগের জন্য কাজটি সহজ ছিল; সেভেরিনো বলের ধারেকাছেও ছিলেন না। কিন্তু অভিজ্ঞ স্ট্রাইকারটি লাফিয়ে উঠে শূন্যে ভেসে গেলেন এবং বেশ কয়েকজন ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে বেরেটের এক বিধ্বংসী আঘাতে গোলরক্ষককে পরাস্ত করলেন।

তার ভক্তরা তাকে 'ভূতুড়ে বেরেট' বলে ডাকত, কারণ তিনি বিনা আমন্ত্রণে গোলমুখে উড়ে আসতেন। বুয়েনস আইরেসে যাওয়ার সময় সেভেরিনোর উরুগুয়ের ক্লাব পেনিয়ারোলের হয়ে বহু বছরের অভিজ্ঞতা ও যথেষ্ট পরিচিতি ছিল। তার মুখে ছিল এক দুষ্টু শিশুর অপরাজেয় চাহনি এবং মাথার খুলিতে একটি সাদা বেরেট।

বোকা জুনিয়র্সের হয়ে তিনি দুর্দান্ত খেলেছিলেন। তবুও, প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় ম্যাচের পর, সেভেরিনো নৌকায় করে মন্টেভিডিওতে ফিরে যেতেন তার পাড়ায়, বন্ধুদের কাছে এবং কারখানায় তার কাজের জায়গায়।

বোমা

ডাব্লিউ যখন যুদ্ধ বিশ্বকে বিধ্বস্ত করছিল, রিও ডি জেনিরোর দৈনিক পত্রিকাগুলো ঘোষণা করেছিল বাঙ্গু ক্লাবের খেলার মাঠে লন্ডনের এক ঝটিকা আক্রমণ।

১৯৪৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে সাও ক্রিস্টোভাওয়ের বিপক্ষে একটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল এবং বাঙ্গুর সমর্থকরা চার হাজার আতশবাজি আকাশে ওড়ানোর পরিকল্পনা করেছিল, যা ফুটবলের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় আতশবাজির প্রদর্শনী ছিল।

যখন বাঙ্গুর খেলোয়াড়রা মাঠে নামল এবং বারুদের বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ চমকানো শুরু হলো, সাও ক্রিস্টোভাওয়ের ম্যানেজার তার খেলোয়াড়দের ড্রেসিংরুমে আটকে রেখে তাদের কানে তুলো গুঁজে দিলেন। যতক্ষণ আতশবাজি চলল, এবং তা অনেকক্ষণ ধরেই চলেছিল, ড্রেসিংরুমের মেঝে কাঁপছিল, দেয়াল কাঁপছিল, আর খেলোয়াড়েরাও কাঁপছিল; তারা সবাই দু'হাতে মাথা চেপে, দাঁতে দাঁত চেপে, চোখ শক্ত করে বন্ধ করে জড়োসড়ো হয়ে ছিল, যেন বিশ্বযুদ্ধ ঘরে এসে পড়েছে। যারা মৃগীরোগী ছিল না, মাঠে নামার সময় তাদের কাঁপুনি দেখে মনে হচ্ছিল যেন তাদের ম্যালেরিয়া হয়েছে। ধোঁয়ায় আকাশ কালো হয়ে গিয়েছিল। বাঙ্গু তাদের একেবারে ধুয়ে দিল।

কিছুক্ষণ পরেই রিও ডি জেনেইরো এবং সাও পাওলো দলের মধ্যে একটি ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল। আবারও যুদ্ধের মেঘ ঘনিয়ে আসছিল এবং দৈনিক পত্রিকাগুলো আরেকটি পার্ল হারবার, লেনিনগ্রাদের অবরোধ এবং অন্যান্য মহাবিপর্যয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করছিল।
পাওলিস্টরা জানত যে, রিওতে তাদের জন্য ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ বিস্ফোরণ অপেক্ষা করছে। তখন সাও পাওলোর ম্যানেজারের মাথায় একটা বুদ্ধি এল: ড্রেসিংরুমে লুকিয়ে থাকার পরিবর্তে, তার খেলোয়াড়রা কারিওকাদের সাথে একই সময়ে মাঠে নামবে। এতে করে তাদের ভয় দেখানোর বদলে, এই আক্রমণটা একটা অভিবাদন হিসেবে কাজ করবে।

আর সেটাই ঘটল, শেষ পর্যন্ত সাও পাওলোই ৬-১ গোলে হেরে গেল।

যে মানুষটি লোহাকে বাতাসে পরিণত করেছিলেন

ই দুয়ার্দো চিলিদা বাস্ক অঞ্চলের সান সেবাস্তিয়ান শহরে রিয়াল সোসিয়েদাদের হয়ে গোলরক্ষক হিসেবে খেলতেন। লম্বা ও পাতলা গড়নের এই খেলোয়াড়ের শট ঠেকানোর একটি নিজস্ব শৈলী ছিল এবং বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদ উভয়েরই এমন খেলোয়াড় ছিল। সবার দৃষ্টি ছিল তার ওপর। বিশেষজ্ঞরা ভবিষ্যদ্বাণী করছিলেন যে ছেলেটি জামোরার স্থলাভিষিক্ত হবে।

কিন্তু ভাগ্যের অন্য পরিকল্পনা ছিল। ১৯৪৩ সালে, সানুদো নামের এক প্রতিপক্ষ স্ট্রাইকার, যার নামের অর্থ ক্রুদ্ধ, চিলিদার মেনিসকাসসহ বাকি সবকিছু চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। হাঁটুতে পাঁচটি অস্ত্রোপচারের পর, চিলিদা ফুটবলকে বিদায় জানিয়ে ভাস্কর হয়ে যান।

এভাবেই শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পীর জন্ম হয়েছিল। চিলিডা এমন ভারী উপকরণ নিয়ে কাজ করেন যা মাটিতে দেবে যায়, কিন্তু তাঁর শক্তিশালী হাত লোহা এবং রিইনফোর্সড কংক্রিটকে বাতাসে ছুড়ে দেয়, যেখানে সেগুলো অন্য স্থান আবিষ্কার করে এবং চলার পথেই নতুন মাত্রা তৈরি করে। তিনি তাঁর শরীর দিয়ে গোলপোস্টের ভেতরেও একই কাজ করতেন।



যোগাযোগ থেরাপি

ইহেনরিক পিচন-রিভিয়ের তাঁর সারা জীবন মানবীয় বিষাদের রহস্য ভেদ করতে এবং আমাদের নীরবতার খাঁচা ভাঙতে সাহায্য করতে ব্যয় করেছেন।

ফুটবলের মধ্যে তিনি এক কার্যকরী মিত্র খুঁজে পেয়েছিলেন। ১৯৪০-এর দশকে, পিচন-রিভিয়ের তাঁর মানসিক হাসপাতালের রোগীদের নিয়ে একটি দল গঠন করেন। আর্জেন্টিনার উপকূলীয় অঞ্চলের খেলার মাঠে এই পাগলেরা ছিল অপরাজেয়, এবং খেলাধুলাই ছিল তাদের সেরা থেরাপি।

"দলীয় কৌশলই আমার অগ্রাধিকার," বললেন সেই মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, যিনি একইসাথে দলের ম্যানেজার এবং সর্বোচ্চ গোলদাতা ছিলেন।

অর্ধ শতাব্দী পরে, আমরা নগরবাসীরা সবাই কমবেশি পাগল, যদিও জায়গার সীমাবদ্ধতার কারণে আমাদের প্রায় সকলেই পাগলাগারদের বাইরে বাস করি।
গাড়ির দ্বারা বিতাড়িত, সহিংসতার দ্বারা কোণঠাসা, বিচ্ছিন্নতার অভিশাপে আমরা একে অপরের আরও কাছাকাছি গাদাগাদি করে বাস করি এবং আরও বেশি একা বোধ করি, যেখানে সাক্ষাতের স্থান ও সময় দুটোই ক্রমশ কমে আসছে।

অন্যান্য সবকিছুর মতোই ফুটবলেও, নির্মাতার চেয়ে ভোক্তার সংখ্যা অনেক বেশি। যে খালি মাঠগুলোতে একসময় মানুষ খেলা দেখতে যেত, সেগুলো এখন পিচঢালা রাস্তায় পরিণত হয়েছে, আর কাজ আমাদের অবসর সময় কেড়ে নেয়। বেশিরভাগ মানুষ আর খেলে না, তারা শুধু টেলিভিশনে বা মাঠ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাওয়া গ্যালারি থেকে অন্যদের খেলা দেখে। কার্নিভালের মতো ফুটবলও একটি গণ-দর্শক খেলায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু কার্নিভালের দর্শকরা যেমন রাস্তায় নেচে ওঠে, ফুটবলেও সবসময় কিছু মুগ্ধ ভক্ত থাকে যারা নিছক আনন্দের জন্য মাঝে মাঝে বলটায় লাথি মারে। আর শুধু শিশুরাই নয়। ভালো হোক বা মন্দ হোক, মাঠগুলো যতই দূরে হোক না কেন, পাড়ার বন্ধুরা বা কারখানা, অফিস বা অনুষদের সহকর্মীরা এখনও আনন্দের জন্য খেলতে একত্রিত হয় যতক্ষণ না তারা...

ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে। আর তারপর জয়ী ও পরাজিতরা একসাথে মদ্যপান, ধূমপান আর ভালো খাবার ভাগ করে নিতে চলে যায়—যে আনন্দগুলো পেশাদার ক্রীড়াবিদের জন্য অধরা।

কখনো কখনো নারীরাও অংশ নেন এবং নিজেদের গোলও করেন, যদিও সাধারণত পুরুষতান্ত্রিক ঐতিহ্য তাদেরকে যোগাযোগের এই উৎসবগুলো থেকে নির্বাসিত রাখে।

মার্টিনোর গোল

সালটা ছিল ১৯৪৬। উরুগুয়ের ক্লাব নাসিওনাল আর্জেন্টিনার সান লরেঞ্জোকে হারাচ্ছিল, তাই
আমি তারা প্রতিপক্ষের আক্রমণ মোকাবেলার জন্য নিজেদের রক্ষণভাগ গুটিয়ে নিয়েছিল।
রেনে পন্তোনি এবং রিনালদো মার্তিনোর কাছ থেকে হুমকি ছিল, যারা বলকে কথা বলানোর জন্য পরিচিত ছিলেন এবং যাদের গোল করার দুর্ভাগ্যজনক অভ্যাস ছিল।

মার্তিনো নাসিওনালের বক্সের প্রান্তে পৌঁছে গেল। সেখানে সে বলটা নিজের দখলে নিয়ে এমনভাবে আদর করতে লাগল, যেন তার হাতে অফুরন্ত সময় রয়েছে। হঠাৎ পন্তোনি বিদ্যুতের গতিতে ডান কোণার দিকে ক্রস করল। মার্তিনো থামল, মাথা তুলে তার দিকে তাকাল। তারপর নাসিওনালের ডিফেন্ডাররা সবাই পন্তোনির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, আর যখন গ্রেহাউন্ডরা খরগোশকে তাড়া করছিল, তখন মার্তিনো খাঁচায় তোতাপাখির মতো বক্সে ঢুকে পড়ল, বাকি থাকা ফুলব্যাককে কাটিয়ে শট নিল এবং গোল করল।

গোলটি মার্তিনোর হলেও এর কৃতিত্ব পন্তোনিরও ছিল, যিনি জানতেন কীভাবে শত্রুকে বিভ্রান্ত করতে হয়।





হেলেনোর গোল

এটি ছিল 1947। রিও ডি জেনেরিওতে ফ্ল্যামেঙ্গোর বিপক্ষে বোটাফোগো।

আমি বোটাফোগোর স্ট্রাইকার হেলেনো ডি ফ্রেইতাস বুকে গোল করেন। হেলেনোর পিঠ নেটের দিকে ছিল। বলটা উপর থেকে উড়ে এল। সে বুক দিয়ে বলটা আটকে ধরে, নিচে পড়তে না দিয়েই সে ঘুরে দাঁড়াল। পিঠ ধনুকের মতো বেঁকে, বলটা তখনও বুকের উপর রেখেই সে চারপাশটা পর্যবেক্ষণ করল।

তার এবং গোলের মাঝে দাঁড়িয়ে ছিল অগণিত দর্শক। ফ্লামেঙ্গোর এলাকায় পুরো ব্রাজিলের চেয়েও বেশি লোক ছিল। বলটা মাটিতে পড়লেই সে হারিয়ে যেত। তাই হেলেনো হাঁটতে শুরু করল এবং শরীরটা পেছনে বাঁকিয়ে ও বলটা বুকে নিয়ে শান্তভাবে শত্রুপক্ষের ব্যূহ পার হয়ে গেল। এখন ফাউল না করে তার কাছ থেকে বলটা কেড়ে নেওয়ার কোনো উপায় ছিল না, আর সে গোল এলাকায় পৌঁছে গিয়েছিল। হেলেনো যখন গোলমুখে পৌঁছাল, সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। বলটা তার পায়ে এসে পড়ল এবং সে গোল করল।

হেলেনো ডি ফ্রেইটাস স্পষ্টতই একজন জিপসি ছিলেন। তার কাছে রুডলফ ভ্যালেন্টিনোর জিনিস ছিল। মুখটা ছিল হিংস্র আর মেজাজটা ছিল পাগলা কুকুরের মতো। খেলার মাঠে তিনি ছিলেন উজ্জ্বল।

এক রাতে ক্যাসিনোতে সে তার সব টাকা হারিয়েছিল। আরেক রাতে, কে জানে কোথায়, সে বেঁচে থাকার সব ইচ্ছা হারিয়ে ফেলেছিল। আর তার শেষ রাতে, একটি মৃত্যুশয্যায় প্রলাপ বকতে বকতে সে মারা গেল।



১৯৫০ সালের বিশ্বকাপ

সি রঙিন টেলিভিশনের জন্ম হচ্ছিল, কম্পিউটার প্রতি সেকেন্ডে হাজারো কাজ করছিল, এবং মেরিলিন মনরো হলিউডে আত্মপ্রকাশ করছিলেন। বুনিয়েলের ‘ লস ওলভিদাদোস ’ ছবিটি কান চলচ্চিত্র উৎসব মাতিয়ে তুলছিল। ফানজিওর ফর্মুলা ওয়ান মোনাকোতে জিতছিল। বার্ট্রান্ড রাসেল নোবেল পুরস্কার পাচ্ছিলেন। নেরুদা তাঁর ‘ক্যান্টো জেনারেল’ প্রকাশ করছিলেন, আর ওনেত্তি ও অক্তিভিয়ো পাজ ‘আ ব্রিফ লাইফ’ এবং ‘দ্য ল্যাবিরিন্থ অফ সলিটিউড’ -এর প্রথম সংস্করণ বের করছিলেন ।

পেদ্রো আলবিজু ক্যাম্পোস, যিনি পুয়ের্তো রিকোর স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘ ও কঠিন সংগ্রাম করেছিলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উনসত্তর বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হচ্ছিলেন। এক গুপ্তচর দক্ষিণ ইতালির কিংবদন্তি দস্যু সালভাতোরে জুলিয়ানোর বিরুদ্ধে তথ্য ফাঁস করে দিয়েছিল এবং পুলিশের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে তিনি মৃত্যুপথযাত্রী ছিলেন। চীনে, মাও-এর সরকার বহুবিবাহ এবং শিশু বিক্রি নিষিদ্ধ করে তাদের প্রথম পদক্ষেপ নিচ্ছিল। জাতিসংঘের পতাকায় মোড়া মার্কিন সৈন্যরা বন্দুকের গুলি বর্ষণ করতে করতে কোরীয় উপদ্বীপে আক্রমণ চালাচ্ছিল, অন্যদিকে বিশ্বযুদ্ধের দীর্ঘ বিরতির পর ফুটবল খেলোয়াড়রা চতুর্থ রিমেট কাপের জন্য রিও ডি জেনিরোতে অবতরণ করছিল।

১৯৫০ সালে ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টে আমেরিকা মহাদেশ থেকে সাতটি এবং সদ্য বিধ্বস্ত ইউরোপ থেকে ছয়টি দেশ অংশগ্রহণ করেছিল।
ফিফা জার্মানিকে খেলতে দেয়নি। প্রথমবারের মতো ইংল্যান্ড বিশ্বকাপে যোগ দেয়। তার আগে পর্যন্ত ইংরেজরা এই ধরনের ছোটখাটো লড়াইকে নিজেদের মর্যাদার পরিপন্থী বলে মনে করত। বিশ্বাস করুন বা না করুন, ব্রিটিশ দলটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পরাজিত হয়েছিল এবং যে গোলটি আমেরিকানদের জয় এনে দিয়েছিল, সেটি কার কাজ ছিল না...

জর্জ ওয়াশিংটন কিন্তু হাইতি থেকে আসা এক অভিবাসী, ল্যারি গেটজেনস নামের একজন কৃষ্ণাঙ্গ সেন্টার ফরোয়ার্ডের দ্বারা।

স্বাগতিক দলের নতুন ও বিশ্বের বৃহত্তম স্টেডিয়াম মারাকানায় ব্রাজিল ও উরুগুয়ে ফাইনাল খেলেছিল। ব্রাজিলের জয় ছিল নিশ্চিত; ফাইনালটি একটি উৎসবমুখর উৎসব হতে যাচ্ছিল। ম্যাচ শুরুর আগে, একের পর এক গোলে সবাইকে গুঁড়িয়ে দেওয়া ব্রাজিলিয়ান খেলোয়াড়দের পেছনে "বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের জন্য" খোদাই করা সোনার ঘড়ি দেওয়া হয়েছিল। খবরের কাগজের প্রথম পাতাগুলো আগেই ছাপানো হয়ে গিয়েছিল, বিজয় মিছিলের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য বিশাল কার্নিভালের গাড়িটিও প্রস্তুত ছিল, অবশ্যম্ভাবী বিজয় উদযাপনের স্লোগান লেখা পাঁচ লক্ষ টি-শার্ট ইতোমধ্যেই বিক্রি হয়ে গিয়েছিল।

যখন ব্রাজিলিয়ান ফ্রিয়াসা প্রথম গোলটি করল, তখন দুই লক্ষ কণ্ঠের গর্জন আর প্রায় সমসংখ্যক আতশবাজির শব্দে বিশাল স্টেডিয়ামটি কেঁপে উঠল। কিন্তু তারপর শিয়াফিনো সমতাসূচক গোলটি করলেন এবং উইং থেকে ঘিঘিয়ার একটি শটে উরুগুয়ে ২-১ গোলের জয় নিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে নিল। ঘিঘিয়া যখন গোলটি করলেন, মারাকানার নিস্তব্ধতা ছিল কানে তালা লাগানোর মতো, ফুটবলের ইতিহাসে সবচেয়ে কোলাহলপূর্ণ নিস্তব্ধতা, এবং "আকুয়ারেলা দো ব্রাজিল"-এর সঙ্গীতশিল্পী ও সুরকার আরি বারোসো, যিনি পুরো দেশের জন্য ম্যাচটির ধারাভাষ্য দিচ্ছিলেন, তিনি চিরতরে সম্প্রচার ছেড়ে দেওয়ার শপথ নিলেন।



চূড়ান্ত বাঁশি বাজার পর, ব্রাজিলীয় ধারাভাষ্যকাররা এই পরাজয়কে “ব্রাজিলের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি” বলে অভিহিত করেন। জুলস রিমেট দিশেহারা হয়ে মাঠের চারপাশে ঘুরছিলেন, নিজের নাম লেখা কাপটি আঁকড়ে ধরে: “আমি কাপটি হাতে নিয়ে একা হয়ে গেলাম এবং কী করব বুঝতে পারছিলাম না। অবশেষে আমি উরুগুয়ের অধিনায়ক, ওবদুলিও ভারেলাকে খুঁজে পেলাম এবং প্রায় কাউকেই না দেখিয়ে কাপটি তার হাতে তুলে দিলাম। আমি একটি কথাও না বলে হাত বাড়িয়ে দিলাম।”

রিমেটের পকেটে বিজয়ী ব্রাজিলিয়ানদের অভিনন্দন জানিয়ে লেখা একটি ভাষণ ছিল।

উরুগুয়ে পরিষ্কারভাবেই জিতেছিল: তারা এগারোটি ফাউল করেছিল, যেখানে ব্রাজিলিয়ানরা করেছিল একুশটি।

তৃতীয় স্থান পেয়েছে সুইডেন, চতুর্থ স্থান স্পেন। নয়টি গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় শীর্ষে ছিলেন ব্রাজিলের আদেমির, এরপর পাঁচটি করে গোল করেন উরুগুয়ের শিয়াফিনো ও স্পেনের জারা।

ওবদুলিও

আমি ছোটবেলায় আমি ফুটবলের ভক্ত ছিলাম, এবং অন্য সব উরুগুয়েবাসীর মতোই আমিও ছিলাম ১৯৫০ সালে রেডিওর সামনে বসে বিশ্বকাপের ফাইনাল শুনছিলাম। যখন কার্লোস সোলের কণ্ঠে ব্রাজিলের প্রথম গোলের সেই ভয়াবহ খবরটা ভেসে এলো, আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল। তারপর আমি আমার সবচেয়ে শক্তিশালী বন্ধুর শরণাপন্ন হলাম। আমি ঈশ্বরকে অশেষ ত্যাগের প্রতিশ্রুতি দিলাম, যদি তিনি মারাকানায় আবির্ভূত হয়ে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন।

আমি আমার দেওয়া অনেক প্রতিজ্ঞা কখনোই মনে রাখতে পারিনি, তাই সেগুলো রক্ষা করতে পারিনি। তাছাড়া, ফুটবল ম্যাচের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ দর্শকের সামনে উরুগুয়ের জয়টা নিঃসন্দেহে একটা অলৌকিক ঘটনা হলেও, তা ছিল ওবদুলিও ভারেলা নামের রক্ত-মাংসের এক সাধারণ মানুষেরই কাজ। যখন অপ্রতিরোধ্য দল আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিল, তখন ওবদুলিও ম্যাচের উত্তেজনা কমিয়ে এনেছিলেন এবং তারপর পুরো দলকে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। কেবলমাত্র সাহসের জোরেই তিনি সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়েছিলেন।

দিনের শেষে সাংবাদিকরা নায়ককে ঘিরে ধরল। ওবদুলিও বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালেন না বা সেরা হওয়ার বড়াইও করলেন না। মাথা নেড়ে তিনি বিড়বিড় করে বললেন, "ব্যাপারটা সেরকমই একটা ব্যাপার ছিল।" আর যখন তারা তার ছবি তুলতে চাইল, তিনি পিঠ ঘুরিয়ে নিলেন।

সেই রাতটা তিনি রিওর একের পর এক বারে পরাজিত সমর্থকদের কাঁধে হাত রেখে বিয়ার পান করে কাটালেন। ব্রাজিলিয়ানরা কাঁদছিল। কেউ তাকে চিনতে পারল না। পরদিন তিনি মন্টেভিডিও বিমানবন্দরে তাকে অভ্যর্থনা জানাতে আসা ভিড় এড়িয়ে গেলেন, যেখানে একটি বিশাল বিলবোর্ডে আলোয় তার নাম লেখা ছিল। সেই সব উচ্ছ্বাসের মাঝে তিনি চুপিসারে সরে পড়লেন; গায়ে ছিল হামফ্রে বোগার্টের মতো—ল্যাপেল উল্টানো রেইনকোট আর নাকে নামানো ফেডোরা টুপি।

উরুগুয়ের ফুটবলের শীর্ষ কর্মকর্তারা নিজেদেরকে স্বর্ণপদক দিয়ে পুরস্কৃত করেছিলেন। তারা খেলোয়াড়দের রৌপ্যপদক ও কিছু নগদ অর্থ দিয়েছিলেন। ওবদুলিওর পুরস্কারের টাকা দিয়ে একটি ১৯৩১ সালের ফোর্ড গাড়ি কেনা সম্ভব ছিল। এক সপ্তাহ পরেই সেটি চুরি হয়ে যায়।



বারবোসা

ডাব্লিউ ১৯৫০ সালের বিশ্বকাপের সেরা গোলরক্ষক বাছাই করার সময় যখন কাপে, সাংবাদিকরা সর্বসম্মতিক্রমে ব্রাজিলিয়ান মোয়াসিরকে ভোট দিয়েছেন। বারবোসা। নিঃসন্দেহে, বারবোসা ছিলেন দেশের সেরা গোলরক্ষক; ক্ষিপ্রগতির এক খেলোয়াড়, যাঁর শান্ত আত্মবিশ্বাস পুরো দলকে ভরসায় ভরিয়ে দিত। বহু বছর পর চল্লিশের কোঠায় এসে অবসর নেওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি সেরাই ছিলেন। এত দীর্ঘ ক্যারিয়ারে কে জানে বারবোসা কত গোল রুখে দিয়েছেন, এবং তিনি কোনো স্ট্রাইকারকেই কখনো আঘাত করেননি।

কিন্তু ১৯৫০ সালের সেই ফাইনাল ম্যাচে, উরুগুয়ের আক্রমণভাগের খেলোয়াড় ঘিঘিয়া ডান প্রান্ত থেকে নিখুঁত এক শটে তাকে চমকে দেন। বারবোসা, যিনি সামনে এগিয়ে এসেছিলেন, লাফিয়ে পেছনে সরে যান এবং পড়ে যাওয়ার সময় তার আঙুল বল ছুঁয়ে যায়। তিনি এই ভেবে উঠে দাঁড়ান যে তিনি শটটি ঠেকিয়ে দিয়েছেন এবং বলটি জালে জড়িয়ে যায়। এই গোলটিই মারাকানা স্টেডিয়ামকে নির্বাক করে দিয়েছিল এবং উরুগুয়েকে চ্যাম্পিয়নের মুকুট পরিয়েছিল।

বছর কেটে গেল, কিন্তু বারবোসাকে কখনো ক্ষমা করা হয়নি। ১৯৯৩ সালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব চলাকালে, তিনি ব্রাজিলিয়ান খেলোয়াড়দের শুভেচ্ছা জানাতে চেয়েছিলেন। তিনি তাদের প্রশিক্ষণ শিবিরে দেখতে গিয়েছিলেন, কিন্তু দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা তাকে ঢুকতে দেননি। ততদিনে তিনি তার ভাবীর বদান্যতার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন এবং একটি সামান্য পেনশন ছাড়া আর কিছুই না নিয়ে তার বাড়িতেই থাকতেন। বারবোসা মন্তব্য করেছিলেন: “ব্রাজিলে যেকোনো অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ ত্রিশ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে। তেতাল্লিশ বছর ধরে আমি এমন একটি অপরাধের মূল্য দিয়ে আসছি যা আমি করিনি।”

জারার গোল

ঘটনাটি ১৯৫০ সালের বিশ্বকাপের। স্পেন ইংল্যান্ডকে পুরোপুরি কোণঠাসা করে ফেলেছিল, যা আমি শুধু দূর থেকে গুলি করতে পেরেছিলাম।

উইং থেকে গাইঞ্জা মাঠের বাম দিকটা দ্রুতগতিতে দখল করে নিলেন, রক্ষণভাগের অর্ধেক খেলোয়াড়কে মাটিতে ফেলে দিলেন এবং ইংলিশ গোলের দিকে একটি লব ক্রস করলেন। ফুলব্যাক র‍্যামসি তখন ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন, বলের দিকে পিঠ করে ভারসাম্যহীন অবস্থায় ছিলেন, তবুও তিনি বলটি ধরতে সক্ষম হন। এরপর জারা ঝড়ের বেগে ছুটে এসে বাম পোস্টে লেগে বলটি জালে জড়িয়ে দেন।

ছয়টি স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নশিপের সর্বোচ্চ গোলদাতা তেলমো জারা, ষাঁড়ের লড়াইয়ের যোদ্ধা মানোলেতের ওপর অর্পিত প্রশংসা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। তিনি তিনটি পায়ে খেলতেন, যার তৃতীয়টি ছিল তাঁর বিধ্বংসী মাথা। তাঁর সবচেয়ে পরিচিত গোলগুলো ছিল হেডারে করা। ১৯৫০ সালে জারা সেই জয়সূচক গোলটি মাথা দিয়ে করেননি, কিন্তু তিনি অবশ্যই বুকে ঝোলানো কুমারী মেরির ছোট্ট পদকটি চেপে ধরে সশব্দে উদযাপন করতে মাথাটি ব্যবহার করেছিলেন।

স্পেনের শীর্ষ ফুটবল কর্মকর্তা আরমান্দো মুনোজ ক্যালেরো, যিনি রাশিয়ায় নাৎসি আগ্রাসনে অংশ নিয়েছিলেন, জেনারেলিসিমো ফ্রাঙ্কোকে একটি বেতার বার্তা পাঠান: "মহামান্য: আমরা বিশ্বাসঘাতক অ্যালবিয়নকে পরাজিত করেছি।" এভাবেই স্পেন অবশেষে ১৫৮৮ সালে ইংলিশ চ্যানেলের জলে অপরাজেয় আর্মাডার পরাজয়ের প্রতিশোধ নিল।

মুনোজ ক্যালেরো ম্যাচটি উৎসর্গ করেছিলেন "বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ কাউদিলোকে"। পরের ম্যাচটি তিনি কাউকে উৎসর্গ করেননি। স্পেন ব্রাজিলের মুখোমুখি হয়েছিল এবং তাদের ছয়টি গোল হজম করতে হয়েছিল।



জিজিনহোর গোল

একটি আবার, এটি ছিল ১৯৫০ সালের বিশ্বকাপে। বিপক্ষে ম্যাচে যুগোস্লাভিয়ার বিপক্ষে ব্রাজিলের মিডফিল্ডার জিজিনহো জোড়া গোল করেছেন। ফুটবলের এই সৌন্দর্যের রাজা একটি নিখুঁত গোল করলেন, কিন্তু রেফারি অন্যায়ভাবে তা বাতিল করে দিলেন। তাই জিজিনহো হুবহু একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করলেন। তিনি একই জায়গা থেকে বক্সে প্রবেশ করলেন, আগের মতোই বাঁ দিক দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে একই নিপুণতায় সেই যুগোস্লাভ ডিফেন্ডারকে ড্রিবল করে পাশ কাটালেন এবং ঠিক একই কোণ থেকে বলটি জালে জড়িয়ে দিলেন। এরপর তিনি রাগে কয়েকবার নেটের দিকে বল লাথি মারলেন।

রেফারি বুঝতে পেরেছিলেন যে জিজিনহো ওই গোলটি আরও দশবার করার ক্ষমতা রাখেন, এবং গোলটি অনুমোদন করা ছাড়া তার আর কোনো উপায় ছিল না।



মজা প্রেমীরা

জে ১৯৫০ সালের উরুগুয়ের অন্যতম চ্যাম্পিয়ন হুলিও পেরেজ উল্লাস করতেন। ছোটবেলায় আমাকে বড় করা হয়েছিল। তারা তাকে “পাতালোকা” বলে ডাকত, যার মানে “পাগল পা,” কারণ সে শূন্যে নিজেকে এমনভাবে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে পারত যে তার প্রতিপক্ষরা হতবাক হয়ে যেত। তারা বিশ্বাসই করতে পারত না যে তার পা দুটো একদিকে উড়তে পারে, আর শরীরের বাকি অংশ ঠিক তার উল্টো দিকে ছুটে যায়। এই ধরনের শারীরিক ভঙ্গিমায় বেশ কয়েকজন প্রতিপক্ষকে ফাঁকি দেওয়ার পর, সে পিছিয়ে এসে আবার সেই কৌশলটিই পুনরাবৃত্তি করত। গ্যালারিতে বসে আমরা খেলার মাঠের এই আমুদে লোকটিকে উৎসাহ দিতে ভালোবাসতাম, যার কাণ্ডকারখানা আমাদের হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে দিত, সাথে সাথে আশেপাশে বাঁধা থাকা অন্য সবকিছুও।

কয়েক বছর পর আমার সৌভাগ্য হয়েছিল ব্রাজিলিয়ান গারিঞ্চার খেলা দেখার, এবং তিনিও পা নেড়ে রসিকতা করে মজা নিচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে, যখন তিনি চরম মুহূর্তে পৌঁছাতেন, তখন আনন্দটা দীর্ঘায়িত করার জন্য তিনি পিছিয়ে যেতেন।



১৯৫৪ সালের বিশ্বকাপ

জি ফেলিনির জাদুর কাঠি থেকে এলসোমিনা এবং জাম্পানো অঙ্কুরিত হয়েছিল এবং লা স্ট্রাডায় ধীরগতিতে ভাঁড়ামি করছিল , আর ফ্যাঙ্গিও ছিলেন দ্বিতীয়বারের মতো ফর্মুলা ওয়ান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। জোনাস সল্ক পোলিওর বিরুদ্ধে একটি টিকা তৈরি করছিলেন। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রথম হাইড্রোজেন বোমাটি বিস্ফোরিত হচ্ছিল। ভিয়েতনামে জেনারেল জিয়াপ ডিয়েন বিয়েন ফু-এর নির্ণায়ক যুদ্ধে ফরাসি সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করছিলেন।
ফরাসিদের আরেকটি উপনিবেশ আলজেরিয়ায় স্বাধীনতা যুদ্ধ সবে শুরু হচ্ছিল।

জেনারেল স্ট্রোয়েসনার নিজের সাথেই এক হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে প্যারাগুয়ের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হচ্ছিলেন। ব্রাজিলে ব্যবসায়ী ও কর্মকর্তাদের অর্থ ও বন্দুকের দ্বারা বাঁধা ফাঁস রাষ্ট্রপতি গেতুলিও ভার্গাসের চারপাশে আঁটসাঁট হচ্ছিল এবং শীঘ্রই তিনি একটি গুলিতে নিজের হৃদয় বিদীর্ণ করবেন। ওএএস-এর আশীর্বাদে মার্কিন বিমানগুলো গুয়াতেমালায় বোমা ফেলছিল, এবং সেই উত্তরের শক্তি দ্বারা সৃষ্ট একটি সেনাবাহিনী আক্রমণ করছিল, হত্যা করছিল এবং জয়লাভ করছিল। যখন সুইজারল্যান্ডে পঞ্চম বিশ্বকাপ উদ্বোধনের জন্য ষোলটি দেশের জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হচ্ছিল, তখন গুয়াতেমালায় বিজয়ীরা ‘দ্য স্টার স্প্যাঙ্গলড ব্যানার’ গাইছিল এবং রাষ্ট্রপতি আরবেন্সের পতন উদযাপন করছিল, যার মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শ ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানির ভূমিতে পা রাখার সাথে সাথেই নগ্ন হয়ে গিয়েছিল।

'৫৪ বিশ্বকাপে ইউরোপ থেকে এগারোটি এবং আমেরিকা থেকে তিনটি দলের পাশাপাশি তুরস্ক ও দক্ষিণ কোরিয়া অংশগ্রহণ করেছিল। ব্রাজিল তাদের আগের সাদা ইউনিফর্মের পরিবর্তে সবুজ কলারযুক্ত হলুদ জার্সি উন্মোচন করে।

মারাকানায় তা তাদের জন্য দুর্ভাগ্য বয়ে এনেছিল। কিন্তু শুরুতে সেই ক্যানারি রঙ কোনো কাজে আসেনি: ব্রাজিল একটি সহিংস ম্যাচে হাঙ্গেরির কাছে হেরে যায় এবং সেমিফাইনালেও উঠতে পারেনি। ব্রাজিলীয় প্রতিনিধিদল ব্রিটিশ রেফারির বিরুদ্ধে ফিফার কাছে অভিযোগ করেছিল, যিনি "পাশ্চাত্য খ্রিস্টান সভ্যতার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের সেবায়" কাজ করেছিলেন।

এই কাপ জেতার জন্য হাঙ্গেরিই ছিল সবচেয়ে বড় ফেভারিট। পুসকাস, কোসিস এবং হিদেগকুতির অপ্রতিরোধ্য জুটি টানা চার বছর অপরাজিত ছিল এবং বিশ্বকাপের ঠিক আগে তারা ইংল্যান্ডকে ৭-১ গোলে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কাজটা মোটেই সহজ ছিল না। ব্রাজিলের সাথে কঠিন লড়াইয়ের পর হাঙ্গেরিয়ানরা উরুগুয়ের ওপর তাদের সর্বস্ব দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। দুই দল শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যায়, কেউই কাউকে ছাড় দেয়নি, একে অপরকে ক্লান্ত করে দিচ্ছিল, অবশেষে অতিরিক্ত সময়ে কোসিসের করা দুটি গোল ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়।

ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল হাঙ্গেরি এবং পশ্চিম জার্মানি, যাদেরকে হাঙ্গেরি টুর্নামেন্টের শুরুতে ৮-৩ গোলে বিধ্বস্ত করেছিল, যখন অধিনায়ক পুসকাস চোটের কারণে মাঠের বাইরে ছিলেন। ফাইনালে পুসকাস এক পায়ে ভর দিয়ে কোনোমতে মাঠে ফিরে এক অসাধারণ কিন্তু ক্লান্ত দলকে নেতৃত্ব দেন। হাঙ্গেরি ২-০ গোলে এগিয়ে থাকলেও শেষ পর্যন্ত ৩-২ গোলে হেরে যায় এবং জার্মানি তাদের প্রথম বিশ্ব শিরোপা জয় করে। অস্ট্রিয়া তৃতীয় এবং উরুগুয়ে চতুর্থ স্থান অধিকার করে।

হাঙ্গেরীয় কোচিস এগারোটি গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতা ছিলেন, এরপর ছিলেন জার্মান মরলক, অস্ট্রিয়ান প্রোবস্ট এবং সুইস হিউগি, প্রত্যেকে ছয়টি করে গোল করেন। কোচিসের এগারোটি গোলের মধ্যে সবচেয়ে অবিশ্বাস্য ছিল ব্রাজিলের বিপক্ষে করা গোলটি। কোচিস একটি বিমানের মতো লাফিয়ে উঠে শূন্যে ভেসে যান এবং হেড করে বলটি গোলের কোণায় জড়িয়ে দেন।

রাহনের গোল

ঘটনাটি ১৯৫৪ সালের বিশ্বকাপের। ফেভারিট দল হাঙ্গেরি খেলছিল।
আমি ফাইনালে পশ্চিম জার্মানি।

২-২ গোলে সমতায় থাকা ম্যাচটি শেষ হতে ছয় মিনিট বাকি থাকতে, শক্তিশালী জার্মান ফরোয়ার্ড হেলমুট রান হাঙ্গেরির রক্ষণভাগ থেকে আসা একটি রিবাউন্ড বল সেমি-সার্কেলের মধ্যে পেয়ে যান। রান লান্তোসকে কাটিয়ে তার বাঁ পা দিয়ে জোরালো এক শট নেন, যা গ্রোসিচের রক্ষণে থাকা গোলপোস্টের ডান পোস্টের ঠিক ভেতরে গিয়ে মেশে।

জার্মানির সবচেয়ে জনপ্রিয় সম্প্রচারক হেরিবের্ট জিমারম্যান, দক্ষিণ আমেরিকানদের মতো আবেগভরে গোলটির ঘোষণা দিলেন: "টুরুরুরুরুরর!!!"

যুদ্ধের পর এই প্রথম জার্মানিকে বিশ্বকাপে খেলার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং জার্মান জনগণ আবারও অনুভব করেছিল যে তাদের অস্তিত্বের অধিকার রয়েছে।
জিমারম্যানের আর্তনাদ জাতীয় পুনরুজ্জীবনের প্রতীক হয়ে ওঠে। বহু বছর পর, সেই ঐতিহাসিক লক্ষ্যটি শোনা যায় ফাসবিন্ডারের চলচ্চিত্র ' দ্য ম্যারেজ অফ মারিয়া ব্রাউন' -এর সাউন্ডট্র্যাকে , যা ধ্বংসস্তূপ থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে না পাওয়া এক নারীর দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করে।





চলমান বিজ্ঞাপন

১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে পেনিয়ারোল শার্টে বিজ্ঞাপনের জন্য প্রথম চুক্তি স্বাক্ষর করে। আমি দশজন খেলোয়াড় তাদের বুকে কোম্পানির নাম প্রদর্শন করে মাঠে নেমেছিল।

তবে ওবদুলিও ভারেলা তার পুরোনো শার্টটিই রেখে দিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করলেন: "তারা একসময় আমাদের মতো কৃষ্ণাঙ্গদের নাকে রিং পরিয়ে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে বেড়াতো। সেই দিন আর নেই।

আজকাল প্রত্যেক ফুটবল খেলোয়াড়ই এক একজন চলমান বিজ্ঞাপন।

১৯৮৯ সালে কার্লোস মেনেম ম্যারাডোনা ও বাকিদের সাথে আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের জার্সি পরে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলেছিলেন। টেলিভিশনে এটা বোঝা কঠিন ছিল যে তিনি আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রপতি নাকি রেনোর, যার বিশাল লোগোটি তার বুকে শোভা পাচ্ছিল।

'৯৪ বিশ্বকাপে খেলোয়াড়দের জার্সিতে যেকোনো জাতীয় প্রতীকের চেয়ে অ্যাডিডাস এবং আমব্রোর লোগো বেশি চোখে পড়ত। জার্মানির অনুশীলন পোশাকে ফেডারেল ঈগলের পাশে মার্সিডিজ-বেঞ্জের তারকাটি জ্বলজ্বল করে। সেই একই তারকা ভিএফবি স্টুটগার্ট ক্লাবের পোশাকেও শোভা পায়। অন্যদিকে, বায়ার্ন মিউনিখ ওপেল গাড়ি পছন্দ করে। প্যাকেজিং সংস্থা টেট্রা প্যাক আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টকে স্পনসর করে। বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের খেলোয়াড়রা কন্টিনেন্টাল ইন্স্যুরেন্সের প্রচার করে, এবং বরুসিয়া মনশেনগ্লাডবাখের খেলোয়াড়রা ডিবলস বিয়ার বিক্রি করে। দলগুলো

লেভারকুসেন এবং উয়েরডিঙ্গেনে বায়ারের নামে নামকরণ করা শহরগুলো তাদের শার্টে কোম্পানির ট্যালসিড এবং ল্যারিলিন ওষুধের বিজ্ঞাপন দেয়।

একজন খেলোয়াড়ের পিঠের নম্বরের চেয়ে তার বুকের বিজ্ঞাপনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৯৩ সালে আর্জেন্টিনার ক্লাব রেসিং-এর কোনো স্পনসর না থাকায়, তারা ক্লারিন দৈনিকে একটি মরিয়া বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছিল : " স্পনসর আবশ্যক ।"

খেলাধুলার মাধ্যমে যে নির্মল জীবনযাপনের প্রচার করার কথা, বিজ্ঞাপন তার চেয়েও বেশি প্রাধান্য পায়। সেই একই বছর, ১৯৯৩ সালে, চিলিতে যখন গ্যালারিতে মারামারি এতটাই উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে ম্যাচ চলাকালীন মদ বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, তখনও চিলির প্রথম বিভাগের বেশিরভাগ দল তাদের জার্সিতে বিয়ার বা পিসকোর প্রচার করছিল।

পবিত্র জীবনযাপনের কথা বলতে গেলে, পোপের সেই অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে পবিত্র আত্মাকে একটি ব্যাংকে পরিণত করার পর কয়েক বছর কেটে গেছে। এখন ইতালীয় ক্লাব লাজিওর পৃষ্ঠপোষক হিসেবে রয়েছে সেটিই: তাদের জার্সিতে লেখা, "ব্যাঙ্কো দি সান্তো স্পিরিতো", যেন প্রত্যেক খেলোয়াড়ই ঈশ্বরের একজন ক্যাশিয়ার।

১৯৯২ সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের শেষে, ইতালীয় কোম্পানি মোত্তা তাদের হিসাবপত্র খতিয়ে দেখল। ক্লাব মিলানের খেলোয়াড়দের বুকে গর্বের সাথে শোভা পাওয়া তাদের লোগোটি সংবাদপত্রের ছবিতে ২,২৫০ বার দেখা গিয়েছিল এবং টেলিভিশনে ছয় ঘণ্টা ধরে প্রদর্শিত হয়েছিল। মোত্তা মিলানকে ৪.৫ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ করেছিল, কিন্তু ঐ সময়কালে তাদের কেক ও অন্যান্য মিষ্টিজাতীয় খাবারের বিক্রি ১৫ মিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়েছিল।

আরেকটি ইতালীয় সংস্থা, পারমালাট, যারা চল্লিশটি দেশে দুগ্ধজাত পণ্য বিক্রি করে, তাদের জন্য ১৯৯৩ সালটি ছিল একটি স্বর্ণযুগ। তাদের দল, পারমা, প্রথমবারের মতো ইউরোপীয় কাপ উইনার্স কাপ জিতেছিল এবং দক্ষিণ আমেরিকায় পালমেইরাস, বোকা ও পেনিয়ারোল—এই তিনটি দল, যাদের জার্সিতে সংস্থাটির লোগো ব্যবহৃত হয়, চ্যাম্পিয়নশিপ জয় করেছিল।

আঠারোটি প্রতিযোগীকে পেছনে ফেলে পারমালাট ব্রাজিলের বাজারে ঝড় তোলে এবং আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ের ভোক্তাদের মাঝেও নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করে—এই সবকিছুর পেছনেই ছিল ফুটবলের অবদান। শুধু তাই নয়, এই যাত্রাপথে পারমালাট বেশ কয়েকটি দক্ষিণ আমেরিকান দল কিনে নেয়, যার ফলে তারা শুধু জার্সিই নয়, খেলোয়াড়দেরও কিনে নেয়। ১০ মিলিয়ন ডলারে কোম্পানিটি এডিলসন, মাজিনহো, এডমুন্ডো, ক্লেবার এবং জিনহোকে কিনে নেয়, যারা প্রত্যেকেই ব্রাজিল জাতীয় দলের হয়ে খেলেছেন বা একসময় খেলতেন। এছাড়াও তারা পালমেইরাস ক্লাবের বাকি সাতজন খেলোয়াড়কেও কিনে নেয়। যারা তাদের দলে নিতে আগ্রহী, তাদের ইতালির পারমায় অবস্থিত কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

টেলিভিশনে খেলোয়াড়দের কাছ থেকে দেখানো শুরু হওয়ার পর থেকেই, তাদের পুরো ইউনিফর্ম, মাথা থেকে পা পর্যন্ত, একটি বিলবোর্ডে পরিণত হয়েছে। যখন কোনো তারকা সময় নিয়ে জুতার ফিতা বাঁধেন, তখন সেটা আঙুলের ধীরগতি নয়, বরং তার আর্থিক বিচক্ষণতা: তিনি অ্যাডিডাস, নাইকি বা রিবকের লোগো প্রদর্শন করেন। এমনকি '৩৬-এর দশকেও...

হিটলারের আয়োজিত অলিম্পিকে বিজয়ী ক্রীড়াবিদদের জুতোয় অ্যাডিডাসের তিনটি স্ট্রাইপ ছিল। জার্মানি ও আর্জেন্টিনার মধ্যে ১৯৯০ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালে, বল থেকে শুরু করে খেলোয়াড়, রেফারি এবং লাইনসম্যানদের পরিহিত প্রতিটি পোশাক পর্যন্ত সর্বত্র অ্যাডিডাসের স্ট্রাইপ দেখা গিয়েছিল। সিমসন এবং জেনিংস নামে দুই ইংরেজ সাংবাদিক জানিয়েছিলেন যে, কেবল রেফারির বাঁশিটিই অ্যাডিডাসের ছিল না।



ডি স্টেফানোর গোল

সালটা ১৯৫৭। স্পেন বেলজিয়ামের বিপক্ষে খেলছিল।

আমি মিগেল বেলজিয়ামের রক্ষণভাগকে অসতর্ক অবস্থায় পেয়ে ডান দিক দিয়ে আক্রমণে ওঠেন এবং ভলিতে একটি ক্রসকিক মাঝখানে পাঠান। দি স্তেফানো ঝাঁপিয়ে পড়েন, ডাইভ দিয়ে। পুরো দৈর্ঘ্য জুড়ে, এবং শূন্যে থাকা অবস্থায় ব্যাকহিল দিয়ে গোলটি করেন।

আর্জেন্টিনার তারকা আলফ্রেদো দি স্তেফানো, যিনি পরে স্পেনের খেলোয়াড় হয়েছিলেন, তাঁর ঠিক এভাবেই গোল করার অভ্যাস ছিল। যেকোনো ফাঁকা গোলপোস্ট ছিল তাঁর কাছে এক অমার্জনীয় অপরাধ, যার জন্য তাৎক্ষণিক শাস্তি প্রাপ্য, এবং তিনি এক দুষ্টু এলফের মতো তাতে ছুরি চালিয়ে সেই শাস্তি কার্যকর করতেন।

ডি স্টেফানো

টি পুরো খেলার মাঠটা তার জুতোর ভেতরে এঁটে যেত। তার পা থেকেই তা অঙ্কুরিত হয়েছিল। এবং বেড়ে উঠল। আলফ্রেডো ডি স্টেফানো এক নেট থেকে অন্য নেটে বারবার দৌড়ে বেড়ালেন। যখন তার কাছে বল থাকত, সে মাঠের এক পাশ থেকে অন্য পাশে যেত এবং খেলার গতি পরিবর্তন করত—কখনো অলস পায়চারি, কখনো অপ্রতিরোধ্য ঘূর্ণিঝড়ের মতো; আর যখন বল তার কাছে থাকত না, তখন সে তার মার্কিং করা খেলোয়াড়কে এড়িয়ে ফাঁকা জায়গা খুঁজে নিত, যাতে খেলা আটকে না যায়।

সে কখনো স্থির থাকত না। মাথা উঁচু করে সে পুরো খেলার মাঠ দেখতে পেত এবং রক্ষণ ভেদ করে আক্রমণ শুরু করার জন্য দ্রুতগতিতে মাঠ পার হয়ে যেত। প্রতিটি গোল করার মুহূর্তের শুরুতে, মাঝে এবং শেষে সে উপস্থিত থাকত, এবং সে সব ধরনের গোলই করত:

সাবধান, সাবধান, তীরটা
আসছে প্রচণ্ড গতিতে।

জনতা তাকে কাঁধে করে মাঠ থেকে বের করে নিয়ে যেত।

দি স্তেফানো ছিলেন তিনটি দলের পেছনের চালিকাশক্তি, যারা ১৯৪০-এর দশকে বিশ্বকে চমকে দিয়েছিল: রিভার প্লেট, যেখানে তিনি পেদেরনেরার জায়গা নিয়েছিলেন; বোগোটার মিলোনারিওস, যেখানে তিনি পেদেরনেরার পাশে দুর্দান্ত খেলেছিলেন; এবং রিয়াল মাদ্রিদ, যেখানে তিনি টানা পাঁচ বছর স্পেনের সর্বোচ্চ গোলদাতা ছিলেন। ১৯৯১ সালে, তার অবসরের বহু বছর পর, ফ্রান্স ফুটবল ম্যাগাজিন বুয়েনস আইরেসের এই ছেলেটিকে “সর্বকালের সেরা ইউরোপীয় খেলোয়াড়” উপাধিতে ভূষিত করে।



গ্যারিঞ্চার গোল

সালটা ছিল ১৯৫৮, ইতালি। ব্রাজিলের জাতীয় দল ক্লাবের সাথে খেলছিল।
আমি সুইডেনে বিশ্বকাপের পথে ফিওরেন্টিনা।

গারিনচা পেনাল্টি এরিয়ায় ঢুকে পড়লেন, একজন ডিফেন্ডারকে মাটিতে ফেলে দিলেন, আরেকজনকে কাটিয়ে দিলেন, এবং তারপর আরও একজনকে। তিনি গোলকিপারকেও ফাঁকি দিলেন, এরপর গোললাইনে আরেকজন ডিফেন্ডারকে দেখতে পেলেন। গারিনচা শট নেওয়ার ভান করলেন, আবার করলেন না; কাছের কর্নারে কিক করার ভান করলেন আর বেচারা খেলোয়াড়টি সজোরে পোস্টে আছড়ে পড়লেন। ততক্ষণে গোলকিপার ফিরে এসেছিলেন। গারিনচা বলটি গোলকিপারের দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে জালে জড়িয়ে দিলেন।

এরপর, বগলে বল নিয়ে তিনি ধীরে ধীরে মাঠে ফিরে এলেন।
তিনি মাথা নিচু করে হাঁটছিলেন, যেন ধীরগতির চ্যাপলিন; মনে হচ্ছিল তিনি সেই গোলটির জন্য ক্ষমা চাইছেন, যা পুরো ফ্লোরেন্সকে উল্লাসে মাতিয়ে তুলেছিল।

১৯৫৮ সালের বিশ্বকাপ

টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সুউচ্চ আকাশের দিকে একটি উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করছিল, একটি নতুন ছোট্ট চাঁদ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে। এটি সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে পথ অতিক্রম করেছিল। স্পুটনিকগুলো উৎক্ষেপিত হয়েছিল, কিন্তু কেউ অভিবাদন জানায়নি। আর যখন পরাশক্তিগুলো পরকালে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল, তখন এই বর্তমান সময়ে লেবাননে গৃহযুদ্ধ শুরু হচ্ছিল, আলজেরিয়া জ্বলছিল, ফ্রান্সে আগুন ধরে যাচ্ছিল, এবং জেনারেল দ্য গল সেই অগ্নিশিখার উপরে ছয় ফুট লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে পরিত্রাণের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন। কিউবায় বাতিস্তা একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে ফিদেল কাস্ত্রোর সাধারণ ধর্মঘট ব্যর্থ হচ্ছিল, কিন্তু ভেনেজুয়েলায় আরেকটি সাধারণ ধর্মঘট পেরেজ হিমেনেজের একনায়কতন্ত্রের পতন ডেকে আনছিল। কলম্বিয়ায়, এক দশক ধরে পারস্পরিক ধ্বংসযজ্ঞের পর ক্ষমতা ভাগাভাগির চুক্তিকে অনুমোদন দিতে কনজারভেটিভ ও লিবারেলরা ভোটকেন্দ্রে গিয়েছিল, আর এদিকে রিচার্ড নিক্সনকে তার লাতিন আমেরিকা সফরে পাথর ছুঁড়ে স্বাগত জানানো হচ্ছিল। হোসে মারিয়া আরগুয়েদাসের 'ডিপ রিভার্স' প্রকাশিত হচ্ছিল, সাথে কার্লোস ফুয়েন্তেসের ' হোয়্যার দ্য এয়ার ইজ ক্লিয়ার' এবং ইদেয়া ভিলারিনোর ' পোয়েমাস দে আমোর'-ও প্রকাশিত হচ্ছিল।

হাঙ্গেরিতে, ইমরে নাগিকে '৫৬-এর অন্যান্য বিদ্রোহীদের সাথে গুলি করে হত্যা করা হচ্ছিল, যারা আমলাতন্ত্রের পরিবর্তে গণতন্ত্র চেয়েছিল; এবং হাইতির সেই বিদ্রোহীরাও মারা যাচ্ছিল, যারা সেই প্রাসাদে হামলা চালিয়েছিল যেখানে জাদুকর ও জল্লাদদের মাঝে পাপা ডক ডুভালিয়ার রাজত্ব করছিলেন। রোমে নতুন পোপ ছিলেন জন তেইশ, অর্থাৎ জন দ্য গুড; প্রিন্স চার্লস ছিলেন ইংল্যান্ডের ভবিষ্যৎ রাজা; বার্বি ছিল পুতুলের নতুন রানি। ব্রাজিলে জোয়াও হ্যাভেলাঞ্জ ফুটবলের জগতে সিংহাসন জয় করছিলেন, আর ফুটবলের কলাকৌশলে পেলে নামের সতেরো বছরের এক কিশোরকে বিশ্বের রাজা হিসেবে বরণ করা হচ্ছিল।





ষষ্ঠ বিশ্বকাপ চলাকালীন সুইডেনে পেলের অভিষেক ঘটে। এতে ইউরোপ থেকে বারোটি, আমেরিকা থেকে চারটি দল অংশগ্রহণ করেছিল এবং অন্য কোনো অঞ্চল থেকে কোনো দল ছিল না। সুইডেনের অধিবাসীরা স্টেডিয়ামে অথবা নিজেদের বাড়িতে বসে খেলাটি দেখতে পারতেন। এটিই ছিল টেলিভিশনে সম্প্রচারিত প্রথম বিশ্বকাপ, যদিও এর সরাসরি সম্প্রচার শুধুমাত্র সুইডেনেই করা হয়েছিল। বাকি বিশ্ব এটি পরে দেখেছিল।

এই প্রথমবার কোনো দেশ নিজেদের মহাদেশের বাইরে খেলে জয়লাভ করেছিল। ১৯৫৮ বিশ্বকাপের শুরুতে ব্রাজিলিয়ানরা তেমন বিশেষ কিছু ছিল না, কিন্তু খেলোয়াড়রা বিদ্রোহ করে কোচকে তাদের পছন্দের দল মাঠে নামাতে রাজি করানোর পর, তারা অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। সেই সময়ে পাঁচজন বদলি খেলোয়াড় মূল একাদশে সুযোগ পান, যাদের মধ্যে ছিলেন পেলে নামের এক অচেনা কিশোর এবং গ্যারিঞ্চা, যিনি ব্রাজিলে ততদিনে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন এবং বাছাইপর্বের ম্যাচগুলোতে আলো ছড়িয়েছিলেন, কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষায় তার মানসিক দুর্বলতা ধরা পড়ায় তাকে প্রথম একাদশ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। শ্বেতাঙ্গ মূল খেলোয়াড়দের এই কৃষ্ণাঙ্গ দ্বিতীয় সারির খেলোয়াড়রা নতুন তারকা দলে নিজেদের আলোয় জ্বলে ওঠেন, সাথে ছিলেন আরেক বিস্ময়কর কৃষ্ণাঙ্গ দিদি, যিনি পেছন থেকে তাদের জাদুর মতো খেলাটা পরিচালনা করতেন।

খেলা আর আগুন: লন্ডনের পত্রিকা 'ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস' বলেছিল, এটা যে এই পৃথিবীরই ঘটনা, তা বিশ্বাস করতে চোখ কচলাতে হতো। কোপা ও ফনতেইনের ফরাসি দলের বিপক্ষে সেমিফাইনালে ব্রাজিলিয়ানরা ৫-২ গোলে জেতে এবং ফাইনালেও স্বাগতিক দলের বিপক্ষে তারা আবারও ৫-২ গোলে জয়লাভ করে। সুইডিশ অধিনায়ক লিডহোম, যিনি ফুটবলের ইতিহাসের অন্যতম পরিচ্ছন্ন ও মার্জিত খেলোয়াড়, ম্যাচের প্রথম গোলটি করেন, কিন্তু তারপর রাজা গুস্তাভাস অ্যাডলফাসের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে ভাভা, পেলে এবং জাগালো সুইডিশদের উচিত শিক্ষা দেন। একটিও পরাজয় ছাড়াই ব্রাজিল চ্যাম্পিয়ন হয়। খেলা শেষে বিজয়ী খেলোয়াড়রা বলটি তাদের সবচেয়ে একনিষ্ঠ ভক্ত, কৃষ্ণাঙ্গ মালিশকারী আমেরিকোকে তুলে দেন।

ফ্রান্স তৃতীয় এবং পশ্চিম জার্মানি চতুর্থ স্থান অধিকার করে। ফ্রান্সের ফঁতেন তেরোটি গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় শীর্ষে ছিলেন, যার মধ্যে আটটি ছিল ডান পা দিয়ে।

এক পায়ে, বাম পায়ে চারটি এবং মাথা দিয়ে একটি গোল করেন, এরপর জার্মানির পেলে ও হেলমুট রান প্রত্যেকে ছয়টি করে গোল করেন।



নিলটনের গোল

ঘটনাটি ১৯৫৮ সালের বিশ্বকাপের। ব্রাজিল অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল।

আমি দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে, ব্রাজিলিয়ান রক্ষণভাগের মূল স্তম্ভ নিলটন সান্তোস—যিনি ফুটবলের অগাধ জ্ঞানের জন্য 'বিশ্বকোষ' নামে পরিচিত ছিলেন—সংরক্ষণ ছেড়ে মাঝমাঠ পেরিয়ে, প্রতিপক্ষের দুজন খেলোয়াড়কে কাটিয়ে এগিয়ে যেতে থাকলেন। ব্রাজিলিয়ান ম্যানেজার ভিসেন্তে ফিওলাও দৌড়াচ্ছিলেন, তবে টাচলাইনের অন্য পাশে।

ঘামে ভিজে সে চিৎকার করে বলল, "ফিরে যাও! ফিরে যাও!"

অবিচল নিলটন শত্রুপক্ষের এলাকার দিকে দৌড় অব্যাহত রাখলেন। স্থূলকায় ও হতাশ ফিওলা মাথায় হাত দিয়ে বসেন, কিন্তু নিলটন কোনো ফরোয়ার্ডকে বল পাস করতে রাজি হলেন না। তিনি সম্পূর্ণ একাই আক্রমণটি পরিচালনা করলেন এবং তার ফলস্বরূপ একটি দুর্দান্ত গোল হলো।

তখন খুশি হয়ে ফিওলা বলল, "তুমি ওটা দেখলে? আমি কি তোমাকে বলিনি? এ তো সত্যিই সব জানে!"

গ্যারিঞ্চা

ও তার অনেক ভাইয়ের মধ্যে একজন তার নাম রেখেছিল গ্যারিনচা, একটি কুৎসিত, অকেজো ছোট পাখির নামে। যখন সে ফুটবল খেলা শুরু করল, ডাক্তাররা ক্রুশ চিহ্ন এঁকে দিল। তারা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে ক্ষুধা ও পোলিও থেকে বেঁচে ফেরা এই বিকৃতদেহী, বোবা ও খোঁড়া, যার মস্তিষ্ক শিশুর মতো, মেরুদণ্ড ইংরেজি 'S' অক্ষরের মতো এবং দুটি পা-ই একই দিকে বাঁকা, সে কখনোই একজন ক্রীড়াবিদ হতে পারবে না।

তার মতো রাইট উইঙ্গার আর কখনো ছিল না। ১৯৫৮ সালের বিশ্বকাপে তিনি তার পজিশনে সেরা ছিলেন, '৬২ সালে চ্যাম্পিয়নশিপের সেরা খেলোয়াড়।
কিন্তু মাঠে তাঁর দীর্ঘ বছরগুলো জুড়ে গ্যারিনচা ছিলেন আরও বেশি কিছু: ফুটবলের সমগ্র ইতিহাসে আর কেউ তাঁর চেয়ে বেশি মানুষকে আনন্দ দিতে পারেনি।



যখন সে খেলত, মাঠটা হয়ে যেত সার্কাসের আখড়া, বলটা এক পোষা পশু, আর খেলাটা যেন এক উৎসবের নিমন্ত্রণ। নিজের পোষ্যকে রক্ষা করা এক শিশুর মতো, গারিনচা বলটাকে কিছুতেই ছাড়ত না, আর বল ও সে মিলে এমন সব শয়তানি কাণ্ড করত যা দেখে সবাই হাসিতে ফেটে পড়ত। সে বলটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত, বলটাও তার ওপর লাফিয়ে উঠত, সে লুকাত, সে পালাত, সে তার পিছু ধাওয়া করত। এই প্রক্রিয়ায়, প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়রা একে অপরের সাথে ধাক্কা খেত, তাদের পা এমনভাবে মোচড়াতে থাকত যে শেষ পর্যন্ত তারা সমুদ্রপীড়ায় আক্রান্ত হয়ে ধপাস করে মাটিতে পড়ে যেত।
গারিনচা তার দুষ্টুমিগুলো করত মাঠের কিনারায়, ডান টাচলাইনের পাশ দিয়ে, কেন্দ্র থেকে বেশ দূরে; বস্তি এলাকায় বড় হওয়ায় সেখানেই খেলতে সে পছন্দ করত। তার ক্লাবের নাম ছিল বোটাফোগো, যার অর্থ “আগুন জ্বালানো ব্যক্তি”, আর সে-ই ছিল সেই বোটাফোগো, যে আগুন আর জ্বলন্ত সবকিছুর প্রতি উন্মত্ত সমর্থকদের উদ্দীপ্ত করত। সে-ই ছিল সেই ব্যক্তি যে উঠে আসত...

প্রশিক্ষণ শিবিরের সুযোগটা সে হারিয়েছিল কারণ সে দূরবর্তী কোনো গলি থেকে শুনতে পেয়েছিল খেলার জন্য আকুতি জানানো একটি বলের ডাক, নাচের জন্য আহ্বান জানানো সঙ্গীতের আকুতি, আর চুম্বনের জন্য আকুল এক নারীর আকুতি।



বিজয়ী? অবিশ্বাস্য ভাগ্যের অধিকারী এক পরাজিত। আর ভাগ্য চিরস্থায়ী নয়। ব্রাজিলে যেমন বলে, যদি মলের কোনো মূল্য থাকত, তবে গরীবরা মলমূত্র ছাড়াই জন্মাত।
গাধা।

গ্যারিঞ্চার মৃত্যুটা ছিল অনুমেয়: গরিব, মাতাল এবং নিঃসঙ্গ।

দিদি

টি সংবাদমাধ্যম তাকে ১৯৫৮ বিশ্বকাপের সেরা প্লেমেকার হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল। তিনি ছিলেন ব্রাজিল দলের কেন্দ্রবিন্দু। ছিপছিপে শরীর, লম্বা গলা, নিজেরই এক স্থির প্রতিমা; মাঠের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে দিদিকে দেখলে মনে হতো যেন এক আফ্রিকান কিংবদন্তি, যেখানে তিনি রাজত্ব করতেন। সেখান থেকেই তিনি ছুঁড়তেন তাঁর বিষাক্ত তীর।

তিনি লম্বা পাসে সিদ্ধহস্ত ছিলেন; পেলে, গ্যারিঞ্চা বা ভাভার পায়ে গেলে তার পাসগুলো প্রায় গোলে পরিণত হতো, কিন্তু তিনি নিজেও গোল করতেন।
দূর থেকে শট নিয়ে তিনি 'শুকনো পাতা' কৌশলে গোলরক্ষকদের বোকা বানাতেন: পায়ের আকৃতিতে বলকে ছুঁয়ে দিলে, সেটি মাটি ছেড়ে ঘুরতে ঘুরতে উড়তে থাকতো; বাতাসের ঝাপটায় ভেসে চলা শুকনো পাতার মতো এদিক-ওদিক নেচে আর দিক পরিবর্তন করে অবশেষে গোলপোস্টের ঠিক সেই জায়গায় গিয়ে পড়ত, যা গোলরক্ষক কল্পনাও করতে পারতেন না।

দিদি ধীরেসুস্থে খেলতেন। বলটার দিকে ইশারা করে তিনি বলতেন: "ও-ই তো দৌড়ায়।"

সে জানতো সে বেঁচে আছে।



দিদি এবং সে

তার প্রতি সবসময় অনেক স্নেহ অনুভব করতাম। কারণ যদি তার সাথে ভালো ব্যবহার না করা হয়
আমি স্নেহ থাকা সত্ত্বেও, সে কথা শোনে না। যখন সে আসত, আমি দায়িত্ব নিতাম আর সে...
মান্য করা। মাঝে মাঝে সে একদিকে যেত আর আমি বলতাম, "এদিকে আয়, সোনা," এবং তাকে সঙ্গে নিয়ে আসতাম। আমি তার ফোসকা আর আঁচিলের যত্ন নিতাম আর সে সবসময় সেখানে বসে থাকত, একেবারে বাধ্য মেয়ের মতো। আমি তাকে ঠিক ততটাই স্নেহ করতাম যতটা আমি আমার নিজের স্ত্রীকে করি। তার প্রতি আমার প্রচণ্ড স্নেহ ছিল। কারণ সে আগুনের মতো। যদি তার সাথে খারাপ ব্যবহার করি, সে তোমার পা ভেঙে দেবে। এজন্যই আমি বলি, "ছেলেরা, একটু সম্মান দেখাও। এই মেয়েকে অনেক ভালোবাসা দিয়ে যত্ন করতে হবে।" তুমি তার শরীরের কোন জায়গায় স্পর্শ করছ, তার উপর · · · নির্ভর করেই সে তোমার ভাগ্য নির্ধারণ করবে।

(রবার্তো মৌরার একটি সাক্ষাৎকার থেকে)



কোপা

টি তারা তাকে "ফুটবলের নেপোলিয়ন" বলে ডাকত কারণ সে খাটো ছিল এবং সে রাজ্য জয় করতে ভালোবাসত।

পায়ে বল নিয়ে সে আরও লম্বা হয়ে উঠল এবং মাঠে আধিপত্য বিস্তার করল। রেমন্ড কোপা ছিলেন অসাধারণ গতিশীলতা ও বর্ণিল চালের একজন খেলোয়াড়, যিনি গোলের দিকে নেচে নেচে এগিয়ে যাওয়ার সময় ঘাসের ওপর নকশা এঁকে দিতেন।
তাকে বল নিয়ে এত মজা করতে দেখে কোচেরা হতাশ হয়ে পড়তেন, এবং ফরাসি ধারাভাষ্যকারেরা প্রায়ই তাকে দক্ষিণ আমেরিকান খেলার ধরনের জন্য অভিযুক্ত করতেন। কিন্তু '৫৮-এর বিশ্বকাপে সংবাদমাধ্যম কোপাকে “ড্রিম টিম”-এ স্থান দেয় এবং সেই বছর তিনি ইউরোপের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে ব্যালন ডি'অর জিতে নেন।

ফুটবল তাকে দুর্দশা থেকে টেনে তুলেছিল। তিনি খনি শ্রমিকদের একটি দলে তাঁর যাত্রা শুরু করেন। পোলিশ অভিবাসীদের সন্তান কোপা তাঁর শৈশব কাটিয়েছেন নোয়েক্সের কয়লা খনিতে বাবার পাশে। তিনি প্রতি রাতে নিচে যেতেন এবং পরের দিন বিকেলে বেরিয়ে আসতেন।

ক্যারিজো

এইচ তিনি পঁচিশ বছর ধরে চুম্বকের মতো আকর্ষণীয় হাতে বল ধরেছেন। এবং শত্রু শিবিরে আতঙ্ক সৃষ্টি করা। আমাদেও কারিজো একটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দক্ষিণ আমেরিকান খেলার শৈলী। তিনিই প্রথম গোলরক্ষক যিনি পেনাল্টি এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে এসে আক্রমণে নেতৃত্ব দেওয়ার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন। বিপদ আরও বাড়িয়ে দিয়ে, এই আর্জেন্টাইন একাধিকবার প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়দের ড্রিবল করে কাটিয়ে যাওয়ার বিশাল ঝুঁকিও নিয়েছিলেন। কারিজোর আগে এমন পাগলামি ছিল অকল্পনীয়। তারপর তার এই দুঃসাহস জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তার স্বদেশী গাট্টি, কলম্বিয়ান হিগুয়িতা এবং প্যারাগুয়ের চিলাভের্টও এই ধারণা মেনে নিতে অস্বীকার করেন যে গোলরক্ষক হলেন জালে সেঁটে থাকা এক জীবন্ত দেয়াল।

তারা প্রমাণ করেছেন যে তিনিও একজন জীবন্ত বর্শা হতে পারেন।

আমরা সবাই জানি, সমর্থকরা প্রতিপক্ষকে ঘৃণা করতে ভালোবাসে: প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়রা সবসময়ই নিন্দা বা উপহাসের যোগ্য। কিন্তু সব ধরনের আর্জেন্টাইন সমর্থকরাই কারিজোর প্রশংসা করে, এবং দু-একজন ছাড়া প্রায় সকলেই একমত যে, সেই দেশের খেলার মাঠে তার মতো করে আর কেউ শট আটকাতে পারেনি। তা সত্ত্বেও, ১৯৫৮ সালে সুইডেনে বিশ্বকাপ শেষে যখন আর্জেন্টিনা দল লেজ গুটিয়ে দেশে ফেরে, তখন সবচেয়ে বেশি সমালোচনার শিকার হন সেই তারকা খেলোয়াড়টিই। আর্জেন্টিনা চেকোস্লোভাকিয়ার কাছে ৬-১ গোলে পরাজিত হয়েছিল, এবং এমন একটি অপকর্মের জন্য জনসমক্ষে প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন ছিল। সংবাদমাধ্যম তার তীব্র সমালোচনা করে, দর্শকরা শিস ও বিদ্রূপ করতে থাকে, এবং কারিজো মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। বহু বছর পর তার স্মৃতিকথায় তিনি দুঃখের সাথে স্বীকার করেছিলেন: “আমি যে শটগুলো আটকেছিলাম, তার চেয়ে আমার বিরুদ্ধে করা গোলগুলোর কথাই আমার সবসময় মনে পড়ে।”



শার্ট ফিভার

ইউরুগুয়ের লেখক পাকো এস্পিনোলা ফুটবল পছন্দ করতেন না। কিন্তু একজন ১৯৬০ সালের গ্রীষ্মের এক বিকেলে, যখন তিনি রেডিও শুনছিলেন শোনার জন্য কিছু খুঁজতে গিয়ে, সে হঠাৎ স্থানীয় একটি ক্লাসিক গানের সন্ধান পেল। পেনারোলকে ন্যাসিওনাল ৪-০ গোলে হারিয়েছে।

রাত নামলে পাকো এতটাই বিষণ্ণ বোধ করল যে, অন্য কারও জীবন যাতে তিক্ত না হয়, সেজন্য সে একাই খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। এত দুঃখ কোথা থেকে এল?
পাকো বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিল যে এর কোনো বিশেষ কারণ নেই, হয়তো মরণশীল হওয়ার নিছক দুঃখ। হঠাৎ তার মাথায় আসল: পেনিয়ারোল হেরে গেছে বলেই তার দুঃখ হচ্ছে। সে পেনিয়ারোলের একজন ভক্ত ছিল এবং তা জানত না।

তার মতো কতজন উরুগুয়েবাসী দুঃখী ছিল? আর অন্যদিকে, কতজন আনন্দে লাফিয়ে উঠছিল? পাকোর কাছে বিষয়টি দেরিতে স্পষ্ট হলো।
সাধারণত আমরা উরুগুয়ের অধিবাসীরা জন্ম থেকেই ন্যাসিওনাল বা পেনিয়ারোলের সমর্থক । যেমন, লোকেরা বলে, "আমি ন্যাসিওনালের সমর্থক।" বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই এমনটা চলে আসছে। বলা হয় যে, তখনকার দিনে যৌনকর্মীরা মন্টেভিডিওর বেশ্যালয়ের দরজায় শুধু পেনিয়ারোল বা ন্যাসিওনালের শার্ট পরে বসে খদ্দের আকর্ষণ করত।

উগ্র সমর্থকদের আনন্দ নিজের ক্লাবের জয়ে নয়, বরং প্রতিপক্ষের পরাজয়ে। ১৯৯৩ সালে মন্টেভিডিওর একটি দৈনিক একদল যুবকের সাক্ষাৎকার নিয়েছিল, যারা সারা সপ্তাহ কাঠ বয়ে জীবিকা নির্বাহ করত এবং রবিবার স্টেডিয়ামে ন্যাসিওনালের সমর্থনে চিৎকার করে আনন্দ পেত।

তাদের মধ্যে একজন স্বীকার করল, "আমার জন্য, শুধু পেনারোলের জার্সি দেখলেই আমি..."

অসুস্থ। আমি চাই ওরা প্রতিবারই হারুক, এমনকি বিদেশিদের বিপক্ষে খেললেও।

অন্যান্য বিভক্ত শহরগুলোতেও একই কাহিনী। ১৯৮৮ সালে কোপা আমেরিকার ফাইনালে, নাসিওনাল নিউয়েলসকে পরাজিত করে; এই নিউয়েলস ছিল আর্জেন্টিনার উপকূলবর্তী রোজারিও শহরের দুই জনপ্রিয় ক্লাবের একটি। সেই উপলক্ষে, অপর ক্লাব রোজারিও সেন্ট্রালের সমর্থকেরা একটি বিদেশি দলের কাছে নিউয়েলসের পরাজয় উদযাপন করতে তাদের শহরের রাস্তাগুলো ভরে ফেলেছিল।

আমার মনে হয়, ওসভালদো সোরিয়ানোই আমাকে বুয়েনস আইরেসে বোকা জুনিয়র্সের এক সমর্থকের মৃত্যুর গল্পটা বলেছিলেন। সেই সমর্থক তার সারা জীবন রিভার প্লেট ক্লাবকে ঘৃণা করে এসেছেন, যা খুবই স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু মৃত্যুশয্যায় তিনি শত্রুপক্ষের পতাকায় নিজেকে জড়িয়ে নিতে বলেছিলেন। যাতে তিনি তার শেষ নিঃশ্বাসে 'তাদেরই একজনের' মৃত্যু উদযাপন করতে পারেন।



যদি একজন সমর্থক কোনো ক্লাবের সদস্য হয় , তবে খেলোয়াড়রা কেন হবে না? খুব কম সমর্থকই নতুন কোনো জায়গায় তাদের প্রিয় খেলোয়াড়কে সহজে মেনে নেয়। ক্লাব বদলানো আর কর্মস্থল বদলানো এক জিনিস নয়, যদিও খেলোয়াড় নিঃসন্দেহে একজন পেশাদার, যিনি নিজের পায়ে হেঁটেই জীবিকা নির্বাহ করেন। দলের প্রতি আনুগত্য আধুনিক ফুটবলের সঙ্গে খাপ খায় না, কিন্তু সমর্থকেরা দলত্যাগের এই অপরাধের জন্য ঠিকই শাস্তি দিয়ে থাকে। ১৯৮৯ সালে, যখন ব্রাজিলিয়ান খেলোয়াড় বেবেতো ফ্লামেঙ্গো ছেড়ে ভাস্কো দা গামায় যোগ দেন, তখন ফ্লামেঙ্গোর কিছু সমর্থক শুধুমাত্র সেই বিশ্বাসঘাতককে বিদ্রূপ করার জন্যই ভাস্কো দা গামার ম্যাচ দেখতে গিয়েছিল।

তার উপর হুমকির ঝড় বয়ে গেল এবং রিও ডি জেনিরোর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জাদুকর তার উপর অভিশাপ দিল। বেবেতো একের পর এক আঘাতে জর্জরিত হতে লাগল; সে হয় আঘাত না পেয়ে, নয়তো পায়ে অপরাধবোধের ভার নিয়ে খেলতে পারত না। পরিস্থিতি খারাপ থেকে আরও খারাপ হতে হতে একসময় সে হাল ছেড়ে দিয়ে স্পেনে চলে গেল। এর কয়েক বছর আগে আর্জেন্টিনার ক্লাব রেসিং-এর দীর্ঘদিনের তারকা রবার্তো পারফুমো রিভার প্লেটে যোগ দেন। তার অনুগত ভক্তরা তাকে ইতিহাসের অন্যতম দীর্ঘ ও উচ্চস্বরের শিস দিয়েছিল। পারফুমো বলেছিলেন, "আমি বুঝতে পারলাম তারা আমাকে কতটা ভালোবাসে।"

পুরোনো বিশ্বস্ত দিনগুলোর জন্য স্মৃতিকাতর হলেও, ভক্তরা লাভজনকতার সেই হিসাব-নিকাশ মেনে নিতে নারাজ, যা প্রায়শই ম্যানেজারদের সিদ্ধান্ত নির্ধারণ করে; কারণ এখন প্রতিটি ক্লাবই জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন তৈরির কারখানায় পরিণত হতে বাধ্য হয়েছে। যখন ব্যবসা ভালো চলে না, তখন লোকসানের পরিমাণ কোম্পানির কিছু সম্পদ উৎসর্গ করার জন্য চিৎকার করে ওঠে। বুয়েনস আইরেসের সান লরেঞ্জো স্টেডিয়ামের ধ্বংসাবশেষের উপর এখন একটি বিশাল ক্যারফুর সুপারমার্কেট দাঁড়িয়ে আছে। ১৯৮৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে যখন স্টেডিয়ামটি ভেঙে ফেলা হয়, তখন কাঁদতে থাকা ভক্তরা মুঠো মুঠো মাটি পকেটে নিয়ে গিয়েছিল।



ক্লাবই হলো একমাত্র পরিচয়পত্র, যা সমর্থকরা বিশ্বাস করে। এবং অনেক ক্ষেত্রে জার্সি, জাতীয় সঙ্গীত এবং পতাকা এমন সব গভীর ঐতিহ্যের প্রতীক, যা খেলার মাঠে প্রকাশিত হলেও একটি সম্প্রদায়ের ইতিহাসের গভীর থেকে উৎসারিত হয়। কাতালানদের জন্য বার্সেলোনা দল শুধু একটি ক্লাব নয়; এটি মাদ্রিদের কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে তাদের জাতীয় পরিচয় প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সংগ্রামের প্রতীক। ১৯১৯ সাল থেকে বিলবাওয়ের অ্যাথলেটিক ক্লাবের হয়ে কোনো বিদেশী বা অ-বাস্ক স্প্যানিশ খেলোয়াড় খেলেননি। বাস্ক গর্বের এক দুর্গ হিসেবে অ্যাথলেটিক শুধুমাত্র বাস্ক খেলোয়াড়দেরই দলে নেয়, এবং তারা প্রায় সবসময়ই তাদের নিজস্ব ফার্ম দলের খেলোয়াড়। ফ্রাঙ্কোর দীর্ঘ স্বৈরশাসনের সময়, বার্সেলোনার ক্যাম্প ন্যু এবং বিলবাওয়ের সান মামেস—এই দুটি স্টেডিয়াম নিষিদ্ধ জাতীয়তাবাদী অনুভূতির অভয়ারণ্য ছিল। সেখানে কাতালান এবং বাস্করা তাদের নিজেদের ভাষায় চিৎকার করতে ও গান গাইতে এবং তাদের নিষিদ্ধ পতাকা ওড়াতে পারত। পুলিশের মারধরের শিকার না হয়ে প্রথমবারের মতো একটি ফুটবল স্টেডিয়ামে বাস্ক পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। ফ্রাঙ্কোর মৃত্যুর এক বছর পর, অ্যাথলেটিক এবং রিয়াল সোসিয়েদাদের খেলোয়াড়েরা পতাকাটি মাঠে নিয়ে আসেন।



যুগোস্লাভিয়ার বিভাজনের যুদ্ধ, যা সমগ্র বিশ্বকে এতটাই আলোড়িত করেছিল, তা যুদ্ধক্ষেত্রে নামার আগেই ফুটবল মাঠে শুরু হয়েছিল। বেলগ্রেড এবং জাগরেবের ক্লাবগুলো যখনই একে অপরের মুখোমুখি হতো, সার্ব ও ক্রোয়েটদের মধ্যকার প্রাচীন বিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠত। সমর্থকেরা তাদের গভীর আবেগ প্রকাশ করত এবং অতীতের পতাকা ও স্লোগানগুলোকে যুদ্ধের কুঠার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য খুঁড়ে বের করত।

পুসকাসের গোল

সালটা ছিল ১৯৬১। রিয়াল মাদ্রিদ নিজেদের মাঠে অ্যাটলেটিকোর বিপক্ষে খেলছিল।
আমি মাদ্রিদ।

ম্যাচ শুরু হতে না হতেই ফেরেঙ্ক পুসকাস জোড়া গোল করলেন, ঠিক যেমনটা ১৯৫০ সালের বিশ্বকাপে করেছিলেন জিজিনহো। রিয়াল মাদ্রিদের এই হাঙ্গেরীয় স্ট্রাইকার বক্সের ঠিক বাইরে থেকে একটি ফ্রি-কিক নেন এবং বল জালে জড়িয়ে যায়। কিন্তু পুসকাস যখন দুই হাত বাতাসে তুলে উদযাপন করছিলেন, রেফারি তার কাছে এগিয়ে আসেন। তিনি ক্ষমা চেয়ে বললেন, “আমি দুঃখিত, কিন্তু আমি বাঁশি বাজাইনি।”

তাই পুসকাস আবার শট নিলেন। আগের মতোই তিনি বাঁ পা দিয়ে কিক করলেন, এবং বলটি ঠিক একই পথে গেল: দেওয়ালের সেই একই খেলোয়াড়দের মাথার উপর দিয়ে কামানের গোলার মতো ছুটে গিয়ে, বাতিল হয়ে যাওয়া গোলটির মতোই, বলটি মাদিনাবেইতিয়ার নিয়ন্ত্রণে থাকা জালের উপরের বাম কোণে গিয়ে পড়ল। মাদিনাবেইতিয়া আগের মতোই লাফিয়ে উঠেছিলেন এবং আগের মতোই বলটিকে ছুঁয়েও যেতে পারলেন না।

সানফিলিপ্পোর গোল

ডিকান এদুয়ার্দো,

আমাকে আপনাকে এই ঘটনাটা বলতেই হবে। সেদিন আমি কারেফুর সুপারমার্কেটে গিয়েছিলাম, যেটা সান লরেঞ্জোর খেলার জায়গায় তৈরি হয়েছে। আমার সাথে ছিল আমার ছোটবেলার নায়ক হোসে সানফিলিপ্পো, যিনি টানা চার মৌসুম সান লরেঞ্জোর সর্বোচ্চ গোলদাতা ছিলেন। আমরা সেখানে হাঁড়ি-পাতিল, পনির আর লম্বা সসেজের মাঝে শপিং কার্টগুলোর মধ্যে দিয়ে হাঁটছিলাম। হঠাৎ, আমরা যখন চেকআউটের দিকে যাচ্ছিলাম, সানফিলিপ্পো দুহাত মেলে ধরে বললেন: "ভাবা যায়, ঠিক এখানেই বোকার বিপক্ষে সেই ম্যাচে আমি রোমার বিরুদ্ধে হাফ-ভলিতে গোলটা করেছিলাম।" তিনি ক্যান, স্টেক আর সবজিতে কানায় কানায় ভরা একটি কার্ট ঠেলে নিয়ে যাওয়া এক গৃহবধূর সামনে দিয়ে হেঁটে গিয়ে বললেন: "ওটা ছিল ইতিহাসের দ্রুততম গোল।"

তিনি এমনভাবে মনোযোগ দিলেন, যেন কর্নার কিকের জন্য অপেক্ষা করছেন, এবং আমাকে বললেন: "আমি সেন্টার-হাফকে, এক তরুণকে, বলেছিলাম, 'বলটা খেলা শুরু হওয়া মাত্রই বক্সে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। চিন্তা করো না, আমি তোমাকে খারাপ দেখাবো না।' আমি বয়সে বড় ছিলাম আর এই ছেলেটা, ওর নাম ছিল ক্যাপডেভিলা, ভয় পেয়ে গিয়েছিল, ভাবছিল, 'যদি আমি সফল না হই?'" আর তারপর সানফিলিপ্পো মেয়োনিজের জারের স্তূপের দিকে আঙুল তুলে চিৎকার করে বললেন: "ও ঠিক এখানেই মেরেছে!" লোকজন আমাদের দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিল যেন আমরা পাগল। "বলটা হাফব্যাকদের পেছনে এসে পড়েছিল, আমি হোঁচট খেয়েছিলাম কিন্তু ওটা আমার সামনে ওখানে গিয়ে পড়েছিল যেখানে ভাত রাখা আছে, দেখছেন?" তিনি নিচের তাকটার দিকে ইশারা করলেন, আর হঠাৎ করেই তার নীল স্যুট আর চকচকে জুতো সত্ত্বেও খরগোশের মতো দৌড়াতে শুরু করলেন। "আমি বলটাকে বাউন্স করতে দিলাম আর ধুম!" তিনি তার বাঁ পা দিয়ে প্রচণ্ড এক লাথি মারলেন। আমরা সবাই চেকআউটের দিকে ঘুরে তাকাই, যেখানে প্রায় ত্রিশ বছর আগে গোলপোস্টটা ছিল, আর মনে হয় যেন আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি বলটা উঁচুতে থাকা জালে আঘাত করছে, ঠিক ব্যাটারি আর রেজার ব্লেডের পাশেই। সানফিলিপ্পো উদযাপনের জন্য হাত তোলেন। ক্রেতারা আর চেকআউটের মেয়েরা হাততালি দিয়ে উল্লাস করে। আমার চোখে প্রায় জল এসে যায়। "বেবি" সানফিলিপ্পো ১৯৬২ সালের সেই গোলটা যেন আবারও করলেন, শুধু আমাকে দেখানোর জন্য।

ওসভালদো সোরিয়ানো

১৯৬২ সালের বিশ্বকাপ

কয়েকজন ভারতীয় ও মালয়েশীয় জ্যোতিষী শেষের ভবিষ্যদ্বাণী করছিলেন একটি পৃথিবী, কিন্তু তা ঘুরতেই থাকল, এবং ঘোরার সাথে সাথে একটি সংগঠনও অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল নামে সংস্থাটির জন্ম হয়েছিল এবং ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সাত বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা যুদ্ধের পর আলজেরিয়া স্বাধীন জীবনের প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিল। ইসরায়েলে নাৎসি অপরাধী অ্যাডলফ আইখম্যানকে ফাঁসি দেওয়া হচ্ছিল, আস্তুরিয়াসের খনি শ্রমিকরা ধর্মঘট করছিল এবং পোপ জন চার্চকে পরিবর্তন করে দরিদ্রদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তারা প্রথম কম্পিউটার ডিস্ক তৈরি করছিল এবং লেজার রশ্মি দিয়ে প্রথম অস্ত্রোপচার করছিল, আর মেরিলিন মনরো বেঁচে থাকার ইচ্ছা হারাচ্ছিলেন।

একটি দেশের ভোটের মূল্য কী ছিল? হাইতি তার ভোটাধিকার বিক্রি করেছিল দেড় কোটি ডলার, একটি মহাসড়ক, একটি বাঁধ এবং একটি হাসপাতালের বিনিময়ে, আর এভাবেই ওএএস (OAS) প্যান-আমেরিকানিজমের কালো ভেড়া কিউবাকে বহিষ্কার করার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল। মায়ামির নির্ভরযোগ্য সূত্রগুলো ফিদেল কাস্ত্রোর আসন্ন পতনের ঘোষণা দিচ্ছিল, যা ছিল মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার। হেনরি মিলারের উপন্যাস ‘ ট্রপিক অফ ক্যান্সার’ নিষিদ্ধ করার জন্য মার্কিন আদালতে পঁচাত্তরটি মামলা দায়ের করা হচ্ছিল , যা প্রথমবারের মতো অবিকৃত সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছিল। লিনাস পলিং, যিনি তাঁর দ্বিতীয় নোবেল পুরস্কার জিততে চলেছিলেন, তিনি পারমাণবিক পরীক্ষার প্রতিবাদে হোয়াইট হাউসের সামনে পিকেটিং করছিলেন, আর ঠিক সেই সময়েই বেনি “দ্য কিড” পারেট নামে এক নিরক্ষর কৃষ্ণাঙ্গ কিউবান ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনের রিংয়ে মার খেয়ে আধমরা হয়ে মৃত্যুবরণ করছিলেন।





মেমফিসে এলভিস প্রেসলি ৩০ কোটি রেকর্ড বিক্রি করার পর তাঁর অবসরের ঘোষণা দিচ্ছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন; এদিকে লন্ডনে ডেকা নামের একটি রেকর্ড কোম্পানি 'দ্য বিটলস' নামে পরিচিত একদল চুলোচুলী সংগীতশিল্পীর গান রেকর্ড করতে অস্বীকার করছিল। কার্পেন্তিয়ের প্রকাশ করছিলেন 'এক্সপ্লোশন ইন দ্য ক্যাথেড্রাল', গেলম্যান প্রকাশ করছিলেন 'গোতান', আর্জেন্টিনার সামরিক বাহিনী প্রেসিডেন্ট ফ্রন্দিজিকে ক্ষমতাচ্যুত করছিল এবং ব্রাজিলীয় চিত্রশিল্পী কান্দিদো পোর্তিনারি মৃত্যুপথযাত্রী ছিলেন। গুইমারেস রোসার 'প্রাইমেইরাস এস্তোরিয়াস ' বইয়ের দোকানে পাওয়া যাচ্ছিল, যেমনটা পাওয়া যাচ্ছিল ভিনিসিয়াস দে মোরেসের লেখা ' পারা ভিভের উম গ্রান্দে আমোর ' কবিতাগুলো । জোয়াও গিলবার্তো কার্নেগি হলে 'ওয়ান নোট সাম্বা' গানটি গুনগুন করে গাইছিলেন, আর এদিকে ব্রাজিলীয় ফুটবল দল চিলিতে অবতরণ করছিল, আমেরিকা মহাদেশের আরও পাঁচটি এবং ইউরোপের দশটি দেশের বিপক্ষে সপ্তম বিশ্বকাপ জেতার প্রত্যাশায়।

'৬২ সালের বিশ্বকাপে ভাগ্য দি স্তেফানোর সাথে ছিল না। তিনি তার দত্তক দেশ স্পেনের হয়ে খেলতে যাচ্ছিলেন। ছত্রিশ বছর বয়সে এটাই ছিল তার শেষ সুযোগ। উদ্বোধনী ম্যাচের ঠিক আগে তিনি তার ডান হাঁটুতে চোট পান এবং তার পক্ষে খেলা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। ফুটবলের ইতিহাসের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়, "দ্য ব্লন্ড অ্যারো" দি স্তেফানো আর কখনো বিশ্বকাপে খেলেননি। আরেক সর্বকালের তারকা পেলে-ও চিলিতে বেশিদূর এগোতে পারেননি: শুরুতেই তার পেশিতে টান লাগে এবং তিনি খেলতে পারেননি। আর ফুটবলের আরেক কিংবদন্তি, রাশিয়ান ইয়াশিনও একজন পঙ্গু খেলোয়াড়ে পরিণত হন। বিশ্বের সেরা গোলরক্ষক কলম্বিয়ার কাছে চারটি গোল হজম করেন, কারণ, মনে হয়, ড্রেসিংরুমে তিনি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মদ্যপান করে নিজেকে চাঙ্গা করে তুলেছিলেন।

পেলেকে ছাড়াই এবং দিদির তত্ত্বাবধানে ব্রাজিল টুর্নামেন্টটি জিতেছিল।
পেলের শূন্যস্থান পূরণের কঠিন ভূমিকায় আমারিল্ডো উজ্জ্বল ছিলেন, জালমা সান্তোস রক্ষণে নিজেকে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীরে পরিণত করেছিলেন, এবং আক্রমণভাগে গ্যারিঞ্চা ছিলেন অনুপ্রাণিত ও অনুপ্রেরণাদায়ক। ব্রাজিল যখন স্বাগতিক দলকে গুঁড়িয়ে দিল, তখন দৈনিক 'এল মের্কুরিও ' প্রশ্ন করেছিল, "গ্যারিঞ্চা কোন গ্রহ থেকে এসেছেন?" চিলিয়ানরা এর আগে এক তুমুল লড়াইয়ের ম্যাচে ইতালিকে হারিয়েছিল এবং তারা সুইজারল্যান্ডকেও হারিয়েছিল।

এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন। তারা স্প্যাগেটি, চকোলেট এবং ভদকা গোগ্রাসে খেল, কিন্তু কফিতে তাদের বিষম লাগল: ব্রাজিল ৪-২ গোলে জিতল।

ফাইনালে ব্রাজিল চেকোস্লোভাকিয়াকে ৩-১ গোলে হারিয়ে দেয় এবং '৫৮ সালের মতোই অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়। সর্বপ্রথম বিশ্বকাপ ফাইনাল আন্তর্জাতিকভাবে টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছিল, যদিও তা ছিল সাদাকালো এবং মাত্র কয়েকটি দেশে।

চিলি তৃতীয় স্থান অর্জন করে, যা ছিল তাদের সর্বকালের সেরা র‍্যাঙ্কিং, এবং যুগোস্লাভিয়া চতুর্থ স্থান লাভ করে দ্রাগোস্লাভ সেকুলারাক নামের একটি পাখির কল্যাণে, যাকে কোনো রক্ষীই ধরতে পারেনি।

চ্যাম্পিয়নশিপে কোনো শীর্ষ গোলদাতা না থাকলেও বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় চারটি করে গোল করেছেন: ব্রাজিলের গারিঞ্চা ও ভাভা, চিলির সানচেজ, যুগোস্লাভিয়ার ইয়েরকোভিচ, হাঙ্গেরির আলবার্ট এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের ইভানভ।



চার্লটনের গোল

ঘটনাটি ১৯৬২ সালের বিশ্বকাপে ঘটেছিল। ইংল্যান্ড খেলছিল প্রতিপক্ষ দলের বিপক্ষে।
আমি আর্জেন্টিনা।

ববি চার্লটন বলটি এমন জায়গায় রেখে ইংল্যান্ডের প্রথম গোলটি তৈরি করে দেন, যেখানে ফ্লাওয়ার্স একাই রোমার গোলরক্ষকের মুখোমুখি হন। কিন্তু দ্বিতীয় গোলটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চার্লটনেরই ছিল। মাঠের পুরো বাম প্রান্তের অধিপতি চার্লটন, আর্জেন্টিনার রক্ষণভাগকে যেন মার খাওয়া পতঙ্গের মতো ভেঙে পড়তে বাধ্য করেন। তিনি পূর্ণ গতিতে পা বদল করে ডান পা ব্যবহার করে উইং থেকে নেওয়া এক শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন।

ববি বেঁচে ফিরেছিল। তার দল, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের প্রায় সব খেলোয়াড়ই একটি জ্বলন্ত বিমানের বিকৃত ধ্বংসস্তূপে মারা গিয়েছিল। মৃত্যু এই খনি শ্রমিকের ছেলেকে রেহাই দিয়েছিল, যাতে সে মানুষকে তার ফুটবলের মহত্ত্ব উপহার দেওয়া চালিয়ে যেতে পারে।

বলটি তার কথা শুনত। সে তার নির্দেশ অনুসরণ করে মাঠ জুড়ে ঘুরে বেড়াত।
এবং সে তাকে লাথি মারার আগেই জালে গিয়ে পড়ল।



ইয়াশিন

ডাব্লিউ যখন লেভ ইয়াশিন গোলপোস্ট সুরক্ষিত রাখতেন, তখন একটি পিনফাটলও খোলা থাকত না। লম্বা মাকড়সার মতো হাতওয়ালা এই দৈত্যটি সবসময় কালো পোশাক পরত এবং সে সে এক অনাবৃত কমনীয়তায় খেলত, যা অপ্রয়োজনীয় অঙ্গভঙ্গির আড়ম্বরকে ঘৃণা করত। সে তার একটিমাত্র নখরসদৃশ হাত দিয়ে প্রচণ্ড বেগে আসা বল থামিয়ে দিতে পছন্দ করত, যে হাতটি সমস্ত নিক্ষিপ্ত বস্তুকে আটকে ছিন্নভিন্ন করে দিত, অথচ তার নিজের শরীর পাথরের মতো নিশ্চল থাকত। সে এক পলকেই বল প্রতিহত করতে পারত।

তিনি বেশ কয়েকবার ফুটবল থেকে অবসর নিয়েছিলেন, কিন্তু প্রতিবারই কৃতজ্ঞতার বন্যায় ভেসে গেছেন, এবং বেশ কয়েকবার ফিরেও এসেছেন। তাঁর মতো আর কেউ ছিল না।

পঁচিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই রুশ একশোরও বেশি পেনাল্টি শট রুখে দিয়েছেন এবং অগণিত গোল বাঁচিয়েছেন। তাঁর রহস্য জানতে চাইলে তিনি বলতেন, কৌশলটি হলো স্নায়ু শান্ত করার জন্য একটি ধূমপান করা, তারপর পেশি সুগঠিত করার জন্য এক পেগ কড়া মদ পান করা।



জেন্টোর গোল

সালটা ছিল ১৯৬৩। রিয়াল মাদ্রিদের মুখোমুখি হয়েছিল পন্তেভেদ্রা।

আমি রেফারি উদ্বোধনী বাঁশি বাজানোর সাথে সাথেই দি স্তেফানো একটি গোল করলেন। এরপর দ্বিতীয়ার্ধের একেবারে শুরুতেই পুসকাস গোল করলেন। সেই মুহূর্ত থেকে সমর্থকেরা পরবর্তী গোলের জন্য উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করতে লাগল, যা ছিল ১৯২৮ সালে স্প্যানিশ লীগে খেলা শুরু করার পর থেকে রিয়াল মাদ্রিদের ২,০০০তম গোল। মাদ্রিদের সমর্থকেরা ক্রুশ চিহ্ন এঁকে আঙুলে চুম্বন করে গোলটিকে স্মরণ করল, এবং প্রতিপক্ষের সমর্থকেরা মাটিতে তর্জনী ও কনিষ্ঠা আঙুল দেখিয়ে গোলটিকে প্রত্যাখ্যান করল।

খেলা ঘুরে গেল। পন্তেভেদ্রা আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করল। যখন রাত নেমে এল এবং খেলা শেষ হতে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি, আর সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত ও ভীতিকর গোলটি যখন দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে বলে মনে হচ্ছিল, ঠিক তখনই আমানসিও একটি বিপজ্জনক ফ্রি-কিক নিলেন: দি স্তেফানো বলটি নাগাল পাননি, কিন্তু সেটি জেন্তোর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। মাদ্রিদের এই লেফট উইঙ্গার তাকে ঘিরে থাকা ডিফেন্ডারদের ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে এসে শট নিলেন এবং গোলটি আদায় করে নিলেন। স্টেডিয়াম উল্লাসে ফেটে পড়ল।

সব প্রতিদ্বন্দ্বী দলই পলাতক ফ্রান্সিসকো জেন্তোকে ধরার জন্য ওত পেতে ছিল। মাঝে মাঝে তারা তাকে কারাগারে বন্দী করতে সফলও হতো, কিন্তু সে সবসময়ই পালিয়ে যেত।

সিলার

একটি হাসিখুশি মুখ। ফেনা ওঠা এক মগ পানীয় ছাড়া তাকে কল্পনা করা যেত না। তার মুষ্টিতে বিয়ার। জার্মানির ফুটবল মাঠে তিনিই ছিলেন সর্বদা সবচেয়ে খাটো এবং সবচেয়ে মোটাসোটা: গোলগাল গোলাপি হ্যামবার্গারের মতো, যার হাঁটা ছিল টলমল, কারণ তার একটি পা অন্যটির চেয়ে বড় ছিল। কিন্তু উভে সিলার লাফানোর সময় ছিলেন একটি ছারপোকার মতো, দৌড়ানোর সময় খরগোশের মতো, আর হেড করার সময় ষাঁড়ের মতো।

১৯৬৪ সালে হামবুর্গের এই সেন্টার ফরোয়ার্ড জার্মানির সেরা খেলোয়াড় হিসেবে নির্বাচিত হন। তিনি মনপ্রাণ দিয়ে হামবুর্গেরই ছিলেন: "আমি আর দশজন ভক্তের মতোই একজন।"
"হামবুর্গ আমার বাড়ি," তিনি বলতে ভালোবাসতেন। ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী দলগুলোতে খেলার অসংখ্য লোভনীয় প্রস্তাব উভে সিলার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি চারটি বিশ্বকাপে খেলেছেন। "উভে, উভে" বলে চিৎকার করাই ছিল "জার্মানি, জার্মানি" বলে চিৎকার করার সেরা উপায়।

ম্যাথিউস

আমি

১৯৬৫ সালে, পঞ্চাশ বছর বয়সেও স্ট্যানলি ম্যাথিউস ব্রিটিশ ফুটবলে মারাত্মক উন্মাদনা সৃষ্টি করতেন। ভুক্তভোগীদের সামলানোর জন্য যথেষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ছিলেন না, যারা ফুলব্যাকদের এই দাদাসুলভ উৎপীড়কের দ্বারা মোহিত হওয়ার সেই অভিশপ্ত মুহূর্তটির আগ পর্যন্ত পুরোপুরি স্বাভাবিক ছিল।

রক্ষাকারীরা তার জামা বা শর্টস ধরে ফেলত, তাকে কুস্তির প্যাঁচে ফেলত কিংবা পুলিশের খাতায় লেখানোর মতো লাথি মেরে ফেলে দিত, কিন্তু কোনো কিছুই তাকে থামাতে পারত না, কারণ তারা তার ডানা ছেঁটে ফেলতে পারেনি।

ম্যাথিউস ঠিক তাই ছিলেন, একজন উইঙ্গার, যিনি টাচলাইন বরাবর ইংল্যান্ডের মাঠের ওপর দিয়ে সবচেয়ে উঁচুতে উড়ে যেতেন।

রানী এলিজাবেথ এ বিষয়ে ভালোভাবেই অবগত ছিলেন: তিনি তাকে নাইট উপাধি প্রদান করেন।





১৯৬৬ সালের বিশ্বকাপ

টি সেনাবাহিনী ইন্দোনেশিয়াকে রক্তে স্নান করাচ্ছিল, পাঁচ লক্ষ, দশ লক্ষ, কে জানে কতজন মৃত, আর জেনারেল সুহার্তো উদ্বোধন করছিলেন তখনও জীবিত থাকা অল্প কয়েকজন রেড, পিঙ্ক বা সন্দেহভাজনদের হত্যা করে তার দীর্ঘ একনায়কতন্ত্র শেষ করা হচ্ছিল। অন্যান্য কর্মকর্তারা ঘানার রাষ্ট্রপতি এবং আফ্রিকান ঐক্যের প্রবক্তা নক্রুমাকে ক্ষমতাচ্যুত করছিল, আর এদিকে আর্জেন্টিনায় তাদের সহকর্মীরা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি ইলিয়াকে বিতাড়িত করছিল।

ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একজন নারী, ইন্দিরা গান্ধী, ভারত শাসন করছিলেন। ছাত্ররা ইকুয়েডরের সামরিক একনায়কতন্ত্রকে উৎখাত করছিল। মার্কিন বিমান বাহিনী নতুন উদ্যমে হ্যানয়ে বোমা বর্ষণ করছিল, কিন্তু আমেরিকানরা ক্রমশ আরও বেশি নিশ্চিত হচ্ছিল যে তাদের ভিয়েতনামে যাওয়াই উচিত হয়নি, সেখানে থাকা তো দূরের কথা, এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের সেখান থেকে চলে আসা উচিত।



ট্রুম্যান ক্যাপোটি সবেমাত্র 'ইন কোল্ড ব্লাড' প্রকাশ করেছিলেন । গার্সিয়া মার্কেজের ' ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অফ সলিটিউড' এবং লেজামা লিমার ' প্যারাডিসো' তখন বাজারে ছিল।

বইয়ের দোকান। যাজক ক্যামিলো টরেস কলম্বিয়ার পাহাড়ে যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করছিলেন, চে গুয়েভারা বলিভিয়ার গ্রামাঞ্চলে তার শীর্ণকায় রোসিনান্তেতে চড়ে বেড়াচ্ছিলেন, এবং মাও চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু করছিলেন। স্পেনের আলমেরিয়া উপকূলে বেশ কয়েকটি পারমাণবিক বোমা পড়ছিল, যার একটিও বিস্ফোরিত না হলেও আতঙ্ক ছড়াচ্ছিল। মিয়ামির নির্ভরযোগ্য সূত্রগুলো ফিদেল কাস্ত্রোর আসন্ন পতনের ঘোষণা দিচ্ছিল, এটি ছিল মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার।

লন্ডনে, হ্যারল্ড উইলসন যখন পাইপের ডাঁটা চিবিয়ে নির্বাচনে বিজয় উদযাপন করছিলেন, তরুণীরা মিনিস্কার্ট পরেছিল, কার্নাবি স্ট্রিট ছিল ফ্যাশনের রাজধানী, এবং গোটা বিশ্ব বিটলসের গানে গুনগুন করছিল—সেই পরিস্থিতিতে অষ্টম বিশ্বকাপ শুরু হলো।

এটি ছিল গারিঞ্চার শেষ বিশ্বকাপ এবং একইসাথে মেক্সিকান গোলরক্ষক আন্তোনিও কারবাহালের জন্যও ছিল এক বিদায় অনুষ্ঠান, যিনি এই টুর্নামেন্টে পাঁচবার অংশ নেওয়া একমাত্র খেলোয়াড়।

ষোলটি দল অংশ নিয়েছিল: ইউরোপ থেকে দশটি, আমেরিকা থেকে পাঁচটি এবং, শুনতে অদ্ভুত লাগলেও, উত্তর কোরিয়া। আশ্চর্যজনকভাবে, পিয়ংইয়ং শহরের একজন দন্তচিকিৎসক পাকের গোলে কোরিয়ানরা ইতালিকে প্রতিযোগিতা থেকে বাদ দিয়ে দেয়, যিনি অবসর সময়ে ফুটবল খেলতেন। ইতালীয় দলে ছিলেন জিয়ান্নি রিভেরা এবং সান্দ্রো মাজোলার মতো তারকারা। পিয়ের পাওলো পাসোলিনি বলতেন, তারা সাবলীল গদ্যের সাথে ঝকঝকে পদ্য মিশিয়ে ফুটবল খেলতেন, কিন্তু সেই দন্তচিকিৎসক তাদের বাকরুদ্ধ করে দিয়েছিলেন।

এই প্রথমবার পুরো চ্যাম্পিয়নশিপটি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছিল এবং সাদাকালো হওয়া সত্ত্বেও, রেফারিদের সেই নাটকীয়তা পুরো বিশ্ব দেখতে পেয়েছিল। আগের বিশ্বকাপে ইউরোপীয় রেফারিরা ছাব্বিশটি ম্যাচ পরিচালনা করেছিলেন; এই বিশ্বকাপে তাঁরা বত্রিশটি ম্যাচের মধ্যে চব্বিশটিতে দায়িত্ব পালন করেন। একজন জার্মান রেফারি আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ইংল্যান্ডকে ম্যাচটি জেতান, অন্যদিকে একজন ইংরেজ রেফারি উরুগুয়ের বিপক্ষে জার্মানিকে ম্যাচটি জেতান। ব্রাজিলের ভাগ্যও এর চেয়ে ভালো ছিল না: বুলগেরিয়া এবং পর্তুগাল পেলেকে নির্বিচারে তাড়া করে লাথি মারে, যা ব্রাজিলকে চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে ছিটকে দেয়।

রানি এলিজাবেথ ফাইনালে উপস্থিত ছিলেন। খেলোয়াড়রা গোল করলে তিনি চিৎকার করেননি, তবে সংযতভাবে হাততালি দিয়েছিলেন। বিশ্বকাপটি এসে দাঁড়িয়েছিল ববি চার্লটনের ইংল্যান্ড এবং বেকেনবাউয়ারের জার্মানির মধ্যে। চার্লটন ছিলেন প্রচণ্ড উদ্যমী ও নিখুঁত নিশানার অধিকারী, আর বেকেনবাউয়ার তখন সবে তাঁর ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন এবং এর মধ্যেই টুপি, দস্তানা ও লাঠি নিয়ে খেলতেন। কেউ রিমেট কাপটি চুরি করে নিয়েছিল, কিন্তু পিকলস নামের একটি কুকুর লন্ডনের একটি বাগান থেকে সেটি খুঁজে পায় এবং ট্রফিটি সময়মতো বিজয়ীর হাতে পৌঁছে যায়। ইংল্যান্ড ৪-২ গোলে জয়লাভ করে। পর্তুগাল এসেছিল

তৃতীয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন চতুর্থ। রানী এলিজাবেথ বিজয়ী দলের ম্যানেজার আলফ র‍্যামজিকে অভিজাত উপাধি প্রদান করেন এবং পিকলস জাতীয় বীর হয়ে ওঠেন।

'৬৬-এর বিশ্বকাপে রক্ষণাত্মক কৌশলেরই প্রাধান্য ছিল। প্রতিটি দলই সুইপার সিস্টেম ব্যবহার করত, যেখানে ফুলব্যাকদের পেছনে গোললাইনের কাছে একজন অতিরিক্ত ডিফেন্ডার থাকত। তা সত্ত্বেও, পর্তুগালের আফ্রিকান গোলন্দাজ ইউসেবিও সেই দুর্ভেদ্য রক্ষণভাগ ভেদ করতে সক্ষম হয়েছিলেন নয়বার। সর্বোচ্চ গোলদাতাদের তালিকায় তাঁর পেছনেই ছিলেন জার্মানির হ্যালার, ছয়টি গোল নিয়ে।



গ্রিভস

পশ্চিমা বিশ্বে তিনিই হতেন দ্রুততম পদচারী।

আমি ফুটবল মাঠে কুড়ি বছর বয়স হওয়ার আগেই তিনি একশোটা গোল করেছিলেন, এবং পঁচিশ বছর বয়সেও এমন কোনো বজ্রনিরোধক যন্ত্র আবিষ্কার হয়নি যা দিয়ে তাকে মাটিতে নামিয়ে আনা যায়। তিনি শুধু দৌড়াতেন না, যেন বিস্ফোরিত হতেন: জিমি গ্রিভস এত দ্রুত গতিতে দৌড় শুরু করতেন যে রেফারিরা ভুল করে তাকে অফসাইড ঘোষণা করতেন, কারণ তার আকস্মিক খোঁচা আর নিখুঁত নিশানার শটগুলো কোথা থেকে আসত, তা তারা বুঝে উঠতে পারতেন না। তারা তাকে মাটিতে নামতে দেখতেন, কিন্তু তাকে উড়তে কখনো দেখতেন না।

সে বলল, “আমি গোল করতে এতটাই মরিয়া যে আমার কষ্ট হচ্ছে।”

'৬৬ সালের বিশ্বকাপে গ্রিভসের ভাগ্য ভালো ছিল না। তিনি একটিও গোল করতে পারেননি এবং জন্ডিসে আক্রান্ত হওয়ায় ফাইনাল থেকে বাদ পড়েছিলেন।



বেকেনবাউয়ারের গোল

ঘটনাটি ১৯৬৬ সালের বিশ্বকাপে ঘটেছিল। জার্মানি খেলছিল
আমি সুইজারল্যান্ড।

উভে সিলার ফ্রানৎস বেকেনবাউয়ারের সাথে মিলে আক্রমণ শুরু করলেন; দুজন যেন স্যাঞ্চো পাঞ্জা আর ডন কুইক্সোটের মতো, এক অদৃশ্য ট্রিগারের ছোড়া বলের মতো এদিক-ওদিক ছুটে চললেন, একবার তোমার, একবার আমার। পুরো সুইস রক্ষণভাগ যখন বধিরের মতো অকেজো হয়ে পড়ল, বেকেনবাউয়ার গোলরক্ষক এলসেনারের মুখোমুখি হলেন, যিনি বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বেকেনবাউয়ার পুরো গতিতে ঘুরে গিয়ে বিপরীত দিকে শট নিলেন, আর বল জালে জড়িয়ে গেল।

বেকেনবাউয়ারের বয়স ছিল কুড়ি এবং সেটি ছিল বিশ্বকাপে তাঁর প্রথম গোল।
এরপর তিনি খেলোয়াড় বা ম্যানেজার হিসেবে আরও চারটি টুর্নামেন্টে অংশ নেন এবং কোনোবারই তৃতীয় স্থানের নিচে শেষ করেননি। তিনি দুইবার রিমেট কাপ জিতেছিলেন: '৭৪ সালে খেলোয়াড় হিসেবে এবং '৯০ সালে ম্যানেজার হিসেবে। নিছক ট্যাংকের মতো শক্তির ফুটবলের প্রচলিত ধারার বিপরীতে গিয়ে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, নান্দনিকতা একটি ট্যাংকের চেয়েও বেশি শক্তিশালী এবং সূক্ষ্মতা একটি হাউইটজারের চেয়েও বেশি ভেদকারী হতে পারে।

মাঝমাঠের এই সম্রাট, যিনি 'দ্য কাইজার' নামে পরিচিত ছিলেন, মিউনিখের এক শ্রমিক-অধ্যুষিত এলাকায় জন্মগ্রহণ করলেও আক্রমণ ও রক্ষণ উভয়কেই তিনি আভিজাত্যের সাথে পরিচালনা করতেন। রক্ষণভাগে তাঁর নজর এড়াতো না: একটি বল, একটি মাছি, একটি মশাও তাঁর নাগালের বাইরে থাকতো না। আর যখন তিনি মাঠ জুড়ে ছুটে বেড়াতেন, তখন তাঁর গতি ছিল আগুনের মতো।

ইউসেবিও

এইচ সে জুতো পালিশ করতে, বাদাম বিক্রি করতে বা পকেটমারি করতে জন্মেছিল। শৈশবে তারা তাকে ‘নিংগেম’ বলে ডাকত: কেউ না, নগণ্য। এক বিধবার ছেলে। মা, সে তার অনেক বন্ধুর সাথে ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ফুটবল খেলত। বস্তির খালি জায়গাগুলোতে ভাইয়েরা।

সে মাঠে পা রাখল ঠিক সেইভাবে দৌড়ে, যেভাবে কেবল পুলিশ বা দারিদ্র্যের হাত থেকে পালাতে থাকা কোনো ব্যক্তিই দৌড়াতে পারে। এভাবেই সে কুড়ি বছর বয়সে আঁকাবাঁকা পথে দৌড়ে ইউরোপের চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। সবাই তাকে ‘দ্য প্যান্থার’ বলে ডাকত।

১৯৬৬ সালের বিশ্বকাপে, তার দীর্ঘ পদক্ষেপে প্রতিপক্ষরা মাটিতে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত, এবং অসম্ভব কোণ থেকে করা তার গোলগুলো এমন উল্লাসের জন্ম দিত যা কখনো শেষ হতো না।

পর্তুগালের সর্বকালের সেরা খেলোয়াড় ছিলেন মোজাম্বিকের একজন আফ্রিকান। ইউসেবিও: লম্বা পা, ঝুলন্ত হাত, বিষণ্ণ চোখ।



পোস্টগুলির অভিশাপ

টি রক্ষকটির মুখটা ছিল কুঠার দিয়ে খোদাই করা এবং বসন্ত রোগে ক্ষতবিক্ষত। তার বিশাল, গাঁটযুক্ত হাতগুলো জালটাকে খিল ও তালা দিয়ে আটকে দিল, আর তার পা দুটো ছুটে গেল। কামানের গোলার মতো। আমি যত ব্রাজিলিয়ান গোলকিপার দেখেছি, তাদের মধ্যে মাঙ্গাকেই আমার সবচেয়ে বেশি মনে আছে। একবার মন্টেভিডিওতে আমি তাকে এক গোল থেকে আরেক গোলে গোল করতে দেখেছিলাম: মাঙ্গা তার গোলপোস্ট থেকে কিক করেছিলেন এবং অন্য কোনো খেলোয়াড় বলটি স্পর্শ না করেই সেটি প্রতিপক্ষের জালে ঢুকে গিয়েছিল। ব্রাজিল থেকে বিতাড়িত হওয়ার প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে তিনি উরুগুয়ের ক্লাব ন্যাসিওনালের হয়ে খেলছিলেন। ব্রাজিলিয়ান দল '৬৬-এর বিশ্বকাপ থেকে লজ্জায় মুখ নিচু করে দেশে ফিরেছিল, যেখানে তারা এক অপমানজনক পরাজয়ের শিকার হয়েছিল, এবং মাঙ্গা ছিলেন সেই জাতীয় কলঙ্কের বলির পাঁঠা। তিনি মাত্র একটি ম্যাচ খেলেছিলেন। তিনি একটি ভুল করেন, বল তার দিকে এগিয়ে আসে এবং দুর্ভাগ্যবশত, পর্তুগাল খালি জালে গোল করে বসে। সেই দুর্ভাগ্যজনক ভুলটি এতটাই কেলেঙ্কারিতে পরিণত হয়েছিল যে, দীর্ঘকাল ধরে গোলকিপারদের ভুলগুলো ' মাঙ্গেইরাদাস' নামে পরিচিত ছিল।



'৫৮ সালের বিশ্বকাপে এরকমই কিছু একটা ঘটেছিল, যখন আর্জেন্টিনার পরাজয়ের মূল্য গোলরক্ষক আমাদেও কারিজোকে দিতে হয়েছিল। আর তারও আগে, ১৯৫০ সালে, মারাকানায় অনুষ্ঠিত ফাইনালে ব্রাজিলের হারের জন্য মোয়াসির বারবোসাকে বলির পাঁঠা বানানো হয়েছিল।

১৯৯০ সালের বিশ্বকাপে ক্যামেরুন কলম্বিয়াকে পরাজিত করে, যারা সবেমাত্র জার্মানির বিপক্ষে একটি দুর্দান্ত ম্যাচ জিতেছিল। আফ্রিকান দলটির জয়সূচক গোলটি আসে গোলরক্ষক রেনে হিগুয়িতার একটি নির্বোধ ভুলের কারণে; তিনি বল নিয়ে মাঝমাঠ পর্যন্ত উঠে গিয়ে সেখানেই তা হারিয়ে ফেলেন। যে লোকেরা এমন দুঃসাহসিকতার ভালো ফল হলে উল্লাস করতে ভালোবাসে, তারাই হিগুয়িতা দেশে ফেরার পর তাকে জীবন্ত খেয়ে ফেলতে চেয়েছিল।

১৯৯৩ সালে হিগুয়িতাকে ছাড়াই কলম্বিয়ার দল বুয়েনস আইরেসে আর্জেন্টিনাকে ৫-০ গোলে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। এমন একটি অপমানের জন্য কাউকে দোষারোপ করাটা জরুরি ছিল, এবং দোষী ব্যক্তিটি আর কে হতে পারে?—গোলরক্ষক। সার্জিও গোয়কোয়েচিয়াকেই সব ভাঙা থালার খেসারত দিতে হয়েছিল। আর্জেন্টিনার দলটি ত্রিশটিরও বেশি ম্যাচে অপরাজিত ছিল, এবং প্রতিটি ম্যাচেই তাদের সাফল্যের চাবিকাঠি ছিলেন গোয়কোয়েচিয়া। কিন্তু কলম্বিয়ার সেই গোল উৎসবের পর, এই অলৌকিক পেনাল্টি-রক্ষাকারী শুধু তার 'সেন্ট গোয়কো' ডাকনামই হারাননি, তিনি দলে তার জায়গাও হারিয়েছিলেন। একাধিক ভক্ত তাকে আত্মহত্যার পরামর্শও দিয়েছিল।



পেনারোলের গৌরবময় বছরগুলি

১৯৬৬ সালে আমেরিকা ও ইউরোপের চ্যাম্পিয়ন, পেনিয়ারোল এবং রিয়াল মাদ্রিদ, দুইবার আমি একে অপরের মুখোমুখি হয়েছিল। চমৎকার ড্রিবলিং, সুন্দর খেলা এবং প্রায় ঘামহীন অবস্থায় পেনিয়ারোল দুটি ম্যাচই ২-০ গোলে জিতেছিল।

১৯৬০-এর দশকে পেনিয়ারোল বিগত দশকের সর্বশ্রেষ্ঠ দল রিয়াল মাদ্রিদের কাছ থেকে শিরোপার উত্তরাধিকারী হয়। সেই বছরগুলোতে পেনিয়ারোল দুইবার ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ এবং তিনবার আমেরিকাস চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।

যখন বিশ্বের সেরা দল মাঠে নামল, তারা সতর্ক করে দিল বিপক্ষ খেলোয়াড়রা: "তোমরা কি অন্য বল এনেছ? এটা আমাদের।"

মাযুরকিভিচের জালে বলের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, মাঝমাঠে তিনি 'টিটো' গনসালভেসের নির্দেশ মানতেন, এবং সামনে স্পেন্সার ও জোয়ার পায়ে পায়ে ক্ষিপ্রতার সাথে চলতেন। 'পেপে' সাসিয়ার নির্দেশে তিনি গোল করতেন। কিন্তু তিনি আনন্দও পেতেন, বিশেষ করে যখন পেদ্রো রোচা তাকে সামনে-পেছনে দোলাতেন।

রোচার গোল

সালটা ছিল ১৯৬৯। পেনিয়ারোল খেলছিল লা প্লাটার এস্তুদিয়ান্তেসের বিপক্ষে। রোচা মাঠের আমি মাঝখানে, দুজন খেলোয়াড়ের মার্কিংয়ে, প্রতিপক্ষের এলাকার দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এমন সময় মাতোসাসের কাছ থেকে বল পেলেন। তিনি ডান পায়ে বলটা স্থির করে রাখলেন, বলটা পায়েই রেখে ঘুরে দাঁড়ালেন, অন্য পায়ের আড়ালে বলটা নিয়ে তার মার্কিংয়ে থাকা এচেকোপার ও তাভেরনাকে কাটিয়ে বেরিয়ে গেলেন। তিনি দ্রুত তিনবার দৌড়ে স্পেন্সারকে বলটা দিয়ে আবার দৌড়াতে থাকলেন। ফিরতি পাসটা সেমি-সার্কেলের ওপরের দিকে এল। তিনি বুক দিয়ে বলটা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে মাদেরো ও স্পাদারোকে কাটিয়ে বেরিয়ে এলেন এবং বল মাটিতে পড়ার আগেই ভলিতে শট নিলেন। গোলরক্ষক ফ্লোরেস সেটা দেখতেই পাননি।

পেদ্রো রোচা ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সাপের মতো এঁকেবেঁকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি আনন্দের সঙ্গে খেলতেন এবং তাঁর সেই আনন্দ ছিল সংক্রামক: খেলার আনন্দ, গোলের আনন্দ। সে বলটা দিয়ে যা খুশি তাই করত, আর মেয়েটি তার প্রতিটি কথাই বিশ্বাস করত।



আমার দরিদ্র প্রিয় মা

একটি ১৯৬০-এর দশকের শেষে, কবি হোর্হে এনরিকে আদুম ফিরে এসেছিলেন দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর ইকুয়েডরে। পৌঁছানো মাত্রই তিনি পরিবেশন করলেন। কুইটো শহরের একটি অবশ্য পালনীয় প্রথা: তিনি স্টেডিয়ামে গিয়েছিলেন অউকাসদের খেলা দেখতে গেলাম। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ছিল এবং গ্যালারি কানায় কানায় পূর্ণ ছিল।

খেলা শুরুর আগে রেফারির মায়ের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়, যিনি সেদিন সকালে মারা গিয়েছিলেন। সবাই উঠে দাঁড়িয়েছিল, সবাই নীরব ছিল।

এরপর কেউ একজন বক্তৃতা দিয়ে সেই অনুকরণীয় ক্রীড়াবিদের নিষ্ঠার প্রশংসা করলেন, যিনি সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতেও নিজের কর্তব্য পালন করে খেলা পরিচালনা করতে যাচ্ছিলেন। মাঠের মাঝখানে, মাথা নত করে, কালো পোশাক পরা লোকটি দর্শকদের একটানা করতালির জবাব দিলেন। আদুম পলক ফেলল, নিজেকে চিমটি কাটল: সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে কোন দেশে আছে?

অনেক কিছুই বদলে গেছে। আগে রেফারিকে নিয়ে মানুষের একমাত্র চিন্তা ছিল তাকে গালি দেওয়া।

এবং ম্যাচ শুরু হলো। পনেরো মিনিটে আওকাস গোল করল আর স্টেডিয়াম উল্লাসে ফেটে পড়ল। কিন্তু রেফারি অফসাইডের কারণে গোলটি বাতিল করে দিলেন, এবং দর্শকদের ভাবনা সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত মায়ের দিকে চলে গেল: "কুত্তীটার অনাথ!" গর্জে উঠল গ্যালারি।



রুমাল থেকে অশ্রু ঝরে না

এস ফুটবল, যা যুদ্ধের রূপক, মাঝে মাঝে সত্যিকারের যুদ্ধে পরিণত হয়। তখন 'সাডেন ডেথ' আর শুধু একটি টাই হওয়া ম্যাচের নাটকীয় নিষ্পত্তির নাম থাকে না। আজকাল, ফুটবল উন্মাদনা সেই স্থান দখল করেছে যা আগে ধর্মীয় উন্মাদনা, দেশপ্রেমের তীব্র আবেগ এবং রাজনৈতিক উত্তেজনার জন্য সংরক্ষিত ছিল।
ধর্ম, দেশপ্রেম এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমনটা প্রায়শই ঘটে, ফুটবলও উত্তেজনাকে চরমে পৌঁছে দিতে পারে এবং এর নামে বহু ভয়াবহ ঘটনা সংঘটিত হয়।

কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে বলের উন্মাদনায় মত্ত পুরুষদের মুখ দিয়ে ফেনা বের হয়, এবং সত্যি বলতে, এই চিত্রটি একজন উন্মত্ত ভক্তের বেশ সঠিক একটি ছবি তুলে ধরে। কিন্তু এমনকি সবচেয়ে ক্ষুব্ধ সমালোচকরাও স্বীকার করবেন যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সহিংসতার উৎস ফুটবল নয়, ঠিক যেমন রুমাল থেকে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে না।

১৯৬৯ সালে হন্ডুরাস এবং এল সালভাদরের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। এই দুটি মধ্য আমেরিকার ছোট ও অত্যন্ত দরিদ্র দেশ এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে একে অপরকে অবিশ্বাস করার কারণ জমা করে আসছিল। একে অপরের সমস্যার জন্য প্রত্যেকেই সবসময় এক জাদুকরী ব্যাখ্যা হিসেবে কাজ করত। হন্ডুরাসের মানুষের কাজ নেই? কারণ সালভাদরীয়রা এসে তাদের চাকরি নিয়ে যায়। সালভাদরীয়রা ক্ষুধার্ত? কারণ হন্ডুরাসরা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে। উভয় দেশই বিশ্বাস করত যে তাদের প্রতিবেশীই শত্রু, এবং উভয়ের নির্মম সামরিক স্বৈরশাসন এই ভুল ধারণাটিকে স্থায়ী করার জন্য সম্ভাব্য সবকিছুই করেছিল।

এই যুদ্ধকে ফুটবল যুদ্ধ বলা হতো, কারণ তেগুসিগালপা এবং সান সালভাদরের স্টেডিয়ামগুলোতেই এই দাবানলের সূত্রপাত হয়েছিল।
১৯৭০ সালের বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব চলাকালে সমস্যাটি শুরু হয়েছিল।
ধস্তাধস্তি হয়েছিল, কয়েকজন আহত ও নিহত হন। এক সপ্তাহ পর, দুই দেশ সম্পর্ক ছিন্ন করে। হন্ডুরাস এক লক্ষ লোককে বহিষ্কার করে।

এল সালভাদরের কৃষকেরা, যারা বরাবরই সে দেশের চাষাবাদ ও ফসল কাটার কাজে নিয়োজিত ছিল; এল সালভাদরের ট্যাঙ্কগুলো সীমান্ত অতিক্রম করল।

যুদ্ধটি এক সপ্তাহ ধরে চলেছিল এবং এতে চার হাজার মানুষ নিহত হয়েছিল। 'স্কুল অফ দ্য আমেরিকাস' নামক এক মার্কিন কারখানায় তৈরি হওয়া স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা দুটি সরকার পারস্পরিক ঘৃণার আগুনে ঘি ঢেলেছিল। তেগুসিগালপায় স্লোগান ছিল, "হন্ডুরান, চুপ করে বসে থেকো না, একটি লাঠি ধরো আর একজন সালভাদোরান এসে হত্যা করুক।" সান সালভাদোরে: "ঐ বর্বরদের একটা শিক্ষা দাও।" ভূমি ও যুদ্ধের অধিপতিদের এক ফোঁটা রক্তও ঝরেনি, অথচ খালি পায়ে থাকা দুটি জাতি একে অপরকে নির্বিচারে হত্যা করে তাদের একই রকম দুর্ভাগ্যের প্রতিশোধ নিয়েছিল।

পেলে-র গোল

সালটা ছিল ১৯৬৯। মারাকানা স্টেডিয়ামে সান্তোস ভাস্কো দা গামার বিপক্ষে খেলছিল।
আমি পেলে বিদ্যুৎ গতিতে মাঠ পার হলেন, প্রতিপক্ষদেরকে কোনো বাধা ছাড়াই এড়িয়ে গেলেন।
মাটিতে পা রেখে, বলসহ গোলে ঢুকতে যাওয়ার মুহূর্তে তাকে ফেলে দেওয়া হয়।

রেফারি পেনাল্টির বাঁশি বাজালেন। পেলে পেনাল্টিটি নিতে চাইলেন না। একশ হাজার হাজার মানুষ তার নাম ধরে চিৎকার করতে করতে তাকে বাধ্য করেছিল।

পেলে মারাকানায় অনেক গোল করেছিলেন। অসাধারণ সব গোল, যেমন ১৯৬১ সালে ফ্লুমিনেন্সের বিপক্ষে করা সেই গোলটি, যেখানে তিনি সাতজন ডিফেন্ডার এবং গোলরক্ষককেও ড্রিবল করে কাটিয়েছিলেন। কিন্তু এই পেনাল্টিটি ছিল অন্যরকম; মানুষের মনে হচ্ছিল এর মধ্যে একটা পবিত্রতা আছে। একারণেই পৃথিবীর সবচেয়ে কোলাহলপূর্ণ দর্শকের ভিড়টা স্তব্ধ হয়ে গেল। কোলাহলটা যেন কোনো আদেশ পালনের মতো উধাও হয়ে গেল: কেউ কথা বলল না, কেউ নিঃশ্বাস নিল না। হঠাৎ করেই গ্যালারি আর খেলার মাঠ দুটোই যেন খালি মনে হলো। পেলে আর গোলরক্ষক আন্দ্রাদা একা ছিলেন। তারা একাই অপেক্ষা করছিলেন। পেলে সাদা পেনাল্টি স্পটের ওপর রাখা বলটার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বারো কদম দূরে, দুই পোস্টের মাঝখানে, প্রস্তুত হয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ছিলেন আন্দ্রাদা।

গোলরক্ষক বলটা ছুঁয়ে দিতে পারলেও, পেলে সজোরে বলটা জালে জড়িয়ে দেন। এটি ছিল তার হাজারতম গোল। পেশাদার ফুটবলের ইতিহাসে আর কোনো খেলোয়াড় কখনো হাজার গোল করতে পারেননি।

তারপর জনতা যেন প্রাণ ফিরে পেল এবং আনন্দে উচ্ছ্বসিত শিশুর মতো লাফাতে লাগল, রাত্রিকে আলোকিত করে।



পেলে

একটি শত শত গানে তার নাম রয়েছে। সতেরো বছর বয়সে তিনি ছিলেন চ্যাম্পিয়ন। বিশ্বের এবং ফুটবলের রাজা। তার বিশ বছর বয়স হওয়ার আগেই সরকার ব্রাজিল তাকে এমন এক "জাতীয় সম্পদ" হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল যা বিদেশে রপ্তানি করা যাবে না। তিনি ব্রাজিল দলের হয়ে তিনটি এবং সান্তোস ক্লাবের হয়ে দুটি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিলেন। হাজারতম গোলের পরেও তিনি গোল গণনা চালিয়ে যান। তিনি আশিটি দেশে একের পর এক অত্যন্ত কঠিন গতিতে তেরোশোরও বেশি ম্যাচ খেলেছেন এবং প্রায় তেরোশো গোল করেছেন। একবার তিনি একটি যুদ্ধ থামিয়ে দিয়েছিলেন: তার খেলা দেখার জন্য নাইজেরিয়া ও বিয়াফ্রা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছিল।

তার খেলা দেখাটা যুদ্ধবিরতি এবং তার চেয়েও অনেক বেশি মূল্যবান ছিল। পেলে যখন সজোরে দৌড়াতেন, তখন তিনি মাখনের ওপর গরম ছুরির মতো প্রতিপক্ষকে কেটে ফেলতেন। আর যখন তিনি থামতেন, তখন তার পায়ের তৈরি করা গোলকধাঁধায় প্রতিপক্ষরা হারিয়ে যেত। যখন সে লাফ দিত, তখন যেন সিঁড়ির মতো হাওয়ায় উঠে যেত। যখন সে ফ্রি-কিক নিত, মানবপ্রাচীরে থাকা তার প্রতিপক্ষরা গোলটি যাতে মিস না হয়, সেজন্য নেটের দিকে ঘুরে দাঁড়াতে চাইত।

তিনি এক দূরবর্তী গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির এমন এক শিখরে পৌঁছেছিলেন যেখানে কৃষ্ণাঙ্গদের প্রবেশাধিকার ছিল না। খেলার মাঠের বাইরে তিনি এক মুহূর্তও সময় দেননি এবং তাঁর পকেট থেকে একটি পয়সাও খরচ হয়নি। কিন্তু আমাদের মধ্যে যারা তাঁর বাজনা দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম, তারা অসাধারণ সৌন্দর্যের উপহার পেয়েছিলাম: এমন সব অমরত্বযোগ্য মুহূর্ত যা আমাদের অমরত্বের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে বাধ্য করে।



১৯৭০ সালের বিশ্বকাপ

প্রাগের সিনেমার পুতুলনাচের শিল্পী জিরি ত্রনকা মৃত্যুপথযাত্রী ছিলেন; লন্ডনে প্রায় এক আমি শতাব্দীর অত্যন্ত প্রাণবন্ত জীবনের পর বার্ট্রান্ড রাসেলও তাই। মাত্র বিশ বছর পর, মানাগুয়ায় সোমোজা স্বৈরশাসনের একটি ব্যাটালিয়নের বিরুদ্ধে একা লড়াই করতে করতে কবি রুগামাও মৃত্যুবরণ করছিলেন। বিশ্ব তার সঙ্গীত হারাচ্ছিল: সাফল্যের বাড়াবাড়ির কারণে বিটলস ভেঙে যাচ্ছিল, এবং মাদকের বাড়াবাড়ির কারণে গিটারিস্ট জিমি হেন্ড্রিক্স ও গায়িকা জ্যানিস জপলিনও বিদায় নিচ্ছিলেন।

পাকিস্তানে একটি হারিকেন তাণ্ডব চালাচ্ছিল এবং পেরুর আন্দিজ পর্বতমালায় একটি ভূমিকম্প পনেরোটি শহর নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছিল। ওয়াশিংটনে, যদিও ভিয়েতনাম যুদ্ধে আর কেউ বিশ্বাস করত না, যুদ্ধটি দীর্ঘায়িত হচ্ছিল; পেন্টাগনের মতে, মৃতের সংখ্যা দশ লাখে পৌঁছেছিল এবং জেনারেলরা কম্বোডিয়া আক্রমণ করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল। আগের তিনটি প্রচেষ্টায় পরাজিত হওয়ার পর, আলেন্দে চিলির রাষ্ট্রপতি পদের জন্য আরেকটি প্রচারণা শুরু করছিলেন, যেখানে তিনি প্রতিটি শিশুর জন্য দুধ এবং দেশের তামার জাতীয়করণের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন। মায়ামির নির্ভরযোগ্য সূত্রগুলো ফিদেল কাস্ত্রোর আসন্ন পতনের ঘোষণা দিচ্ছিল, এটি ছিল মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ভ্যাটিকান ধর্মঘটে গিয়েছিল। রোমে পোপের কর্মচারীরা যখন হাত গুটিয়ে বসেছিল, তখন মেক্সিকোতে ষোলটি দেশের খেলোয়াড়রা পা নাড়াচ্ছিল এবং নবম বিশ্বকাপ শুরু হয়ে গিয়েছিল।

ইউরোপ থেকে নয়টি, আমেরিকা থেকে পাঁচটি দল, সাথে ইসরায়েল ও মরক্কো অংশগ্রহণ করেছিল। প্রথম ম্যাচে রেফারি প্রথমবারের মতো হলুদ কার্ড দেখান। মেক্সিকো বিশ্বকাপে সতর্কতামূলক চিহ্ন হিসেবে হলুদ কার্ড এবং বহিষ্কারের চিহ্ন হিসেবে লাল কার্ডই একমাত্র নতুনত্ব ছিল না। নিয়ম অনুযায়ী এখন প্রতিটি ম্যাচের মধ্যে দুজন খেলোয়াড় বদল করার অনুমতি ছিল। এর আগে,

আঘাত পেলে কেবল গোলরক্ষককেই বদলানো যেত, এবং কয়েকটি নিখুঁত কিকের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড় সংখ্যা কমিয়ে আনা কখনোই খুব কঠিন ছিল না।

১৯৭০ বিশ্বকাপের কিছু ছবি: এক হাতে স্লিং নিয়ে শেষ মিনিট পর্যন্ত লড়াই করে যাওয়া বেকেনবাউয়ারের ছাপ; চোখের অপারেশনের পর সতেজ হয়ে প্রতিটি ম্যাচে সাবলীলভাবে খেলা তোস্তাওয়ের উদ্দীপনা; নিজের শেষ বিশ্বকাপে পেলের আকাশচারী কসরত: তাঁকে মার্ক করা ইতালীয় ডিফেন্ডার বুরগনিখ বলেন, "আমরা একসাথে লাফ দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি যখন নামলাম, দেখতে পেলাম পেলে তখনও বাতাসে ভাসছেন।"

চার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন—ব্রাজিল, ইতালি, পশ্চিম জার্মানি এবং উরুগুয়ে—সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল। জার্মানি তৃতীয় এবং উরুগুয়ে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। ফাইনালে ব্রাজিল ৪-১ গোলে ইতালিকে হতবাক করে দেয়। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম মন্তব্য করেছিল, "এমন সুন্দর ফুটবল নিষিদ্ধ করা উচিত।" ফাইনাল গোলের গল্প বলতে লোকজন উঠে দাঁড়ায়: বলটি পুরো ব্রাজিল জুড়ে ঘুরে বেড়ায়, এগারোজন খেলোয়াড়ের প্রত্যেকেই তা স্পর্শ করে, এবং অবশেষে পেলে, না তাকিয়েই, বলটি যেন এক রুপোর থালায় সাজিয়ে দেন কার্লোস আলবার্তোর জন্য, যিনি টর্নেডোর মতো ছুটে এসে গোলটি করেন।

জার্মানির 'টরপেডো' মুলার দশ গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় শীর্ষে ছিলেন, এরপর সাত গোল নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন ব্রাজিলিয়ান জাইরজিনহো।

তৃতীয়বারের মতো অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়ে ব্রাজিল রিমেট কাপটি চিরদিনের জন্য নিজেদের কাছে রেখে দেয়। ১৯৮৩ সালের শেষের দিকে কাপটি চুরি হয়ে যায় এবং গলিয়ে প্রায় দুই কেজি খাঁটি সোনায় পরিণত করার পর বিক্রি করে দেওয়া হয়। প্রদর্শনীর বাক্সে এর জায়গায় একটি প্রতিরূপ রাখা আছে।



জাইরজিনহোর গোল

ঘটনাটি ১৯৭০ সালের বিশ্বকাপের। ব্রাজিল খেলছিল ইংল্যান্ডের বিপক্ষে।

আমি পাওলো সেজারের কাছ থেকে বল পেয়ে তোস্তাও যতদূর সম্ভব ছুটে গেলেন, কিন্তু পেনাল্টি এরিয়ায় ইংল্যান্ডের সবাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। এমনকি রানিও সেখানে ছিলেন। তোস্তাও একজনকে, তারপর আরেকজনকে এবং আরও একজনকে কাটিয়ে পেলেকে বল দিলেন। তিনজন খেলোয়াড় তাকে সেখানেই চেপে ধরল। পেলে এগিয়ে যাওয়ার ভান করলেন এবং তিনজন প্রতিপক্ষ তাকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করল। তিনি ব্রেক কষে, ঘুরে দাঁড়িয়ে, ছুটে আসা জাইরজিনহোর পায়ে বল ছেড়ে দিলেন। জাইরজিনহো রিও ডি জেনিরোর সবচেয়ে কঠিন বস্তির বালুমাঠে তার মার্কিং করা খেলোয়াড়দের কাটিয়ে যেতে শিখেছিলেন। তিনি একটি কালো বুলেটের মতো ছুটে এলেন এবং একজন ইংরেজকে কাটিয়ে যাওয়ার পর বলটি, একটি সাদা বুলেটের মতো, গোলরক্ষক ব্যাঙ্কসের রক্ষণে থাকা গোললাইন পার হলো।

ওটাই ছিল জয়সূচক গোল। উৎসবের ছন্দে দুলতে দুলতে ব্রাজিলের আক্রমণকারীরা ইস্পাতের দুর্গের সাতজন রক্ষীকে ছিটকে ফেলে দিয়েছিল, যা দক্ষিণ দিক থেকে বয়ে আসা উষ্ণ বাতাসে যেন গলে গিয়েছিল।



ফিয়েস্তা

টি ব্রাজিলে এমন শহর ও গ্রাম আছে যেখানে কোনো গির্জা নেই, কিন্তু একটিও নেই। একটির ফুটবল মাঠ নেই। রবিবার কঠোর পরিশ্রমের দিন। সারাদেশে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ। সাধারণ রবিবারে ফুটবলের প্রার্থনাসভায় মানুষ উত্তেজনায় মারা যায়। ফুটবলবিহীন রবিবারে মানুষ একঘেয়েমিতে মারা যায়।

'৬৬ সালের বিশ্বকাপে যখন ব্রাজিল জাতীয় দল বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলো, তখন আত্মহত্যা, মানসিক বিপর্যয়, অর্ধনমিত পতাকা এবং দরজায় কালো ফিতা দেখা গিয়েছিল। দেশের ফুটবল শক্তিকে কফিনে সমাহিত করতে নৃত্যরত শোকাহতদের এক মিছিল রাস্তাঘাট ভরে দিয়েছিল। চার বছর পর, ব্রাজিল তৃতীয়বারের মতো বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জিতল এবং নেলসন রদ্রিগেজ লিখলেন যে, ব্রাজিলিয়ানরা আর কুকুর-ধরা লোকের হাতে ধরা পড়ার ভয় পায় না, তারা সবাই এখন ছুঁচালো মুকুট পরা, পশমের চাদরে মোড়া রাজা।



১৯৭০ সালের বিশ্বকাপে ব্রাজিল এমন এক ফুটবল খেলেছিল যা তাদের জনগণের উদযাপনের আকাঙ্ক্ষা এবং সৌন্দর্যের বাসনার যোগ্য ছিল। পুরো বিশ্ব তখন রক্ষণাত্মক ফুটবলের সাধারণ মানের কারণে ভুগছিল, যেখানে পুরো দলই ক্যাতেনাচিও বজায় রাখার জন্য পেছনে পড়ে থাকত, আর সামনে এক বা দুজন খেলোয়াড় একাই খেলত। ঝুঁকি এবং সৃজনশীল স্বতঃস্ফূর্ততার কোনো সুযোগ ছিল না। কিন্তু ব্রাজিল ছিল বিস্ময়কর: জাইরজিনহো, তোস্তাও, পেলে এবং রিভেলিনো—এই চারজন স্ট্রাইকারকে নিয়ে আক্রমণে থাকা দলটি কখনো কখনো পাঁচ, এমনকি ছয়জনেও পরিণত হতো যখন গার্সন এবং কার্লোস আলবার্তো পেছন থেকে উঠে আসতেন। সেই অপ্রতিরোধ্য দলটি ফাইনালে ইতালিকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল।

পঁচিশ বছর পরে, এমন দুঃসাহসকে আত্মহত্যা বলে গণ্য করা হতো।
'৯৪ বিশ্বকাপে ব্রাজিল ইতালির বিপক্ষে আরও একটি ফাইনাল জিতেছিল, যেটির নিষ্পত্তি হয়েছিল ১২০ মিনিট ধরে কোনো গোল না হওয়ার পর পেনাল্টি শুটআউটের মাধ্যমে। যদি পেনাল্টি শট না থাকত, তবে জালগুলো হয়তো চিরকালের জন্য অস্পর্শিতই থেকে যেত।

সকার এবং জেনারেলরা

একটি ১৯৭০ সালের বিজয় উৎসবে, ব্রাজিলের স্বৈরশাসক জেনারেল মেদিচি, খেলোয়াড়দের হাতে নগদ টাকা তুলে দিলেন, ফটোগ্রাফারদের সাথে পোজ দিলেন হাতে ট্রফি, এমনকি ক্যামেরার জন্য হেডও করেছিলেন। দলের জন্য রচিত মার্চ সঙ্গীত, "ফরওয়ার্ড ব্রাজিল," সরকারের জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হয়, আর মাঠের উপরে পেলের উড়ন্ত ছবিটি "ব্রাজিলকে কেউ থামাতে পারবে না" এই স্লোগান সম্বলিত টিভি বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত হতে থাকে। ১৯৭৮ সালে আর্জেন্টিনা যখন বিশ্বকাপ জেতে, জেনারেল ভিদেলা ঠিক একই উদ্দেশ্যে ঘূর্ণিঝড়ের মতো অপ্রতিরোধ্য কেম্পেসের ছবিটি ব্যবহার করেছিলেন।

ফুটবলই পিতৃভূমি, ফুটবলই শক্তি: "আমিই পিতৃভূমি," বলছিল এই সামরিক স্বৈরশাসকরা।

এদিকে, চিলির প্রভাবশালী নেতা জেনারেল পিনোশে দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্লাব কোলো-কোলোর সভাপতি হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করেন এবং বলিভিয়ার ক্ষমতা দখলকারী জেনারেল গার্সিয়া মেজা বহু একনিষ্ঠ সমর্থক থাকা ক্লাব উইলস্টারম্যানের সভাপতি হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করেন।

ফুটবলই জনগণ, ফুটবলই শক্তি: "আমিই জনগণ," বলছিল এই সামরিক স্বৈরশাসকরা।



পলক ফেলবেন না

ই আর্জেন্টিনার ক্লাব ইন্ডিপেন্ডিয়েন্তের ফরোয়ার্ড দুয়ার্দো আন্দ্রেস মাগলিওনি সবচেয়ে কম সময়ে সর্বাধিক গোল করার কৃতিত্ব অর্জন করে গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে স্থান করে নিয়েছেন।

১৯৭৩ সালে, লা প্লাটার জিমনেসিয়া ই এসগ্রিমার বিরুদ্ধে একটি ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে, মাগলিওনি এক মিনিট পঞ্চাশ সেকেন্ডের মধ্যে গোলরক্ষক গুরুচিয়াগাকে তিনবার পরাস্ত করেন।

ম্যারাডোনার গোল

সালটা ছিল ১৯৭৩। আর্জেন্টিনোস জুনিয়র্স এবং রিভার প্লেটের যুব দলগুলো।
আমি বুয়েনস আইরেসে খেলছিলেন।

আর্জেন্টিনোসের ১০ নম্বর খেলোয়াড়টি গোলকিপারের কাছ থেকে বল পেয়ে রিভারের সেন্টার ফরোয়ার্ডকে কাটিয়ে দৌড় শুরু করল। বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় তার পথ আটকানোর চেষ্টা করল: সে প্রথমজনের মাথার উপর দিয়ে, দ্বিতীয়জনের দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে বল পাঠাল, আর তৃতীয়জনকে ব্যাকহিল দিয়ে বোকা বানাল। তারপর, এক মুহূর্তও না থেমে, সে ডিফেন্ডারদের স্তব্ধ করে দিল, গোলকিপারকে মাটিতে ফেলে দিল এবং হেঁটে বল জালে জড়িয়ে দিল। মাঠে দাঁড়িয়ে ছিল হতাশ সাতজন ছেলে এবং আরও চারজন হাঁ করে তাকিয়ে।

সেই ছেলেটির দল, সেবোল্লিতাস, টানা একশোটি ম্যাচে অপরাজিত থেকে সংবাদমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। দলের তেরো বছর বয়সী একজন খেলোয়াড়, "পয়জন", ঘোষণা করেছিল, "আমরা আনন্দের জন্য খেলি। আমরা কখনো টাকার জন্য খেলব না। যখন টাকার ব্যাপার আসে, তখন সবাই তারকা হওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে এবং তখনই ঈর্ষা ও স্বার্থপরতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।"

কথা বলার সময় তাঁর হাত ছিল সবার প্রিয় খেলোয়াড়টির কাঁধে, যিনি ছিলেন সবচেয়ে খাটো এবং সবচেয়ে সুখী: দিয়েগো আরমান্দো মারাদোনা, যাঁর বয়স ছিল বারো এবং যিনি এইমাত্র সেই অবিশ্বাস্য গোলটি করেছিলেন।

আক্রমণে যাওয়ার সময় ম্যারাডোনার জিভ বের করে রাখার অভ্যাস ছিল। তার সব গোলই তিনি জিভ বের করেই করেছিলেন। রাতে তিনি বল জড়িয়ে ঘুমাতো আর দিনে তা দিয়ে অলৌকিক কাণ্ড ঘটাতেন। তিনি এক গরিব পাড়ার গরিব পরিবারে বাস করতেন এবং একজন শিল্প প্রকৌশলী হতে চেয়েছিলেন।



১৯৭৪ সালের বিশ্বকাপ

পি প্রেসিডেন্ট নিক্সন দড়ি থেকে ঝুলছিলেন, দুর্বল হাঁটুতে, প্রচণ্ড ধাক্কায়। ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির কারণে অবিরাম, যখন একটি মহাকাশযান তীব্র গতিতে ছুটে যাচ্ছিল বৃহস্পতি গ্রহের দিকে এবং ওয়াশিংটনে, ভিয়েতনামে একশ বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করা এক সেনা লেফটেন্যান্টকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করা হচ্ছিল। সর্বোপরি, মৃতের সংখ্যা একশ'র বেশি ছিল না, তারা ছিল বেসামরিক নাগরিক, এবং তার চেয়েও বড় কথা, তারা ছিল ভিয়েতনামের নাগরিক।

ঔপন্যাসিক মিগেল অ্যাঞ্জেল অ্যাস্তুরিয়াস ও পার ল্যাগারকভিস্ট এবং চিত্রশিল্পী ডেভিড আলফারো সিকেইরোস মৃত্যুপথযাত্রী ছিলেন। আর্জেন্টিনার ইতিহাসে নিজের ছাপ রেখে যাওয়া জেনারেল পেরোন মৃত্যুশয্যায় ছিলেন। জ্যাজ সঙ্গীতের রাজা ডিউক এলিংটনও মৃত্যুপথযাত্রী ছিলেন। সংবাদপত্রের রাজার কন্যা প্যাট্রিসিয়া হার্স্ট তার অপহরণকারীদের প্রেমে পড়ছিলেন, ব্যাংক ডাকাতি করছিলেন এবং তার বাবাকে একজন বুর্জোয়া শূকর বলে নিন্দা করছিলেন। মিয়ামির নির্ভরযোগ্য সূত্রগুলো ফিদেল কাস্ত্রোর আসন্ন পতনের ঘোষণা দিচ্ছিল, এটি ছিল মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার।

গ্রীসের স্বৈরতন্ত্র ভেঙে পড়ছিল, পর্তুগালেরও তাই, যেখানে কার্নেশন বিপ্লব 'গ্রান্ডোলা, ভিলা মোরেনা' গানের তালে তালে নাচছিল। অগাস্তো পিনোশেটের স্বৈরতন্ত্র চিলির ওপর তার দখল আরও কড়া করছিল, আর এদিকে স্পেনে ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কো ক্ষমতা ও বার্ধক্যে অসুস্থ হয়ে ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কো হাসপাতালে মৃত্যুপথযাত্রী ছিলেন।



এক ঐতিহাসিক গণভোটে ইতালীয়রা বিবাহবিচ্ছেদকে বৈধ করার পক্ষে ভোট দিচ্ছিল, যা বৈবাহিক বিবাদ মীমাংসার জন্য ঐতিহ্যগতভাবে প্রচলিত ছোরা, বিষ এবং অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে শ্রেয় বলে মনে হচ্ছিল। সুইজারল্যান্ডে কম ঐতিহাসিক নয় এমন এক ভোটে বিশ্ব ফুটবলের নেতারা মর্যাদাপূর্ণ স্ট্যানলি রাউসকে সরিয়ে দিয়ে জোয়াও হ্যাভেলাঞ্জকে ফিফার সভাপতি নির্বাচিত করছিলেন, আর এদিকে জার্মানিতে দশম বিশ্বকাপ শুরু হতে যাচ্ছিল।

একটি একেবারে নতুন কাপ প্রদর্শিত হচ্ছিল। রিমেট কাপের চেয়ে দেখতে কুৎসিত হলেও, ইউরোপের নয়টি ও আমেরিকার পাঁচটি দলের পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়া ও জায়ারের কাছেও এটি ছিল অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত। প্রস্তুতি পর্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন চিলির জাতীয় স্টেডিয়ামে একটি বাছাইপর্বের ম্যাচ খেলতে অস্বীকৃতি জানানোয় বাদ পড়েছিল; এই স্টেডিয়ামটি কিছুদিন আগেই একটি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প এবং ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের স্থান ছিল। তাই, সেই স্টেডিয়ামে চিলির দলটি ফুটবলের ইতিহাসে সবচেয়ে শোচনীয় ম্যাচটি খেলেছিল: তারা কোনো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধেই খেলেনি এবং দর্শকদের উল্লাসের মধ্যে খালি জালে বেশ কয়েকটি গোল করেছিল। বিশ্বকাপে চিলি একটিও ম্যাচ জিততে পারেনি।

আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো: ডাচ খেলোয়াড়রা তাদের স্ত্রী বা বান্ধবীদের সঙ্গে জার্মানিতে নিয়ে এসেছিলেন এবং পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে তাদের সাথেই ছিলেন। এমন ঘটনা এই প্রথম ঘটেছিল। আরেকটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো: ডাচরা যেন ডানা মেলেছিল এবং অপরাজিত থেকে ফাইনালে পৌঁছেছিল, তাদের পক্ষে চৌদ্দটি গোল এবং বিপক্ষে মাত্র একটি গোল, যা নিছক দুর্ভাগ্যবশত তাদের নিজেদেরই একজনের করা। ১৯৭৪ সালের বিশ্বকাপটি আবর্তিত হয়েছিল 'ক্লকওয়ার্ক অরেঞ্জ'-কে ঘিরে, যা ছিল কোচ রিনাস মিশেলসের নেতৃত্বে ক্রুইফ, নিস্কেন্স, রেনসেনব্রিঙ্ক, ক্রোল এবং অন্যান্য অক্লান্ত ডাচ খেলোয়াড়দের এক অপ্রতিরোধ্য সৃষ্টি।



ফাইনাল ম্যাচের শুরুতে ক্রুইফ বেকেনবাউয়ারের সাথে পতাকা বিনিময় করেন। আর তারপরেই ঘটল তৃতীয় চমক: কাইজার এবং তার দল ডাচদের উৎসবের বেলুনটি ফাটিয়ে দিল। মাইয়ার যিনি সবকিছু রুখে দিচ্ছিলেন, মুলার যিনি সবকিছুতে গোল করছিলেন, এবং ব্রাইটনার যিনি সবকিছু সমাধান করছিলেন—তারা ফেভারিটদের ওপর যেন দুই বালতি ঠান্ডা জল ঢেলে দিলেন, এবং সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও জার্মানরা ২-১ গোলে জয়লাভ করল। এভাবেই সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত '৫৪ সালের কাপের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটল, যখন জার্মানি অপরাজেয় হাঙ্গেরিকে হারিয়েছিল।

পশ্চিম জার্মানি ও নেদারল্যান্ডসের পেছনে ছিল পোল্যান্ড। চতুর্থ স্থানে ছিল ব্রাজিল, যারা নিজেদের সেরাটা দিতে পারেনি। পোল্যান্ডের একজন খেলোয়াড়, লাতো, সাত গোল করে সর্বোচ্চ স্কোরার হন। তাঁর পরেই ছিলেন আরেক পোলিশ খেলোয়াড়, সারমাখ, এবং ডাচ খেলোয়াড় নিস্কেন্স, প্রত্যেকে পাঁচটি করে গোল করেন।



ক্রুইফ

টি তারা ডাচ দলটিকে "ক্লকওয়ার্ক অরেঞ্জ" বলত, কিন্তু সেখানে ছিল কল্পনার এই সৃষ্টিতে যান্ত্রিক কিছুই ছিল না যা এর অবিরাম পরিবর্তনে সবাই হতবিহ্বল। রিভারের 'মেশিন'-এর মতো, ডাকনামের জন্য কুখ্যাত আরেকটি দলের মতোই, এই কমলা আগুনটি এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছিল; এক সর্বজ্ঞ বাতাস একে কখনো সামনে এগিয়ে দিচ্ছিল, কখনো পেছনে টেনে নিচ্ছিল। সবাই আক্রমণ করছিল এবং প্রত্যেকেই আত্মরক্ষা করছিল, এক ঘূর্ণায়মান পাখার মতো সামনে এগোচ্ছিল আর পেছনে সরে আসছিল। এমন একটি দলের মুখোমুখি হয়ে, যেখানে প্রত্যেকেই ছিল তার সেরাটা, প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়রা তাল হারিয়ে ফেলল।

একজন ব্রাজিলীয় সাংবাদিক একে "সুশৃঙ্খল বিশৃঙ্খলা" বলে অভিহিত করেছিলেন। নেদারল্যান্ডসের ছিল সঙ্গীত, এবং যিনি একই সাথে এতগুলো স্বরকে সঠিক সুরে ও ছন্দে রেখে সেই সুরকে এগিয়ে নিয়ে যেতেন, তিনি ছিলেন ইয়োহান ক্রুইফ।
একই সাথে অর্কেস্ট্রা পরিচালনা এবং নিজের বাদ্যযন্ত্র বাজানোর মাধ্যমে ক্রুইফ অন্য সবার চেয়ে বেশি পরিশ্রম করতেন।

এই রোগাটে চঞ্চল ছেলেটি খুব অল্প বয়সেই আয়াক্স দলে জায়গা করে নিয়েছিল: তার মা যখন ক্লাবের বারে খাবার পরিবেশনের কাজ করতেন, তখন সে মাঠের বাইরে চলে যাওয়া বল কুড়াতো, খেলোয়াড়দের জুতো পালিশ করত এবং কোণায় পতাকা লাগাতো। তারা তাকে যা করতে বলত, সে তাই করত, কিন্তু যা করতে আদেশ করত, তার কিছুই করত না। সে খেলতে চাইত, কিন্তু তারা তাকে খেলতে দিত না, কারণ তার শরীর ছিল খুব দুর্বল আর ইচ্ছাশক্তি ছিল খুব প্রবল। অবশেষে যখন তারা তাকে সুযোগ দিল, সে তা লুফে নিল এবং আর কখনো হাতছাড়া করল না। তখনও বালক বয়সেই তার অভিষেক হয়, সে দুর্দান্ত খেলে, একটি গোল করে এবং এক ঘুষিতে রেফারিকে ধরাশায়ী করে দেয়।

সেই রাত থেকে তিনি ঝগড়াটে, পরিশ্রমী এবং প্রতিভাবান হিসেবে তাঁর খ্যাতি বজায় রেখেছিলেন। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি নেদারল্যান্ডস ও স্পেনে বাইশটি চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিলেন। সাঁইত্রিশ বছর বয়সে তিনি অবসর নেন; তাঁর শেষ গোলটি করার পর, দর্শকরা তাঁকে কাঁধে করে স্টেডিয়াম থেকে তাঁর বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল।

ম্যুলার

টি মিউনিখের টিএসভি ক্লাবের কোচ তাকে বলেছিলেন, “তুমি বেশিদূর এগোতে পারবে না ফুটবল। এর চেয়ে অন্য কিছু চেষ্টা করা ভালো।

তখন গের্ড ম্যুলার একটি বস্ত্র কারখানায় দিনে বারো ঘণ্টা কাজ করতেন। মিল।

এগারো বছর পর, ১৯৭৪ সালে, এই বেঁটেখাটো খেলোয়াড়টি বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। জার্মান লীগ বা জাতীয় দলের ইতিহাসে তাঁর চেয়ে বেশি গোল আর কেউ করেনি।

বৃদ্ধার ছদ্মবেশে, দাঁত ও নখ লুকিয়ে, মাঠের বুনো নেকড়েটা অলক্ষ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছিল, নিরীহ পাস আর অন্যান্য দয়ার কাজ দেখানোর ভান করে। এরই মধ্যে, সে অলক্ষ্যে বক্সের ভেতরে ঢুকে পড়ল। জালটা ছিল এক অপ্রতিরোধ্য তরুণীর বিয়ের ঘোমটা। খোলা গোলপোস্টের সামনে দাঁড়িয়ে সে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল। আর এক ঝটকায় সে নগ্ন হয়ে দাঁড়াল, তারপর কামড় বসাল।

হ্যাভেলাঞ্জ

আমি ১৯৭৪ সালে, দীর্ঘ সংগ্রামের পর, জঁ-মারি ফস্তিন গোডেফ্রয়েড ডি হ্যাভেলাঞ্জ ফিফার শীর্ষপদে পৌঁছে ঘোষণা করেন: "আমি সকার নামের একটি পণ্য বিক্রি করতে এসেছি।"

সেই মুহূর্ত থেকে হ্যাভেলাঞ্জ ফুটবল বিশ্বের উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রয়োগ করে আসছেন। সিংহাসনে আসীন হয়ে, হ্যাভেলাঞ্জ জুরিখের প্রাসাদে একদল লোভী প্রযুক্তিবিদদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে রাজত্ব করেন। তিনি জাতিসংঘের চেয়েও বেশি দেশ শাসন করেন, পোপের চেয়েও বেশি ভ্রমণ করেন এবং যেকোনো যুদ্ধবীরের চেয়ে বেশি পদক পেয়েছেন।

হ্যাভেলাঞ্জ ব্রাজিলে জন্মগ্রহণ করেন, যেখানে তিনি দেশের বৃহত্তম বাস ও ট্রাকিং কোম্পানি কমেটা এবং আর্থিক ফটকাবাজি, অস্ত্র বিক্রয় ও জীবন বীমায় বিশেষায়িত অন্যান্য ব্যবসার মালিক। কিন্তু তার মতামত খুব একটা ব্রাজিলীয় বলে মনে হয় না। লন্ডনের টাইমস পত্রিকার একজন সাংবাদিক একবার তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "ফুটবলের কোন জিনিসটা আপনার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে? এর গৌরব? এর সৌন্দর্য? এর কাব্যিকতা? নাকি জয়?"

এবং তিনি উত্তর দিলেন: "শৃঙ্খলা।"



এই পুরনো ধাঁচের সম্রাট ফুটবলের ভূগোলকে বদলে দিয়েছেন এবং এটিকে বিশ্বের অন্যতম চমৎকার একটি বহুজাতিক ব্যবসায় পরিণত করেছেন।
তার শাসনামলে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণকারী দেশের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে: ১৯৭৪ সালে এই সংখ্যা ছিল ষোলটি, এবং ১৯৯৮ সাল নাগাদ তা বেড়ে বত্রিশটিতে দাঁড়াবে। আর তার হিসাব-নিকাশের ধোঁয়াশা থেকে আমরা যা বুঝতে পারি, তাতে এই টুর্নামেন্টগুলো থেকে অর্জিত মুনাফা এত বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যে, তার তুলনায় বাইবেলের রুটি ও মাছের অলৌকিক ঘটনাটিও একটি তামাশার মতো মনে হয়।

বিশ্ব ফুটবলের নতুন নায়কেরা—আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং এশিয়ার দেশগুলো—হ্যাভেলাঞ্জকে ব্যাপক সমর্থনের জোগান দেয়, কিন্তু তার ক্ষমতা সর্বোপরি টিকে থাকে কোকা-কোলা এবং অ্যাডিডাসের মতো কয়েকটি বিশাল কর্পোরেশনের সাথে তার সম্পর্কের মাধ্যমে। হ্যাভেলাঞ্জই অ্যাডিডাসকে রাজি করিয়েছিলেন ১৯৮০ সালে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি পদে তার বন্ধু হুয়ান আন্তোনিও সামারাঞ্চের প্রার্থিতার জন্য অর্থায়ন করতে। সামারাঞ্চ, যিনি ফ্রাঙ্কোর স্বৈরশাসনের সময় বিচক্ষণতার সাথে একটি নীল শার্ট পরতেন এবং করজোড়ে অভিবাদন জানাতেন, তিনিই এখন বিশ্ব ক্রীড়াজগতের আরেক রাজা। এই দুজন বিপুল পরিমাণ অর্থ পরিচালনা করেন। ঠিক কত, তা কেউ জানে না। এই বিষয়ে তারা বেশ লাজুক।

বলের মালিকরা

এফ জুরিখে অবস্থিত আইএফএ, লোজান থেকে পরিচালিত আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি এবং লুসার্ন থেকে নির্দেশ প্রদানকারী সংস্থা আইএসএল মার্কেটিং বিশ্বকাপ ও অলিম্পিক পরিচালনা করে। এই তিনটি শক্তিশালী সংস্থাই তাদের প্রধান কার্যালয় সুইজারল্যান্ডে রেখেছে; যে দেশটি উইলিয়াম টেলের নিশানাবাজি, নিখুঁত ঘড়ি এবং ব্যাংক গোপনীয়তার প্রতি ধর্মীয় নিষ্ঠার জন্য বিখ্যাত।

কাকতালীয়ভাবে, তাদের হাতে আসা এবং হাতে থাকা অর্থের ব্যাপারে এই তিনজনই অসাধারণ বিনয় প্রকাশ করেন।

আইএসএল মার্কেটিং এই শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতার জন্য স্টেডিয়ামের বিজ্ঞাপন, চলচ্চিত্র ও ভিডিও, লোগো, ব্যানার এবং মাসকটের একচেটিয়া স্বত্বাধিকারী। এই ব্যবসাটি অ্যাডিডাসের প্রতিষ্ঠাতা অ্যাডলফ ডাসলারের উত্তরাধিকারীদের মালিকানাধীন, যিনি ছিলেন এর প্রতিযোগী পুমা-র প্রতিষ্ঠাতার ভাই এবং শত্রু। যখন হ্যাভেলাঞ্জ এবং সামারাঞ্চ ডাসলার পরিবারকে বিক্রির একচেটিয়া অধিকার প্রস্তাব করেছিলেন, তখন তারা কৃতজ্ঞতাবশতই তা করেছিলেন, যা একটি মহৎ অনুভূতি। বিশ্বের বৃহত্তম ক্রীড়া পোশাক প্রস্তুতকারক অ্যাডিডাস, তাদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা সুসংহত করতে সাহায্য করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উদারতা দেখিয়েছিল। ১৯৯০ সালে ডাসলাররা অ্যাডিডাস ফরাসি ব্যবসায়ী বার্নার্ড তাপিয়ের কাছে বিক্রি করে দিলেও আইএসএল-কে নিজেদের কাছে রেখে দেন, যা পরিবারটি জাপানি বিজ্ঞাপন সংস্থা ডেন্টসু-র সহযোগিতায় পরিচালনা করে।





বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনের উপর নিয়ন্ত্রণ কোনো সামান্য ব্যাপার নয়। ১৯৯৪ সালের শেষে, নিউ ইয়র্কে একটি ব্যবসায়িক সমিতির সামনে বক্তৃতা দেওয়ার সময় হ্যাভেলাঞ্জ কয়েকটি পরিসংখ্যান স্বীকার করেন, যা তিনি সচরাচর করেন না: "আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, ফুটবল প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী মোট ২২৫ বিলিয়ন ডলার আয় করে।" তিনি দম্ভভরে বলেন যে, এই বিপুল পরিমাণ অর্থ বিশ্বের বৃহত্তম বহুজাতিক সংস্থা জেনারেল মোটরসের ১৯৯৩ সালের ১৩৬ বিলিয়ন ডলার বিক্রির তুলনায় অনেক বেশি।

একই বক্তৃতায় হ্যাভেলাঞ্জ সতর্ক করে বলেন, "ফুটবল একটি বাণিজ্যিক পণ্য, যা যথাসম্ভব বিচক্ষণতার সাথে বিক্রি করতে হবে।" এবং তিনি আজকের বিশ্বের প্রজ্ঞার প্রথম নিয়মটি উল্লেখ করেন: "মোড়কের দিকে অনেক মনোযোগ দিতে হবে।"

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার অবিশ্বাস্য সমৃদ্ধ খনিতে টেলিভিশন সম্প্রচার স্বত্ব বিক্রিই হলো সবচেয়ে লাভজনক খাত, এবং এর আয়ের সিংহভাগই ভোগ করে ফিফা ও আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি।
বিশ্বজুড়ে টেলিভিশন যখন থেকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ সরাসরি সম্প্রচার করতে শুরু করেছে, তখন থেকে এই অর্থের পরিমাণ অভাবনীয়ভাবে বহুগুণে বেড়ে গেছে। ১৯৯২ সালের বার্সেলোনা অলিম্পিক টেলিভিশন থেকে ১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিকের চেয়ে ৬৩০ গুণ বেশি আয় করেছিল, যখন এর সম্প্রচার জাতীয় বাজারের বাইরে পৌঁছায়নি।

প্রতিটি টুর্নামেন্টের জন্য বিজ্ঞাপনদাতা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে হ্যাভেলাঞ্জ, সামারাঞ্চ এবং ডাসলার পরিবারের মধ্যে কখনো ঝগড়া হয় না। যে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিটি আবেগকে টাকায় পরিণত করে, সক্রিয় ক্রীড়াপ্রেমীদের জন্য সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর বা দরকারি পণ্যের প্রচার করার বিলাসিতা তাদের নেই। তারা কেবল সর্বোচ্চ দরদাতার সেবায় নিজেদের সঁপে দেয় এবং তারা শুধু জানতে চায় যে মাস্টারকার্ড ভিসার চেয়ে বেশি অর্থ দেবে কি না, এবং ফুজিফিল্ম কোডাকের চেয়ে বেশি অর্থ দেবে কি না। কোকা-কোলা, সেই পুষ্টিকর অমৃত যা ছাড়া কোনো ক্রীড়াবিদের শরীর চলতে পারে না, সবসময় তালিকার শীর্ষে থাকে। এর অগণিত গুণ একে প্রশ্নাতীত করে তুলেছে।

যেহেতু উনিশ শতকের শেষভাগের ফুটবল বিপণন এবং পৃষ্ঠপোষকদের সাথে এতটাই জড়িয়ে আছে, তাই এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে ইউরোপের কয়েকটি বৃহত্তম ক্লাব আসলে কোম্পানি।

অন্যান্য কোম্পানির অন্তর্ভুক্ত। তুরিনের জুভেন্টাস, ফিয়াটের মতোই, আগ্নেলি গ্রুপের অংশ। মিলান বেরলুসকোনি গ্রুপের তিনশটি কোম্পানির সমষ্টির অন্তর্গত। পারমা পারমালাটের অন্তর্গত।

সাম্পদোরিয়া তেল সংস্থা মানতোভানির মালিকানাধীন। ফিওরেন্তিনা চলচ্চিত্র প্রযোজনা সংস্থা সেচ্চি গোরির মালিকানাধীন। বার্নার্ড তাপিয়ের অন্যতম সংস্থা হওয়ার পর অলিম্পিক ডি মার্সেই ইউরোপীয় ফুটবলের অগ্রভাগে চলে আসে, যতক্ষণ না একটি ঘুষ কেলেঙ্কারি তার সফল কর্মজীবন ধ্বংস করে দেয়। প্যারিস সেন্ট-জার্মেইন টেলিভিশন সংস্থা ক্যানাল প্লাসের মালিকানাধীন। সোশোর স্পনসর, পিউজো, ক্লাব স্টেডিয়ামেরও মালিক। ফিলিপস আইন্দহোভেনের ডাচ ক্লাব পিএসভি-র মালিক। বায়ার হলো সেই দুটি জার্মান প্রথম-বিভাগের ক্লাবের নাম, যেগুলোতে সংস্থাটি অর্থায়ন করে: বায়ার লেভারকুসেন এবং বায়ার উয়েরডিঙ্গেন। আমস্ট্রাড কম্পিউটারের উদ্ভাবক ও মালিক ব্রিটিশ ক্লাব টটেনহ্যাম হটস্পারেরও স্বত্বাধিকারী, যার শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন হয়।

ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স ওয়াকারস্টিলের কর্ণধার জ্যাক ওয়াকারের মালিকানাধীন।



জাপানে, যেখানে পেশাদার ফুটবল এখনও নতুন, সেখানকার বৃহত্তম কোম্পানিগুলো নিজেদের দল গঠন করেছে এবং বিদেশি তারকাদের নিয়োগ দিয়েছে। তারা এই নিরাপদ বাজি ধরেছে যে, বিশ্বজুড়ে তাদের ব্যবসার বিজ্ঞাপনের জন্য ফুটবল একটি সর্বজনীন ভাষা। ফুরুকাওয়া ইলেকট্রিক কোম্পানি ‘জেফ ইউনাইটেড ইচিহারা’ নামে একটি ক্লাব শুরু করে এবং জার্মান সুপারস্টার পিয়ের লিটবারস্কি ও চেক খেলোয়াড় ফ্রান্টিশেক ও পাভেলকে নিয়োগ দেয়। টয়োটা ‘ক্লাব গ্রাম্পাস’ গঠন করে এবং ইংলিশ স্ট্রাইকার গ্যারি লিনেকারকে চুক্তিবদ্ধ করে। অভিজ্ঞ কিন্তু চির-উজ্জ্বল জিকো কাশিমা ক্লাবের হয়ে খেলেছেন, যা সুমিতোমো শিল্প-আর্থিক সমষ্টির মালিকানাধীন। মাজদা, মিতসুবিশি, নিসান, প্যানাসনিক এবং জাপান এয়ারলাইন্সেরও ফুটবল দল রয়েছে।



দলগুলো লোকসান করতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ তারা তাদের কর্পোরেট মালিকদের জন্য একটি ভালো ভাবমূর্তি তুলে ধরতে পারে, ততক্ষণ তাতে কিছু যায় আসে না। এ কারণেই তাদের মালিকানা কোনো গোপন বিষয় নয়: ফুটবল কোম্পানিগুলোর বিজ্ঞাপনে সাহায্য করে এবং সারা বিশ্বে এর চেয়ে বড় জনসংযোগের মাধ্যম আর নেই। যখন সিলভিও বেরলুসকোনি দেউলিয়া হয়ে যাওয়া মিলানকে কিনে নেন, তখন তিনি একটি বড় বিজ্ঞাপন প্রচারণার সমস্ত আয়োজনের মধ্য দিয়ে ক্লাবটির জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। ১৯৮৭ সালের সেই বিকেলে, মিলানের এগারোজন খেলোয়াড় মাঠের মাঝখানে উড়তে থাকা একটি হেলিকপ্টার থেকে ধীরে ধীরে নেমে আসছিলেন, আর সেই সময়ে লাউডস্পিকারে বেজে উঠছিল ভাগনারের "রাইড অফ দ্য ভালকিরিস"। বার্নার্ড তাপি, যিনি নিজেও নায়ক সেজে থাকতে ভালোবাসতেন, তিনি অলিম্পিকের জয়গুলো আতশবাজি ও লেজার রশ্মিতে ঝলমলে বিশাল পার্টির মাধ্যমে উদযাপন করতে পছন্দ করতেন, যেখানে শীর্ষস্থানীয় রক ব্যান্ডগুলো গান পরিবেশন করত।

ফুটবল, যা এত আবেগের উৎস, তা খ্যাতি ও ক্ষমতাও তৈরি করে।
যে দলগুলো কিছুটা স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে, কারণ তারা সরাসরি অন্য কোম্পানির উপর নির্ভরশীল নয়, সেগুলো প্রায়শই অসাধু ব্যবসায়ী বা দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজনীতিবিদদের দ্বারা পরিচালিত হয়, যারা খেলাটিকে একটি মর্যাদাপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করে নিজেদেরকে রাতারাতি জনসমক্ষে নিয়ে আসে। এমন বিরল ঘটনাও আছে যেখানে ঠিক এর বিপরীতটাই ঘটে: এমন কিছু মানুষ যারা তাদের কষ্টার্জিত খ্যাতিকে ফুটবলের সেবায় নিয়োজিত করেছেন, যেমন ইংরেজ গায়ক এলটন জন, যিনি তার ভালোবাসার দল ওয়াটফোর্ডের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, অথবা চলচ্চিত্র পরিচালক ফ্রান্সিসকো লোম্বার্ডি, যিনি পেরুর স্পোর্টিং ক্রিস্টাল পরিচালনা করেন।

পেশাদার ক্রীড়া জগতের তীব্র প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে যেমনটা হয়ে থাকে, ১৯৯৫ সালে এই বইটি প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে বেশ কয়েকটি দলের মালিকানা বদল হয়েছে এবং কিছু কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে গেছে। পারমা, সাম্পডোরিয়া, ফিওরেন্টিনা, প্যারিস সেন্ট-জার্মেইন, উয়েরডিঙ্গেন এবং টটেনহ্যাম—এই সবগুলোর মালিকানা এখন অন্য দলের।

বিভিন্ন বৃহৎ কর্পোরেট সংস্থার দ্বারা। এবং ২০০১ সালে কোনো পূর্বসতর্কতা ছাড়াই আইএসএল মার্কেটিং ধসে পড়ে, যে মুহূর্তে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি বুঝতে পারে যে তারা নিজেরাই খুব ভালোভাবে টিভি স্বত্ব বিক্রি করতে পারে, ধন্যবাদ। কিন্তু গল্পের সারমর্ম অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে: যে বলটি বিশ্বকে মুগ্ধ করে, তার মালিকানা মুষ্টিমেয় কয়েকটি হাতের হাতেই রয়েছে।

যিশু

আমি ১৯৬৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে স্পেনের গুয়াদারামা পর্বতমালায় বিবাহ, দীক্ষাস্নান এবং সম্মেলনের জন্য একটি বিশাল হল খোলা হয়। জমকালো উদ্বোধনী ভোজ যখন পুরোদমে চলছিল, তখন মেঝে ধসে পড়ে, ছাদ ভেঙে যায় এবং অতিথিরা ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েন। এতে বায়ান্ন জন মারা যান। হলটি সরকারি অর্থে নির্মিত হয়েছিল, কিন্তু এর জন্য যথাযথ অনুমোদন, নির্মাণ অনুমতিপত্র বা কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থপতি ছিল না।

সেই ক্ষণস্থায়ী স্থাপত্যের মালিক ও নির্মাতা, জেসুস গিল ই গিল, কারাগারে গেলেন। প্রতিটি মৃত্যুর জন্য তাঁর দুই বছর, তিন মাস এবং দুই সপ্তাহের কারাদণ্ড হয়েছিল, কিন্তু অবশেষে জেনারেলিসিমো ফ্রাঙ্কো তাঁকে ক্ষমা করে দেন। কারাগার থেকে বেরিয়েই জেসুস নির্মাণ শিল্পে আবারও দেশের উন্নয়নে কাজ করতে ফিরে আসেন।

কিছুদিন পর, এই ব্যবসায়ী অ্যাটলেটিকো অফ মাদ্রিদ নামে একটি ফুটবল দলের মালিক হন। ফুটবলের কল্যাণে, যা তাকে একজন জনপ্রিয় টেলিভিশন ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিল, এই জেসুস একটি রাজনৈতিক জীবন শুরু করতে সক্ষম হন। ১৯৯১ সালে তিনি দেশের অন্য সবার চেয়ে বেশি ভোট পেয়ে মারবেয়ার মেয়র নির্বাচিত হন। তার নির্বাচনী প্রচারণার সময় তিনি এই পর্যটন শহরের রাস্তা থেকে পকেটমার, মাতাল এবং মাদকাসক্তদের নির্মূল করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যে শহরটি আরব শেখ এবং অস্ত্র চোরাচালান ও মাদক পাচারে বিশেষজ্ঞ বিদেশী গ্যাংস্টারদের বিনোদনের জন্য সংরক্ষিত ছিল।

আতলেতিকো অফ মাদ্রিদই তার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির ভিত্তি হয়ে আছে, যদিও দলটি প্রায়শই হেরে যায়। ম্যানেজাররা কয়েক সপ্তাহের বেশি টিকতে পারেন না। জেসুস গিল ই গিল তার ঘোড়া ইম্পেরিওসোর কাছে পরামর্শ চান, যেটি একটি ধবধবে সাদা ও অত্যন্ত ভাবপ্রবণ অশ্ব: “ইম্পেরিওসো, আমরা হেরে গেছি।”

আমি জানি, গিল।
দোষটা কার?
আমি জানি না, গিল।
হ্যাঁ, আপনিই ঠিক, ইম্পেরিওসো। এটা ম্যানেজারের দোষ।
সুতরাং, তাকে বরখাস্ত করুন।



১৯৭৮ সালের বিশ্বকাপ

জার্মানিতে জনপ্রিয় ভক্সওয়াগেন বিটল গাড়িটির জনপ্রিয়তা কমে যাচ্ছিল, ইংল্যান্ডে আমি প্রথম টেস্ট টিউব শিশুর জন্ম হচ্ছিল, ইতালিতে গর্ভপাত করা হচ্ছিল

বৈধতা দেওয়া হয়েছিল। এইডসের প্রথম শিকাররা, যে রোগটির তখনও এই নাম দেওয়া হয়নি, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছিল। রেড ব্রিগেড আলদো মোরোকে হত্যা করছিল, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শতাব্দীর শুরুতে চুরি করা খালটি পানামাকে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিল। মায়ামির নির্ভরযোগ্য সূত্রগুলো ফিদেল কাস্ত্রোর আসন্ন পতনের ঘোষণা দিচ্ছিল, যা ছিল মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার। নিকারাগুয়ায় সোমোজা রাজবংশ টলমল করছিল, যেমনটা ইরানে শাহের রাজবংশের ক্ষেত্রেও হয়েছিল। গুয়াতেমালার সেনাবাহিনী পানজোস শহরে একদল কৃষকের ওপর মেশিনগান চালাচ্ছিল। দোমিতিলা বারিওস এবং টিন-খনির শ্রমিকদের সম্প্রদায়ের আরও চারজন মহিলা বলিভিয়ার সামরিক একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে অনশন ধর্মঘট শুরু করেছিলেন, এবং শীঘ্রই পুরো বলিভিয়া অনশনে নেমে পড়বে: একনায়কতন্ত্রের পতন হচ্ছিল। এর বিপরীতে, আর্জেন্টিনার সামরিক একনায়কতন্ত্র বেশ ভালো অবস্থায় ছিল এবং তা প্রমাণ করতে একাদশ বিশ্বকাপের আয়োজক ছিল।



দশটি ইউরোপীয় দেশ, আমেরিকার চারটি দেশ, সাথে ইরান ও তিউনিসিয়া অংশ নিয়েছিল। পোপ রোম থেকে তাঁর আশীর্বাদ পাঠিয়েছিলেন। বুয়েনস আইরেসের মনুমেন্টাল স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একটি সামরিক কুচকাওয়াজের সুরের মধ্যে জেনারেল ভিদেলা হ্যাভেলাঞ্জের বুকে একটি পদক পরিয়ে দেন। কয়েক পা দূরেই, নৌবাহিনীর মেকানিক্স স্কুলে অবস্থিত আর্জেন্টিনার আউশভিৎস নামক নির্যাতন ও নির্মূল শিবিরটি পুরোদমে চলছিল। তারও কয়েক মাইল দূরে, বন্দীদের বিমান থেকে জীবন্ত সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হচ্ছিল।

“অবশেষে বিশ্ব আর্জেন্টিনার আসল চেহারা দেখতে পেল,” টিভি ক্যামেরার সামনে দম্ভভরে বললেন ফিফার সভাপতি। বিশেষ অতিথি হেনরি কিসিঞ্জার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, “সর্বতোভাবে এই দেশটির এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে।” এবং জার্মান দলের অধিনায়ক বের্তি ভোগটস, যিনি প্রথম কিক-অফ করেছিলেন, কয়েকদিন পর ঘোষণা করেন, “আর্জেন্টিনা এমন একটি দেশ যেখানে শৃঙ্খলা বিরাজ করে। আমি একজনও রাজনৈতিক বন্দী দেখিনি।”

স্বাগতিক দল কয়েকটি ম্যাচ জিতলেও ইতালির কাছে হেরে যায় এবং ব্রাজিলের সাথে ড্র করে। নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ফাইনালে পৌঁছাতে হলে পেরুকে গোলের বন্যায় ভাসিয়ে দিতে হতো। আর্জেন্টিনা প্রয়োজনের চেয়ে বেশিই পেয়েছিল, কিন্তু ৬-০ গোলের সেই ভয়াবহ পরাজয় সংশয়ী এবং উদারমনা উভয় ধরনের সমর্থকদের মনেই সন্দেহের বীজ বপন করে। লিমায় ফেরার পর পেরুভিয়ানদের ওপর পাথর ছোড়া হয়।

আর্জেন্টিনা ও নেদারল্যান্ডসের মধ্যকার ফাইনালটি অতিরিক্ত সময়ে নির্ধারিত হয়েছিল। আর্জেন্টাইনরা ৩-১ গোলে জিতেছিল এবং এক অর্থে তাদের এই জয়ের পেছনে ছিল সেই পোস্টটির দেশপ্রেম, যা ইনজুরি টাইমে আর্জেন্টিনার জাল বাঁচিয়েছিল। রেনসেনব্রিঙ্কের একটি জোরালো শট আটকে দেওয়া সেই পোস্টটিকে শুধুমাত্র মানুষের অকৃতজ্ঞতার কারণেই কখনো সামরিক সম্মাননা দেওয়া হয়নি। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, পোস্টটির চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল মারিও কেম্পেসের গোলগুলো; সে ছিল এক অদম্য বুনো ঘোড়া, যে কনফেটির তুষারাবরণে ঢাকা ঘাসের ওপর দিয়ে ছুটে যেতে ভালোবাসত, আর তার এলোমেলো কেশর বাতাসে উড়ত।

ট্রফি বিতরণের সময় ডাচ খেলোয়াড়রা আর্জেন্টিনার স্বৈরাচারী শাসকদের অভিবাদন জানাতে অস্বীকৃতি জানায়। তৃতীয় স্থান পায় ব্রাজিল, চতুর্থ ইতালি।

কেম্পেস কাপের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন এবং ছয় গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতাও হন। তাঁর পিছনে পাঁচটি করে গোল নিয়ে ছিলেন পেরুর কুবিয়াস এবং নেদারল্যান্ডসের রেনসেনব্রিঙ্ক।



সুখ

এফ সারা বিশ্ব থেকে পাঁচ হাজার সাংবাদিক, এক জমকালো মিডিয়া কেন্দ্র, ত্রুটিহীন স্টেডিয়াম, ঝকঝকে নতুন বিমানবন্দর: আর্জেন্টিনা ছিল একটি দক্ষতার মডেল। প্রবীণ জার্মান সাংবাদিকরা স্বীকার করেছেন যে '৭৮ সালের বিশ্বকাপ তাদের বার্লিনে অনুষ্ঠিত '৩৬ সালের অলিম্পিকের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল, যখন হিটলার কোনো কিছুই বাকি রাখেননি।

এর খরচ ছিল রাষ্ট্রীয় গোপনীয় বিষয়। কোটি কোটি ডলার ব্যয় ও অপচয় হয়েছিল—ঠিক কত, তা কখনোই জানা যায়নি—যাতে সামরিক তত্ত্বাবধানে থাকা একটি সুখী দেশের হাসি পৃথিবীর চার কোণে প্রচারিত হয়।

এদিকে, বিশ্বকাপের আয়োজক শীর্ষ কর্মকর্তারা যুদ্ধের কারণে অথবা নিছক নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাদের নির্মূল পরিকল্পনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের ভাষায়, “চূড়ান্ত সমাধান” হাজার হাজার আর্জেন্টাইনকে নিঃশব্দে হত্যা করেছিল—কতজন, তা কখনোই জানা যায়নি। যে-ই তা জানার চেষ্টা করত, তাকেই মাটি গিলে ফেলত। কৌতূহল, ভিন্নমত বা যেকোনো প্রশ্নের মতোই, রাষ্ট্রদ্রোহিতার অকাট্য প্রমাণ ছিল। আর্জেন্টাইন গ্রামীণ সমিতির সভাপতি, সেলেডনিও পেরেদা, ঘোষণা করেন যে ফুটবলের কল্যাণে, “কিছু সুপরিচিত আর্জেন্টাইন তাদের ডাকাতি ও অপহরণের অর্থ দিয়ে পশ্চিমা গণমাধ্যমের মাধ্যমে যে অপবাদ ছড়িয়েছে, তা আর হবে না।” খেলোয়াড়দের সমালোচনা করা যেত না, এমনকি ম্যানেজারেরও নয়।

চ্যাম্পিয়নশিপে আর্জেন্টাইন দলটি কয়েকবার হোঁচট খেলেও, স্থানীয় ধারাভাষ্যকাররা হাততালি দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারেননি।

আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি পরিবর্তনের জন্য স্বৈরাচারী সরকার একটি আমেরিকান জনসংযোগ সংস্থাকে পাঁচ লক্ষ ডলার প্রদান করে। বিশেষজ্ঞদের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়...

বার্সন-মার্সটেলারের বইটির শিরোনাম ছিল, 'পণ্যের ক্ষেত্রে যা সত্য, তা দেশগুলোর ক্ষেত্রেও সত্য।' বিশ্বকাপের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব অ্যাডমিরাল কার্লোস আলবার্তো লাকোস্ত এক সাক্ষাৎকারে ব্যাখ্যা করেছিলেন: "আমি যদি ইউরোপ বা যুক্তরাষ্ট্রে যাই, কোন জিনিসটি আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করবে? উঁচু দালান, বিশাল বিমানবন্দর, চমৎকার গাড়ি, দামি ক্যান্ডি।" ডলার উবে যাওয়া এবং হঠাৎ করে বিপুল সম্পদ তৈরি করার দক্ষতায় পারদর্শী এই অ্যাডমিরাল, পূর্ববর্তী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রহস্যজনকভাবে নিহত হওয়ার পর . . .

বিশ্বকাপের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। লাকোস্ত কোনো রকম তদারকি ছাড়াই বিপুল পরিমাণ অর্থ পরিচালনা করতেন, এবং যেহেতু তিনি খুব একটা মনোযোগ দিতেন না, মনে হয় তিনি কিছু খুচরা টাকা নিজের কাছেই রেখে দিতেন। এমনকি স্বৈরাচারী সরকারের নিজস্ব অর্থমন্ত্রী, হুয়ান আলেমানও, সরকারি তহবিলের এই অপচয় লক্ষ্য করেন এবং কিছু অস্বস্তিকর প্রশ্ন করেন। অ্যাডমিরালের সতর্ক করার একটি অভ্যাস ছিল: "পরে যদি কেউ বোমা পেতে রাখে, তাহলে অভিযোগ করবেন না।"

ঠিক সেই মুহূর্তে আলেমানের বাড়িতে একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়েছিল যখন পেরুর বিপক্ষে নিজেদের চতুর্থ গোলটি উদযাপন করছিল আর্জেন্টাইনরা।

কাপ শেষ হওয়ার পর, তার কঠোর পরিশ্রমের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ, অ্যাডমিরাল ল্যাকোস্ট ফিফার সহ-সভাপতি হিসেবে মনোনীত হয়েছিলেন।



জেমিলের গোল

ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৭৮ সালের বিশ্বকাপে। নেদারল্যান্ডস, যারা করছিল
আমি আচ্ছা, স্কটল্যান্ডের সাথে খেলছিলাম, যারা খারাপ খেলছিল। স্কটিশ খেলোয়াড়
আর্চিবাল্ড জেমিল তার স্বদেশী হার্টফোর্ডের কাছ থেকে বলটি পেয়েছিলেন এবং
একক ব্যাগপাইপ বাদকের সুরে নাচতে ডাচদের বিনীতভাবে অনুরোধ করা হলো।
জেমিলের পায়ের কাছে পড়ে গেলেন ওয়াইল্ডশুট, তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল।
এরপর জেমিল সুরবিয়ারকে পেছনে ফেলে দিলেন। ক্রলের অবস্থা আরও খারাপ ছিল: জেমিল বলটি তার দুই পায়ের মাঝখান দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। আর যখন গোলরক্ষক ইয়ংব্লোয়েড তার দিকে এগিয়ে এলেন, স্কটিশ খেলোয়াড়টি তার মাথার ওপর দিয়ে বলটি লব করে দিলেন।

বেত্তেগার গোল

'৭৮ সালের বিশ্বকাপেও এমনটা ঘটেছিল। ইতালি স্বাগতিক দলকে ১-০ গোলে পরাজিত করেছিল। আমি ০.

যে আক্রমণটি ইতালির গোলটি তৈরি করেছিল, তা খেলার মাঠে একটি নিখুঁত ত্রিভুজ এঁকে দিয়েছিল; তার ভেতরে আর্জেন্টিনার ডিফেন্ডাররা যেন গোলপোস্টের গোলপোস্টে অন্ধদের মতো দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। আন্তোনিওনি বলটি বেত্তেগার দিকে ঠেলে দেন, যিনি সেটি সজোরে রসির দিকে ঠেলে দেন, যার পিঠ তার দিকে ছিল। রসি ব্যাকহিল করে বলটি ফিরিয়ে দেন, আর ঠিক তখনই বেত্তেগা বক্সের ভেতরে ঢুকে পড়েন। এরপর বেত্তেগা দুজন খেলোয়াড়কে পরাস্ত করে দুর্দান্ত এক বাঁ-বলের শটে গোলরক্ষক ফিলোলকে পরাস্ত করেন।

যদিও তখন কেউ জানত না, ইতালীয় দলটি ইতিমধ্যেই চার বছর পরে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপ জেতার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিল।

সান্ডারল্যান্ডের গোল

সালটা ১৯৭৯। ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে, আর্সেনাল এবং ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। আমি ইংলিশ এফএ কাপের ফাইনালে লড়ছিল।

একটি ভালো ম্যাচ ছিল, কিন্তু এমন কোনো সন্দেহ জাগেনি যে এটি মুহূর্তের মধ্যে ১৮৭১ সালের পর কাপের দীর্ঘ ইতিহাসে সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ফাইনালে পরিণত হবে।
আর্সেনাল ২-০ গোলে এগিয়ে ছিল এবং সময় ফুরিয়ে আসছিল। ম্যাচের ফলাফল প্রায় নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল এবং দর্শকরা স্টেডিয়াম ছাড়তে শুরু করেছিল। হঠাৎ করেই গোলের বন্যা বয়ে গেল, দুই মিনিটে তিনটি গোল: ম্যাককুইনের একটি নিশ্চিত শটের পর ম্যাকিলরয়ের চমৎকার আক্রমণ, যিনি দুজন ডিফেন্ডার ও গোলরক্ষককে কাটিয়ে ৮৬তম ও ৮৭তম মিনিটে ম্যানচেস্টারকে সমতায় ফেরান।

এবং ৮৮ মিনিট শেষ হওয়ার আগেই আর্সেনাল আবার এগিয়ে যায়। লিয়াম ব্র্যাডি, যিনি বরাবরের মতোই ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় ছিলেন, খেলার শেষ মুহূর্তের পরিকল্পনাটি সাজিয়ে দেন এবং অ্যালান সান্ডারল্যান্ড একটি নিখুঁত শটে গোল করে ব্যবধান ৩-২ করেন।





১৯৮২ সালের বিশ্বকাপ

এম শিল্প ও বিশ্বাসঘাতকতার উপর একটি মাস্টারপিস, ইস্তভান সাজাবোর এফিসটো ছিল হলিউডে অস্কার জেতা, আর জার্মানিতে জীবন...
যন্ত্রণাক্লিষ্ট ও প্রতিভাবান চলচ্চিত্র পরিচালক ফাসবিন্ডার অকালে ঝরে পড়ছিলেন। রোমি স্নাইডার আত্মহত্যা করছিলেন এবং সোফিয়া লরেন কর ফাঁকির দায়ে কারারুদ্ধ হচ্ছিলেন। পোল্যান্ডে শ্রমিক নেতা লেক ওয়ালেসা কারার পথে ছিলেন।

গার্সিয়া মার্কেজ লাতিন আমেরিকার কবি, ভিক্ষুক, সঙ্গীতজ্ঞ, নবী, যোদ্ধা এবং দুষ্কৃতকারীদের নামে নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করছিলেন। এল সালভাদরের একটি গ্রামে সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণে সাত শতাধিক কৃষক নিহত হচ্ছিল, যাদের অর্ধেকই ছিল শিশু। আদিবাসীদের গণহত্যা আরও প্রসারিত করার জন্য গুয়াতেমালায় জেনারেল রিওস মন্ট বলপূর্বক ক্ষমতা দখল করছিলেন, এই ঘোষণা দিয়ে যে ঈশ্বর তাকে দেশের শাসনভার দিয়েছেন এবং পবিত্র আত্মা তার গুপ্তচর সংস্থাকে পরিচালনা করবেন।



মিশর ছয় দিনের যুদ্ধ থেকে ইসরায়েলের দখলে থাকা সিনাই উপদ্বীপ পুনরুদ্ধার করছিল। প্রথম কৃত্রিম হৃৎপিণ্ডটি কারও বুকে স্পন্দিত হচ্ছিল।

মিয়ামির নির্ভরযোগ্য সূত্রগুলো ফিদেল কাস্ত্রোর আসন্ন পতনের ঘোষণা দিচ্ছিল, আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি ছিল। ইতালিতে পোপ দ্বিতীয় একটি গুপ্তহত্যার প্রচেষ্টা থেকে বেঁচে যাচ্ছিলেন। স্পেনে কংগ্রেসের ওপর হামলা সংগঠিতকারী কর্মকর্তাদের ত্রিশ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হচ্ছিল এবং ফেলিপে গঞ্জালেস রাষ্ট্রপতি পদের জন্য তাঁর নির্ভুল দৌড় শুরু করছিলেন, আর এদিকে বার্সেলোনায় দ্বাদশ বিশ্বকাপ শুরু হতে যাচ্ছিল।

চব্বিশটি দেশ অংশ নিয়েছিল, যা আগের কাপের চেয়ে আটটি বেশি, কিন্তু আমেরিকা অঞ্চল তাদের কোটা বাড়াতে পারেনি: ইউরোপ থেকে চৌদ্দটি, আমেরিকা থেকে ছয়টি এবং আফ্রিকা থেকে দুটি দল ছিল, সাথে ছিল কুয়েত ও নিউজিল্যান্ড।

বার্সেলোনায় প্রথম দিনেই বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা পরাজিত হলো। কয়েক ঘণ্টা পর, সেখান থেকে বহু দূরে, ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জে, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আর্জেন্টিনার সেনাপতিরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলেন। এই দুর্ধর্ষ যোদ্ধারা, যারা কয়েক বছরের স্বৈরশাসনের অধীনে নিজেদের দেশবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল, তারা ব্রিটিশদের কাছে মেষশাবকের মতো আত্মসমর্পণ করল। সেই দৃশ্য টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হলো: নৌবাহিনীর কর্মকর্তা আলফ্রেডো অ্যাস্টিজ, যিনি প্রতিটি মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী ছিলেন, মাথা নিচু করে সেই অপমানজনক আত্মসমর্পণপত্রে স্বাক্ষর করলেন।

পরবর্তী দিনগুলোতে টিভিতে '৮২ কাপের নানা দৃশ্য দেখানো হয়েছিল: শেখ ফাহাদ আল-আহমেদ আল-জাবের আল-সাবাহ-এর উড়ন্ত টিউনিক, যিনি কুয়েতের বিপক্ষে ফ্রান্সের একটি গোলের প্রতিবাদে মাঠে ছুটে এসেছিলেন; ইংরেজ ব্রায়ান রবসন-এর আধা মিনিটের মধ্যে করা গোল, যা বিশ্বকাপের ইতিহাসে দ্রুততম; এবং জার্মান গোলরক্ষক শুমাখারের উদাসীনতা, যিনি একসময় কামার ছিলেন, যখন তিনি হাঁটু দিয়ে ফরাসি স্ট্রাইকার বাতিস্তনকে আঘাত করে মাঠ থেকে বের করে দেন।

টুর্নামেন্টে ইউরোপ শীর্ষস্থানগুলো দখল করলেও, জিকো, ফালকাও এবং সোক্রেটিসের পায়ে ভর করে ব্রাজিল সেরা ফুটবল খেলেছিল। ভাগ্য ব্রাজিলিয়ানদের সাথে ছিল না, কিন্তু তারা দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল এবং জিকো, যিনি সবেমাত্র দক্ষিণ আমেরিকার সেরা খেলোয়াড়ের খেতাব জিতেছিলেন, গ্যালারিতে থাকা 'জিকোম্যানিয়া'কে আরও একবার যথার্থ প্রমাণ করেছিলেন।

কাপটি ইতালির ঝুলিতে গেল। ইতালীয় দলটি শুরুটা খারাপ করেছিল, একের পর এক ড্র-তে হোঁচট খাচ্ছিল, কিন্তু অবশেষে তাদের সার্বিক সংহতি এবং পাওলো রসির সময়োচিত মেশিনগানের মতো গোলের নৈপুণ্যে তারা ঘুরে দাঁড়ায়। ফাইনালে জার্মানির বিপক্ষে ইতালি ৩-১ গোলে জয়লাভ করে।

বোনিয়েকের চমৎকার সঙ্গীতের দ্বারা পরিচালিত হয়ে পোল্যান্ড তৃতীয় স্থান অধিকার করে। চতুর্থ স্থানটি পায় ফ্রান্স, যা ইউরোপীয় কার্যকারিতা এবং আফ্রিকান প্রভাবের জন্য আরও ভালো ফলাফলের যোগ্য ছিল।

এর স্মরণীয় মাঝমাঠের আনন্দ।

ইতালীয় রসি ছয় গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় শীর্ষে ছিলেন, এরপর ছিলেন জার্মান রুমেনিগে, যিনি পাঁচটি গোল করে দলকে উজ্জীবিত করেছিলেন।

এলম গাছ থেকে নাশপাতি

একটি লেন জিরেস, প্লাতিনি, টিগানা এবং চেঙ্গিনির সাথে মিলে গঠন করেছিলেন '৮২ বিশ্বকাপের এবং পুরো বিশ্বকাপের সবচেয়ে দর্শনীয় মিডফিল্ড। ফরাসি ফুটবলের ইতিহাস। জিরেস এতটাই ছোট ছিলেন যে টিভি পর্দায় তাকে সবসময় অনেক দূরে বলে মনে হতো।

হাঙ্গেরীয় পুসকাস জার্মান সিলার-এর মতো খাটো ও মোটা ছিলেন। ডাচম্যান ক্রুইফ এবং ইতালীয় জিয়ান্নি রিভেরা ছিলেন শীর্ণকায়। পেলে এবং আর্জেন্টিনার নির্ভরযোগ্য সেন্টার হাফ নেস্তর রসির পায়ের পাতা ছিল চ্যাপ্টা। ব্রাজিলীয় রিভেলিনো কুপার টেস্টে সবচেয়ে কম স্কোর করেছিলেন, কিন্তু মাঠে কেউ তাকে ধরতে পারত না। তার স্বদেশী সক্রেটিসের শরীর ছিল বকের মতো, লম্বা অস্থিময় পা এবং ছোট ছোট পায়ের পাতা যা সহজেই ক্লান্ত হয়ে যেত, কিন্তু তিনি ব্যাকহিলে এতটাই দক্ষ ছিলেন যে তিনি পেনাল্টি কিকের জন্যও এটি ব্যবহার করতেন।

যারা মনে করেন যে শারীরিক আকার এবং গতি বা শক্তির পরীক্ষার সাথে একজন ফুটবল খেলোয়াড়ের দক্ষতার কোনো সম্পর্ক আছে, তারা মারাত্মক ভুল করেন। ঠিক ততটাই ভুল, যতটা ভুল করেন তারা যারা বিশ্বাস করেন যে আইকিউ পরীক্ষার সাথে প্রতিভার কোনো সম্পর্ক আছে, অথবা লিঙ্গের আকারের সাথে যৌন আনন্দের কোনো যোগসূত্র রয়েছে। ভালো ফুটবল খেলোয়াড়দের মাইকেলেঞ্জেলোর গড়া টাইটান হওয়ার প্রয়োজন নেই। ফুটবলে, শারীরিক গঠনের চেয়ে সামর্থ্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এবং অনেক ক্ষেত্রে দক্ষতা হলো সীমাবদ্ধতাকে গুণে রূপান্তরিত করার শিল্প।



কলম্বিয়ান কার্লোস ভালদেরামার পা বাঁকা, এবং এই বক্রতা তাকে বল লুকাতে সাহায্য করে। গারিঞ্চার বাঁকা পায়ের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।
বলটা কোথায়? ওর কানে? জুতোর ভেতরে? গেল কোথায়? উরুগুয়ের ‘কোকোচো’ আলভারেজ, যিনি খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন, তাঁর এক পা অন্য পায়ের দিকে ঘোরানো ছিল, এবং তিনি ছিলেন সেই অল্প কয়েকজন ডিফেন্ডারের একজন যিনি পেলেকে ঘুষি বা লাথি না মেরেই থামাতে পারতেন।

রোমারিও এবং ম্যারাডোনা নামের দুজন খাটো ও গোলগাল খেলোয়াড় '৯৪ বিশ্বকাপের তারকা ছিলেন। এবং রুবেন সোসা ও কার্লোস আগুইলেরা নামের দুজন উরুগুয়ের স্ট্রাইকার, যারা পরে ইতালিতে তারকা হয়েছিলেন, তাদেরও শারীরিক গঠন একই রকম। তাদের ক্ষুদ্রাকৃতির কারণে ব্রাজিলিয়ান লিওনিদাস, ইংরেজ কেভিন কিগান, আইরিশ জর্জ বেস্ট এবং ডেনমার্কের অ্যালান সিমনসেন, যিনি “দ্য ফ্লি” নামে পরিচিত ছিলেন, সকলেই দুর্ভেদ্য রক্ষণ ভেদ করে সহজেই বিশালদেহী ফুলব্যাকদের পাশ কাটিয়ে যেতে পারতেন, যারা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে আঘাত করেও আটকাতে পারত না। একইভাবে ক্ষুদ্র কিন্তু সুবর্মধারী ছিলেন ফেলিক্স লুস্তো, রিভার প্লেটের “মেশিন”-এর লেফট উইঙ্গার। তাকে “দ্য ভেন্টিলেটর” বলা হতো কারণ তিনিই প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়দের তার পেছনে দৌড় করিয়ে দলের বাকিদের দম ফেলার সুযোগ করে দিতেন। লিলিপুটিয়ানরা না পড়েই গতি পরিবর্তন করতে এবং প্রচণ্ড বেগে গতি বাড়াতে পারে, কারণ তারা আকাশচুম্বী অট্টালিকার মতো গড়নের নয়।





প্লাটিনি

এম মিশেল প্লাতিনিরও ক্রীড়াবিদের মতো শারীরিক গঠন ছিল না। ১৯৭২ সালে ক্লাব মেটজের ডাক্তার প্লাতিনিকে বলেছিলেন যে তিনি "দুর্বল হৃদপিণ্ডে" ভুগছেন। এবং দুর্বল শ্বাসপ্রশ্বাস ক্ষমতা।" এই রিপোর্টটিই মেটজের জন্য এই উঠতি খেলোয়াড়কে প্রত্যাখ্যান করার জন্য যথেষ্ট ছিল, যদিও ডাক্তার খেয়াল করেননি যে প্লাতিনির গোড়ালি শক্ত ও সহজে ভেঙে যেত এবং পাস্তার প্রতি তার ভালোবাসার কারণে তার ওজন বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা ছিল। যাই হোক, দশ বছর পর, স্পেনে বিশ্বকাপের ঠিক আগে, এই ত্রুটিপূর্ণ প্রত্যাখ্যাত খেলোয়াড়টি তার প্রতিশোধ নিয়েছিল: তার দল, সেন্ট এতিয়েন, মেটজকে ৯-২ গোলে হারিয়েছিল।

প্লাতিনি ছিলেন ফরাসি ফুটবলের সেরা দিকগুলোর এক সমন্বিত রূপ: তাঁর ছিল জাস্টো ফনতেইনের মতো নিখুঁত লক্ষ্যভেদ করার ক্ষমতা, যিনি '৫৮ বিশ্বকাপে তেরোটি গোল করে এক অপরাজেয় রেকর্ড গড়েন; সাথে ছিল রেমন্ড কোপার মতো গতি ও বুদ্ধিমত্তা। প্রতিটি ম্যাচে প্লাতিনি শুধু অবিশ্বাস্য সব গোলের জাদুই দেখাতেন না, দলের খেলা যেভাবে সাজাতেন, তা দিয়ে দর্শকদেরও মাতিয়ে তুলতেন। তাঁর নেতৃত্বে ফরাসি দল এক সুরেলা ফুটবল খেলত, যা প্রতিটি খেলার স্বাভাবিক বিকাশের সাথে সাথে ধাপে ধাপে গড়ে উঠত এবং উপভোগ করা যেত: যা ছিল বক্সে সেন্টার থেকে বল পাঠানো, সর্বাত্মক আক্রমণ বা 'ঈশ্বর রক্ষা করুন' ধরনের খেলার ঠিক বিপরীত।

'৮২ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ফ্রান্স পেনাল্টি শুটআউটে জার্মানির কাছে হেরে যায়। সেই লড়াইটি ছিল প্লাতিনি এবং রুমেনিগের মধ্যে; রুমেনিগে আহত থাকা সত্ত্বেও খেলার মাঠে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং ম্যাচটি জিতে নেন।

এরপর ফাইনালে জার্মানি ইতালির কাছে হেরে যায়। ফুটবল ইতিহাসে নাম লেখানো দুই খেলোয়াড় প্লাতিনি বা রুমেনিগে, কেউই কখনো বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জেতার সৌভাগ্য লাভ করেননি।



পৌত্তলিক বলিদান

১৯৮৫ সালে কুখ্যাত ধর্মান্ধরা উনচল্লিশ জন ইতালীয় ভক্তকে হত্যা করেছিল।
আমি ব্রাসেলসের পুরোনো হেইসেল স্টেডিয়ামের গ্যালারি। ইংলিশ ক্লাব লিভারপুল যখন ইউরোপিয়ান কাপের ফাইনালে ইতালির জুভেন্টাসের মুখোমুখি হতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই উচ্ছৃঙ্খল সমর্থকরা তাণ্ডব চালায়। দেয়ালের সাথে কোণঠাসা হয়ে পড়া ইতালীয় সমর্থকরা নিজেদের মধ্যে পদদলিত হয় অথবা এক গভীর খাদে পড়ে যায়।
ম্যাচটি স্থগিত না হওয়ায় টেলিভিশন ম্যাচটির পাশাপাশি জবাইয়ের দৃশ্যটিও সরাসরি সম্প্রচার করেছিল।

এরপর থেকে ইংরেজ সমর্থকদের জন্য ইতালি নিষিদ্ধ হয়ে যায়, এমনকি যারা ভালো পারিবারিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার প্রমাণপত্র দেখাত তাদের জন্যও। ১৯৯০ সালের বিশ্বকাপে, সার্ডিনিয়ায় সমর্থকদের প্রবেশ করতে দেওয়া ছাড়া ইতালির আর কোনো উপায় ছিল না, যেখানে ইংলিশ দলের খেলার কথা ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে ফুটবলপ্রেমীদের চেয়ে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের এজেন্টই বেশি ছিল এবং ব্রিটিশ ক্রীড়ামন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে তাদের ওপর নজর রাখার দায়িত্ব নেন।



এক শতাব্দী আগে, ১৮৯০ সালে, লন্ডনের টাইমস পত্রিকা সতর্ক করেছিল: "আমাদের সবচেয়ে গুণ্ডাদের অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে। . . . খারাপ পরিস্থিতি হলো যে তারা

বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। 'গুণ্ডা' আমাদের সভ্যতার উপর এক বীভৎস উপদ্রব। আজও এই ধরনের অবাঞ্ছিত গোষ্ঠীগুলো অজুহাতে অপরাধ চালিয়ে যাচ্ছে। ফুটবল।

গুণ্ডারা যেখানেই আবির্ভূত হয়, সেখানেই আতঙ্ক ছড়ায়। তাদের শরীর বাইরে থেকে উল্কিতে ঢাকা, আর ভেতরটা মদে পূর্ণ। তাদের গলা ও কানে দেশাত্মবোধক টুকিটাকি জিনিস ঝোলে, তারা পিতলের মুষ্টি ও লাঠি ব্যবহার করে এবং "রুল ব্রিটানিয়া" ও সেই হারানো সাম্রাজ্যের অন্যান্য বিদ্বেষপূর্ণ স্লোগান চিৎকার করতে করতে হিংস্রতার সাগরে ঘাম ঝরায়। ইংল্যান্ডে এবং অন্যান্য দেশে, এই গুণ্ডারা প্রায়শই নাৎসি প্রতীক প্রদর্শন করে এবং কৃষ্ণাঙ্গ, আরব, তুর্কি, পাকিস্তানি বা ইহুদিদের প্রতি তাদের ঘৃণা ঘোষণা করে।

"আফ্রিকায় ফিরে যাও!" গর্জন করে উঠল রিয়াল মাদ্রিদের এক 'আল্ট্রা' সমর্থক, যে উপভোগ করছিল কৃষ্ণাঙ্গদের লক্ষ্য করে অপমানজনক কথা বলা, "কারণ ওরা আমার চাকরি কেড়ে নিতে এসেছে।"

ফুটবলের অজুহাতে ইতালীয় "নাৎসি শৈত্যরা" কৃষ্ণাঙ্গ খেলোয়াড়দের লক্ষ্য করে শিস দেয় এবং প্রতিপক্ষ দলের সমর্থকদের "ইহুদি" বলে ডাকে: তারা চিৎকার করে বলে , "এব্রেই!"

মাতালরা যেভাবে ওয়াইনকে অপমান করে, ঠিক সেভাবেই ফুটবলকে অপমান করা উচ্ছৃঙ্খল জনতা দুঃখজনকভাবে শুধু ইউরোপেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রায় প্রতিটি দেশই এদের দ্বারা জর্জরিত, কোনো দেশে বেশি, কোনো দেশে কম, এবং সময়ের সাথে সাথে এই উন্মত্তদের সংখ্যা বহুগুণে বেড়েছে। কয়েক বছর আগেও চিলির সমর্থকরাই ছিল আমার দেখা সবচেয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ: পুরুষ, মহিলা এবং শিশুরাও ছিল, যারা গ্যালারিতে গানের প্রতিযোগিতার আয়োজন করত, যেখানে বিচারকও থাকত।
বর্তমানে চিলির ক্লাব কোলো-কোলোর নিজস্ব একদল ঝামেলাবাজ রয়েছে, যাদের নাম "দ্য হোয়াইট ব্লু", এবং চিলি বিশ্ববিদ্যালয়ের দলটিকে বলা হয় "দ্য আন্ডারডগস"।



১৯৯৩ সালে হোর্হে ভালদানো হিসাব করে দেখান যে, বিগত পনেরো বছরে আর্জেন্টিনার স্টেডিয়ামগুলোতে সহিংসতায় একশোরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। ভালদানো বলেন, সামাজিক অবিচার এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনের হতাশার সঙ্গে সরাসরি সমানুপাতিক হারে সহিংসতা বৃদ্ধি পায়।

সর্বত্রই, উচ্ছৃঙ্খল দলগুলো চাকরি ও আশাহীনতায় জর্জরিত তরুণদের আকর্ষণ করে। তার এই কথা বলার কয়েক মাস পর, বুয়েনস আইরেসের বোকা জুনিয়র্স তাদের চিরাচরিত প্রতিদ্বন্দ্বী রিভার প্লেটের কাছে ২-০ গোলে পরাজিত হয়। দুই

স্টেডিয়াম ছাড়ার সময় রিভারের সমর্থকদের গুলি করে হত্যা করা হয়। টিভিতে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বোকার এক তরুণ সমর্থক মন্তব্য করেন, "আমরা ২-২ গোলে ড্র করেছি।"

অন্য সময়ে অন্য খেলাধুলা নিয়ে লেখা এক কলামে দিও ক্রিসোস্টম দ্বিতীয় শতাব্দীর রোমান সমর্থকদের একটি চিত্র এঁকেছিলেন: "যখন তারা স্টেডিয়ামে যায়, তখন মনে হয় যেন তারা মাদকের ভান্ডার আবিষ্কার করেছে। তারা নিজেদের পুরোপুরি ভুলে যায় এবং এক ফোঁটা লজ্জা ছাড়াই তাদের মাথায় প্রথম যা আসে তাই বলে ও করে।" খেলাধুলার ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ বিপর্যয়টি ঘটেছিল সেখানে, রোমে, চার শতাব্দী পরে। ৫১২ খ্রিস্টাব্দে, রথ-দৌড়ের সমর্থকদের দুটি দলের মধ্যে বেশ কয়েকদিন ধরে চলা এক রাস্তার যুদ্ধে হাজার হাজার মানুষ মারা গিয়েছিল—বলা হয় ত্রিশ হাজার, যদিও তা বিশ্বাস করা কঠিন।

ফুটবল স্টেডিয়ামের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি প্রাণহানির মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৬৪ সালে, পেরুর রাজধানী লিমায়। আর্জেন্টিনার বিপক্ষে একটি ম্যাচের শেষ মুহূর্তে রেফারি একটি গোল বাতিল করে দিলে, ক্ষোভে জ্বলন্ত গ্যালারি থেকে কমলালেবু, বিয়ারের ক্যান এবং অন্যান্য বস্তু বর্ষিত হতে থাকে। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ও গুলি ছুড়ে এর জবাব দেয় এবং একটি পদদলনের ঘটনা উস্কে দেয়। পুলিশের এক আক্রমণে জনতা বন্ধ থাকা বহির্গমন ফটকের দিকে পিষ্ট হয়। এতে তিন শতাধিক মানুষ মারা যায়। সেই রাতে লিমার রাস্তায় এক বিশাল জনতা প্রতিবাদ করেছিল: পুলিশের বিরুদ্ধে নয়, রেফারির বিরুদ্ধে।



১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপ

বি অ্যাবি ডক ডুভ্যালিয়ার সবকিছু সঙ্গে নিয়ে হাইতি থেকে পালাচ্ছিলেন। ফিলিপাইনের ফার্দিনান্দ মার্কোসও চুরি করে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। যদিও মার্কিন সূত্রগুলো (দেরিতে হলেও) প্রকাশ করেছে যে এই পরিমাণ- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রশংসিত ফিলিপিনো বীর আসলে একজন পলাতক সৈন্য ছিলেন।

দীর্ঘদিন পর হ্যালির ধূমকেতু আমাদের আকাশে দেখা দিচ্ছিল, ইউরেনাস গ্রহের চারপাশে নয়টি উপগ্রহ আবিষ্কৃত হচ্ছিল, এবং সূর্য থেকে আমাদের রক্ষাকারী ওজোন স্তরে প্রথম ছিদ্র দেখা দিচ্ছিল। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ফসল হিসেবে লিউকেমিয়ার একটি নতুন ওষুধ বাজারে আসছিল।

জাপানে একজন জনপ্রিয় গায়িকা আত্মহত্যা করছিলেন এবং তাকে অনুসরণ করে তার তেইশজন ভক্ত মৃত্যুকে বেছে নিচ্ছিল। একটি ভূমিকম্পে সালভাদরের দুই লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ছিল, এবং চেরনোবিলের সোভিয়েত পারমাণবিক কেন্দ্রে এক বিপর্যয় তেজস্ক্রিয় বিষের এক বৃষ্টিঝড় নামিয়ে দিচ্ছিল, যা পরিমাপ করা বা থামানো অসম্ভব ছিল; এবং তা অগণিত মাইল জুড়ে ও অগণিত মানুষের উপর ছড়িয়ে পড়ছিল।

ফেলিপে গঞ্জালেস একসময় 'না' বলে চিৎকার করলেও পরে আটলান্টিক সামরিক জোট ন্যাটোতে 'হ্যাঁ' বলছিলেন এবং একটি গণভোট তার এই অবস্থান পরিবর্তনকে অনুমোদন দিচ্ছিল, ঠিক সেই সময়েই স্পেন ও পর্তুগাল ইউরোপীয় কমন মার্কেটে প্রবেশ করছিল। রাস্তায় গুপ্তহত্যার শিকার সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী ওলফ পালমের মৃত্যুতে বিশ্ব শোকাহত ছিল। শিল্পকলা ও সাহিত্যের জন্যও এটি ছিল এক শোকের সময়: যারা বিদায় নিচ্ছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন ভাস্কর হেনরি মুর এবং লেখক সিমোন দ্য বোভোয়ার, জঁ জেনে, হুয়ান রুলফো ও হোর্হে লুইস বোর্হেস।

ইরানগেট কেলেঙ্কারিটি বিস্ফোরিত হচ্ছিল, যা অস্ত্র চোরাচালান ও মাদক পাচারে প্রেসিডেন্ট রিগান, সিআইএ এবং নিকারাগুয়ান কন্ট্রাদের জড়িয়ে ফেলছিল; ঠিক সেই মুহূর্তে কেপ ক্যানাভেরাল থেকে সাতজন ক্রু সদস্যসহ উড্ডয়নরত মহাকাশযান চ্যালেঞ্জারও বিস্ফোরিত হচ্ছিল। মার্কিন বিমান বাহিনী ছিল

লিবিয়ায় বোমা হামলা এবং কর্নেল গাদ্দাফির এক কন্যাকে হত্যা করা হয়েছিল তাকে এমন একটি হামলার শাস্তি দেওয়ার জন্য, যা বহু বছর পর প্রমাণিত হয় যে ইরান চালিয়েছিল।

লিমার একটি কারাগারে চারশো বন্দীকে গুলি করে হত্যা করা হচ্ছিল। মায়ামির নির্ভরযোগ্য সূত্রগুলো ফিদেল কাস্ত্রোর আসন্ন পতনের ঘোষণা দিচ্ছিল, তা ছিল মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার। এক বছর আগে মেক্সিকো সিটিতে ভূমিকম্প আঘাত হানলে সঠিক ভিত্তিহীন কিন্তু ভেতরে বহু মানুষ থাকা অনেক ভবন ধসে পড়েছিল, এবং সেখানে ত্রয়োদশ বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার সময়েও শহরটির একটি বড় অংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত ছিল।



অংশগ্রহণ করেছিল চৌদ্দটি ইউরোপীয় দেশ এবং আমেরিকা থেকে ছয়টি দেশ, সেইসাথে মরক্কো, দক্ষিণ কোরিয়া, ইরাক এবং আলজেরিয়া। মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত কাপের গ্যালারিতেই "দ্য ওয়েভ"-এর জন্ম হয়েছিল, এবং তখন থেকেই এটি উত্তাল সমুদ্রের ছন্দে বিশ্বজুড়ে ভক্তদের আন্দোলিত করে চলেছে। এমন কিছু ম্যাচ ছিল যা আপনার লোম খাড়া করে দিত, যেমন ফ্রান্স বনাম ব্রাজিলের ম্যাচ, যেখানে অজেয় প্লাতিনি, জিকো এবং সক্রেটিস পেনাল্টি কিক নিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এবং ডেনমার্ককে ঘিরে দুটি দর্শনীয় গোল উৎসবও ছিল: তারা উরুগুয়ের বিপক্ষে ছয়টি গোল করেছিল এবং স্পেনের কাছে পাঁচটি গোল হজম করেছিল।

কিন্তু এটা ছিল ম্যারাডোনার বিশ্বকাপ। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দুটি বাঁ-হাতের গোল করে ম্যারাডোনা ফকল্যান্ডস যুদ্ধে তাঁর দেশের গর্বে লাগা আঘাতের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন: প্রথমটি তিনি করেছিলেন তাঁর বাঁ হাতে, যেটিকে তিনি বলতেন "ঈশ্বরের হাত", এবং অন্যটি করেছিলেন ইংরেজ ডিফেন্ডারদের মাটিতে ফেলে দেওয়ার পর তাঁর বাঁ পা দিয়ে।

ফাইনালে আর্জেন্টিনা জার্মানির মুখোমুখি হয়েছিল। ম্যারাডোনাই সেই নির্ণায়ক পাসটি দিয়েছিলেন, যার ফলে খেলার সময় ফুরিয়ে আসার মুহূর্তে বুরুচাগা বল নিয়ে একা হয়ে যান এবং আর্জেন্টিনা ৩-২ গোলে জয়লাভ করে চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে নেয়।
কিন্তু তার আগে আরও একটি স্মরণীয় গোল হয়েছিল: ভালদানো আর্জেন্টিনার গোলপোস্ট থেকে বল নিয়ে দৌড় শুরু করে পুরো মাঠ পাড়ি দেন। যখন শুমাখার তাকে আটকাতে এগিয়ে আসেন, তিনি বলটি ডান পোস্টে মেরে দেন।

এবং জালে। মাঠের দিকে এগিয়ে আসার সময় ভালদানো বলটির সাথে কথা বলছিল, যেন মিনতি করছিল: “দয়া করে, ভেতরে যাও।”

ফ্রান্স তৃতীয় স্থান অধিকার করে, এরপর ছিল বেলজিয়াম। ইংল্যান্ডের লিনেকার ছয় গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় শীর্ষে ছিলেন। ম্যারাডোনা, ব্রাজিলের কারেকা এবং স্পেনের বুত্রাগুয়েনো পাঁচটি করে গোল করেন।



টেলিক্রেসি

এন আজকাল স্টেডিয়ামটি একটি বিশাল টিভি স্টুডিও। খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। টেলিভিশনের জন্য, যাতে আপনি এটি বাড়িতে বসে দেখতে পারেন। আর টেলিভিশনই সেরা।

'৮৬ সালের বিশ্বকাপে ভালদানো, ম্যারাডোনা এবং অন্যান্য খেলোয়াড়রা প্রতিবাদ করেছিলেন, কারণ গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচগুলো দুপুরে এমন এক সূর্যের নিচে খেলা হতো যা স্পর্শ করা সবকিছু পুড়িয়ে দিত। মেক্সিকোতে দুপুর, ইউরোপে সন্ধ্যা, ইউরোপীয় টেলিভিশনের জন্য এটাই ছিল সেরা সময়। জার্মান গোলরক্ষক হ্যারাল্ড শুমাখার সেই গল্পটি বলেছিলেন: "আমার ঘাম হয়। গলা শুকিয়ে যায়। ঘাসগুলো শুকনো বিষ্ঠার মতো: শক্ত, অদ্ভুত, প্রতিকূল। সূর্য সরাসরি স্টেডিয়ামের ওপর কিরণ দেয় এবং সোজা আমাদের মাথায় এসে লাগে। আমাদের কোনো ছায়া পড়ে না। তারা বলে এটা টেলিভিশনের জন্য ভালো।"

খেলার মানের চেয়ে প্রদর্শনীর বিক্রি কি বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল?
খেলোয়াড়রা লাথি মারতে এসেছে, কাঁদতে নয়, এবং হ্যাভেলাঞ্জ সেই বিরক্তিকর ব্যাপারটির অবসান ঘটালেন: "তাদের খেলা উচিত এবং মুখ বন্ধ রাখা উচিত," তিনি ফরমান জারি করলেন।

১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপ কে পরিচালনা করেছিল? মেক্সিকান ফুটবল ফেডারেশন? না, দয়া করে আর কোনো মধ্যস্থতাকারীর কথা নয়: এটি পরিচালনা করেছিলেন গিয়েরমো কানেদো, যিনি ছিলেন টেলিভিসার ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সংস্থাটির আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের প্রেসিডেন্ট।
এই বিশ্বকাপটি ছিল টেলিভিসার, সেই বেসরকারি একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের, যারা সমস্ত মেক্সিকানদের অবসর সময়ের মালিক এবং মেক্সিকান ফুটবলেরও মালিক। আর ইউরোপীয় সম্প্রচার স্বত্ব থেকে ফিফার সাথে মিলে টেলিভিসা যে অর্থ উপার্জন করতে পারত, তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই হতে পারত না। যখন একজন মেক্সিকান সাংবাদিক বিশ্বকাপের খরচ ও লাভ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার মতো ধৃষ্টতা দেখালেন, তখন কানিদো তাকে কড়া ভাষায় থামিয়ে দিলেন: "এটা একটা বেসরকারি সংস্থা এবং আমাদের কারও কাছে জবাবদিহি করতে হয় না।"

বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পর, কানিদো হ্যাভেলাঞ্জের অনুচর হিসেবে ফিফার অন্যতম উপ-সভাপতির পদ অলংকৃত করতে থাকেন; ফিফাও আরেকটি বেসরকারি সংস্থা, যাকে কারও কাছে জবাবদিহি করতে হয় না।

টেলিভিসা শুধু মেক্সিকান ফুটবলের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্প্রচারের নিয়ন্ত্রণই রাখে না, এটি প্রথম বিভাগের তিনটি ক্লাবেরও মালিক: সবচেয়ে শক্তিশালী আমেরিকা, নেকাক্সা এবং আটলান্তে।

১৯৯০ সালে টেলিভিসা মেক্সিকান ফুটবলের উপর তাদের ভয়ংকর ক্ষমতা প্রদর্শন করেছিল। সেই বছর, পুয়েবলা ক্লাবের সভাপতি এমিলিও মাউরেরের মাথায় এক মারাত্মক বুদ্ধি আসে: ম্যাচগুলো সম্প্রচারের একচেটিয়া স্বত্বের জন্য টেলিভিসা খুব সহজেই আরও বেশি অর্থ ব্যয় করতে পারে। মাউরেরের এই উদ্যোগ মেক্সিকান ফুটবল ফেডারেশনের বেশ কয়েকজন নেতার কাছে বেশ সমাদৃত হয়েছিল। কারণ, এই একচেটিয়া ব্যবস্থা প্রতিটি ক্লাবকে এক হাজার ডলারের কিছু বেশি অর্থ দিত এবং বিজ্ঞাপন বিক্রি করে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করত।

এরপর টেলিভিসা তাদের দেখিয়ে দিল যে আসল কর্তা কে। মাউরের ওপর নির্মমভাবে আক্রমণ চালানো হলো: রাতারাতি পাওনাদাররা তার কোম্পানি ও বাড়ি বাজেয়াপ্ত করে নিল, তাকে হুমকি দেওয়া হলো, মারধর করা হলো, তাকে পলাতক আসামি ঘোষণা করা হলো এবং তার গ্রেপ্তারের জন্য পরোয়ানা জারি করা হলো। শুধু তাই নয়, এক বিশ্রী সকালে কোনো পূর্বসতর্কতা ছাড়াই তার ক্লাবের স্টেডিয়াম বন্ধ করে দেওয়া হলো। কিন্তু এই গুণ্ডামিপূর্ণ কৌশলও তাকে তার অবস্থান থেকে ফেরাতে যথেষ্ট ছিল না, তাই মাউরকে জেলে পাঠানো এবং তার সমস্ত সহযোগীদের সাথে তাকে তার বিদ্রোহী ক্লাব ও মেক্সিকান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন থেকে বিতাড়িত করা ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় ছিল না।

সারা বিশ্বে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে, টেলিভিশনই ঠিক করে দেয় ফুটবল কোথায়, কখন এবং কীভাবে খেলা হবে। খেলাটি শরীর, আত্মা এবং পোশাক—সবকিছু নিয়েই ছোট পর্দার কাছে বিক্রি হয়ে গেছে। খেলোয়াড়রা এখন টিভি তারকা।

তাদের অনুষ্ঠানের সাথে কে প্রতিযোগিতা করতে পারে? ১৯৯৩ সালে ফ্রান্স ও ইতালিতে সর্বাধিক দর্শকপ্রিয় অনুষ্ঠানটি ছিল অলিম্পিক ডি মার্সেই এবং এসি মিলানের মধ্যকার ইউরোপীয় কাপ উইনার্স কাপের ফাইনাল। আমরা সবাই জানি, মিলান ইতালীয় টেলিভিশনের সম্রাট সিলভিও বেরলুসকোনিরই দেশ।

বার্নার্ড তাপি ফরাসি টিভির মালিক ছিলেন না, কিন্তু তার ক্লাব অলিম্পিক সেই বছর ছোট পর্দা থেকে ১৯৮০ সালের তুলনায় তিনশ গুণ বেশি অর্থ পেয়েছিল। তার অনুরাগের কারণের কোনো অভাব ছিল না।



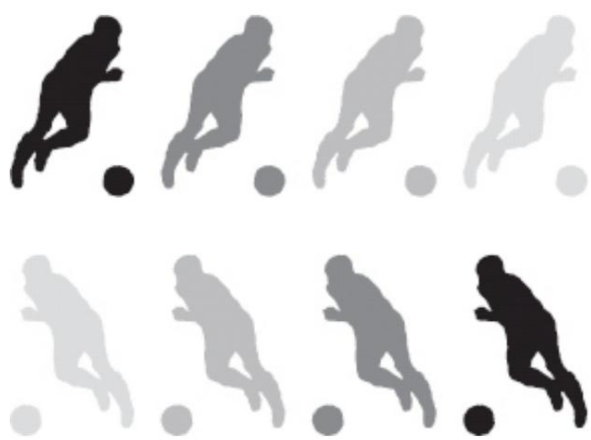
এখন শুধু স্টেডিয়ামে জায়গা পাওয়া হাজার হাজার দর্শকই নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষ ম্যাচ দেখতে পারে। ভক্তদের সংখ্যা বহুগুণে বেড়েছে, সেই সাথে ভাবমূর্তি কারসাজিকারীরা যা কিছু বিক্রি করতে চায়, তার সম্ভাব্য ক্রেতার সংখ্যাও বেড়েছে। কিন্তু বেসবল এবং বাস্কেটবলের মতো নয়, সকার একটি একটানা খেলার খেলা, যেখানে বিজ্ঞাপন দেখানোর জন্য খুব কমই বিরতি মেলে। একটিমাত্র হাফটাইম যথেষ্ট নয়। আমেরিকান টেলিভিশন এই অপ্রীতিকর ত্রুটিটি সংশোধনের জন্য ম্যাচগুলোকে পঁচিশ মিনিটের চারটি পর্বে ভাগ করার প্রস্তাব দিয়েছে—এবং হ্যাভেলাঞ্জ এতে সম্মত।

স্থির এবং মানসম্মত

ডি ইংল্যান্ড দলের কোচ জন হাও ১৯৮৭ সালে বলেছিলেন: “যে খেলোয়াড় ম্যাচ হেরেও সন্তুষ্ট থাকে, সে কখনোই ভালো খেলোয়াড় হতে পারে না।”
ফুটবল।

পেশাদার ফুটবল, যা ক্রমশ দ্রুততর ও সৌন্দর্যহীন হয়ে উঠছে, তার প্রবণতা হলো... হেরে যাওয়ার ভয়ে চালিত হয়ে তা গতি ও শক্তির খেলায় পরিণত হয়।

খেলোয়াড়রা প্রচুর দৌড়ায় এবং ঝুঁকি নেয় সামান্য বা একেবারেই নেয় না। দুঃসাহস লাভজনক নয়। '৫৪ থেকে '৯৪ বিশ্বকাপের মধ্যবর্তী চল্লিশ বছরেরও বেশি সময়ে, গড় গোলের সংখ্যা অর্ধেকে নেমে এসেছিল, যদিও ১৯৯৪ সাল থেকে টাই নিরুৎসাহিত করার জন্য প্রতিটি জয়ের জন্য একটি অতিরিক্ত পয়েন্ট দেওয়া হতো। মাঝারি মানের কাজের বহুল প্রশংসিত কার্যকারিতা: আধুনিক ফুটবলে ক্রমশই বেশি দল এমন সব কর্মকর্তা দিয়ে গঠিত হচ্ছে যারা পরাজয় এড়াতে পারদর্শী, এমন খেলোয়াড়দের দিয়ে নয় যারা অনুপ্রেরণায় কাজ করার ঝুঁকি নেয় এবং তাদের সৃজনশীলতাকে প্রাধান্য দেয়।



চিলির খেলোয়াড় কার্লোস কাসেলি লোভী ফুটবলকে উপহাস করেছেন: “এটাই হলো “ব্যাটম্যানের কৌশল,” তিনি বললেন। “এগারোজন খেলোয়াড়ই ক্রসবারে ঝুলছে।”

আর রুশ খেলোয়াড় নিকোলাই স্টারোস্টিন রিমোট-কন্ট্রোল সকার নিয়ে অভিযোগ করে বলেন: “এখন সব খেলোয়াড় দেখতে একই রকম। ওরা জার্সি বদলালে কেউ খেয়ালই করবে না। ওরা সবাই একই রকম খেলে।”

গতানুগতিক ও একঘেয়ে ফুটবল খেলাকে কি আদৌ খেলা বলা যায়? যারা শব্দের মূল অর্থ বোঝেন, তাদের মতে, “খেলা” হলো

ঠাট্টার ছলে বলতে গেলে, "স্বাস্থ্য" হলো যখন শরীর যতটা সম্ভব মুক্ত থাকে। যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তির নিয়ন্ত্রিত কার্যকারিতা, যা স্বাস্থ্যের শত্রু, ফুটবলকে অসুস্থ করে তুলছে।

জাদু, বিস্ময় বা সৌন্দর্য ছাড়া জেতা, সেটা কি হেরে যাওয়ার চেয়েও খারাপ নয়? ১৯৯৪ সালে, স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নশিপের সময়, রিয়াল মাদ্রিদ জিহনের স্পোর্টিংয়ের কাছে পরাজিত হয়েছিল। কিন্তু রিয়াল মাদ্রিদের খেলোয়াড়রা খেলেছিল উদ্দীপনা নিয়ে, এমন একটি শব্দ যার মূল অর্থ ছিল "অন্তরে দেবতা থাকা"। কোচ, হোর্হে ভালদানো, ড্রেসিংরুমে খেলোয়াড়দের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন: "তোমরা যখন এভাবে খেলো," তিনি তাদের বললেন, "তখন হেরে গেলেও সমস্যা নেই।"

চলমান ওষুধের দোকান

'৫৪ সালের বিশ্বকাপে, জার্মানি যখন এমন অবিশ্বাস্য গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যে হাঙ্গেরিয়ানরা আমি কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল, তখন ফেরেঙ্ক পুসকাস বলেছিলেন যে জার্মান ড্রেসিংরুমের গন্ধ ছিল পপি ফুলের বাগানের মতো। তিনি দাবি করেছিলেন এর একটা কারণ ছিল যে বিজয়ীরা ট্রেনের মতো দৌড়াতো।

১৯৮৭ সালে জার্মান জাতীয় দলের গোলরক্ষক হ্যারাল্ড "টনি" শুমাখার একটি বই প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি জার্মান ফুটবল এবং এর সূত্র ধরে সমস্ত পেশাদার দলকে উদ্দেশ্য করে বলেন: "মাদকদ্রব্য অনেক বেশি, কিন্তু নারী যথেষ্ট নয়।" তার বই ' ডের আনফিফ' (দ্য স্টার্টিং হুইসেল)-এ শুমাখার বর্ণনা করেন যে, ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপে জার্মান খেলোয়াড়দের অসংখ্য ইনজেকশন ও বড়ি এবং প্রচুর পরিমাণে এক রহস্যময় খনিজ জল দেওয়া হয়েছিল, যা তাদের ডায়রিয়ার কারণ হয়েছিল। সেই দলটি কি জার্মানির প্রতিনিধিত্ব করছিল, নাকি জার্মান রাসায়নিক শিল্পের? খেলোয়াড়দের এমনকি ঘুমের ওষুধ খেতেও বাধ্য করা হয়েছিল। শুমাখার সেগুলো থুথু দিয়ে ফেলে দিতেন; ঘুমাতে তিনি বিয়ার পছন্দ করতেন।

গোলরক্ষক নিশ্চিত করেছেন যে পেশাদার ফুটবলে অ্যানাবলিক স্টেরয়েড এবং উত্তেজক পদার্থের ব্যবহার খুবই সাধারণ। যেকোনো উপায়ে জেতার জন্য উৎপাদনশীলতার নিয়মের চাপে পড়ে অনেক উদ্বিগ্ন ও যন্ত্রণাক্লিষ্ট খেলোয়াড় চলমান ওষুধের দোকানে পরিণত হন। আর যে ব্যবস্থা তাদের এই পথে ঠেলে দেয়, সেই একই ব্যবস্থা প্রতিবার ধরা পড়ার পরেও তাদের সেই কাজের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে।

শুমাখার, যিনি মাঝে মাঝে মাদক গ্রহণের কথা স্বীকার করেছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়। দুই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে রানার-আপ এই জনপ্রিয় তারকাকে তাঁর আসন থেকে নামিয়ে আনা হয় এবং চরমভাবে অপমানিত করা হয়। নিজের দল কোলন থেকে বিতাড়িত হওয়ার পাশাপাশি তিনি জাতীয় দলেও জায়গা হারান এবং তুরস্কে গিয়ে খেলা ছাড়া তাঁর আর কোনো উপায় ছিল না।



অবজ্ঞার স্লোগান

এটা কোনো মানচিত্রে নেই, কিন্তু এটা আছে। এটা অদৃশ্য, কিন্তু এটা আছে। একটি প্রতিবন্ধকতা।

আমি যা বার্লিন প্রাচীরের স্মৃতিকে হাস্যকর করে তোলে: উন্নীত করা হয়েছে

যাদের আছে আর যাদের প্রয়োজন, তাদের মধ্যে পার্থক্য গড়ে দিয়ে এটি পৃথিবীকে উত্তর ও দক্ষিণে বিভক্ত করে এবং প্রতিটি দেশ ও শহরের ভেতরে সীমানা টেনে দেয়। যখন পৃথিবীর দক্ষিণাঞ্চল প্রাচীর টপকে এমন জায়গায় যাওয়ার ধৃষ্টতা দেখায় যেখানে তাদের যাওয়া উচিত নয়, তখন উত্তরাঞ্চল লাঠি দিয়ে তাদের সঠিক জায়গার কথা মনে করিয়ে দেয়। আর প্রতিটি দেশ ও শহরের সেই অভিশপ্ত এলাকা ছেড়ে যারা বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে, তাদের সাথেও একই ঘটনা ঘটে।

ফুটবল, যা সবকিছুরই প্রতিচ্ছবি, এই বাস্তবতাকেই তুলে ধরে। ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে, যখন ম্যারাডোনার জাদুকরী আগমনের দৌলতে নাপোলি ইতালির সেরা ফুটবল খেলতে শুরু করে, তখন দেশের উত্তরের সমর্থকেরা ঘৃণার পুরোনো অস্ত্র কোষমুক্ত করে এর প্রতিক্রিয়া জানায়। নিষিদ্ধ গৌরবের জবরদখলকারী নেপোলিটানরা চিরশক্তিশালীদের কাছ থেকে ট্রফি ছিনিয়ে নিচ্ছিল, এবং দক্ষিণ থেকে আসা এই অনুপ্রবেশকারী নিকৃষ্টদের ঔদ্ধত্যকে শাস্তি দেওয়ার সময় এসে গিয়েছিল। মিলান ও তুরিনের স্টেডিয়ামগুলোতে ব্যানারে অপমানসূচক বার্তা লেখা ছিল: “নেপোলিটানরা, ইতালিতে স্বাগতম।” অথবা সেগুলো নিষ্ঠুরতাকে উস্কে দিত: “ভিসুভিয়াস, আমরা তোমার ওপরই ভরসা করছি।”

এবং ভয়ের সন্তান ও বর্ণবাদের নাতি-নাতনিদের স্লোগানগুলো আগের চেয়েও জোরালোভাবে প্রতিধ্বনিত হলো:

> কী দুর্গন্ধ, কুকুরগুলো পালাচ্ছে, সব হচ্ছে কারণ
> নেপোলিটানরা আসছে।
> ও ভূমিকম্পে চাপা পড়া ক্রোধীরা, তোমরা
> কখনো সাবান দেখোনি, এমনকি কেকও না।

নেপলস বিষ্ঠা, নেপলস কলেরা, তুমি
সমগ্র ইতালির জন্য লজ্জার কারণ।

আর্জেন্টিনাতেও বোকা জুনিয়র্সের সাথে একই ঘটনা ঘটে। কাঁটা-চুল, কালো চামড়ার সেইসব গরিবদের কাছে বোকা প্রিয়, যারা ঝোপঝাড়পূর্ণ প্রত্যন্ত অঞ্চল এবং প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে বুয়েনস আইরেসের অভিজাত শহরে হানা দিয়েছে। শত্রুপক্ষের সমর্থকেরা এই ভয়ঙ্কর অসুরকে তাড়িয়ে দেয়:

বোকা শোক করছে, সবাই জানে, কারণ ওরা সবাই
কালো, ওরা সবাই সমকামী।
ঐ বদমাশগুলোকে মেরে
ফেলো, ওরা সোজা নয়।
গেঁয়োগুলোকে রিভার প্লেটে ছুঁড়ে ফেলো।





যেকোনো কিছুই করা যায়

১৯৮৮ সালে মেক্সিকান সাংবাদিক মিগেল অ্যাঞ্জেল রামিরেজ যৌবনের এক ঝর্ণার সন্ধান পান।
আমি মেক্সিকোর জুনিয়র দলের বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়, যাদের বয়স নির্ধারিত বয়সের চেয়ে দুই, তিন, এমনকি ছয় বছর বেশি ছিল, তাদের সেই জাদুকরী জলে স্নান করানো হয়েছিল: পরিচালকরা তাদের জন্মসনদ জাল করেছিলেন এবং নকল পাসপোর্ট তৈরি করেছিলেন। এই পদ্ধতি এতটাই কার্যকর ছিল যে, একজন খেলোয়াড় তার যমজ ভাইয়ের চেয়ে দুই বছর ছোট হয়ে গিয়েছিলেন।

তখন গুয়াদালাহারার উপরাষ্ট্রপতি ঘোষণা করলেন: "আমি বলব না এটা ভালো বিষয়টা, কিন্তু এটা সবসময়ই করা হয়ে আসছে।

আর জুনিয়র ফুটবলের শীর্ষ কর্মকর্তা রাফায়েল দেল কাস্তিলো প্রশ্ন করেছিলেন: "অন্যান্য দেশগুলো যখন এটা স্বাভাবিকভাবেই করে, তখন মেক্সিকো কেন চালাকি করতে পারে না?"



১৯৬৬ সালের বিশ্বকাপের কিছুদিন পরেই আর্জেন্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের হিসাবরক্ষক ভ্যালেন্তিন সুয়ারেজ ঘোষণা করেন: "স্ট্যানলি রাউস একজন ধূর্ত লোক। ইংল্যান্ড যাতে জিততে পারে, সেজন্যই সে বিশ্বকাপ পরিচালনা করেছে। বিশ্বকাপটা যদি আর্জেন্টিনায় অনুষ্ঠিত হতো, আমিও একই কাজ করতাম।"

বাজারের নৈতিকতা, যা আজকাল বিশ্বের নৈতিকতা হয়ে উঠেছে, তা সাফল্যের সমস্ত চাবিকাঠিকে সবুজ সংকেত দেয়, এমনকি সেগুলো চোরের সরঞ্জাম হলেও। পেশাদার ফুটবলের কোনো নীতিবোধ নেই, কারণ এটি ক্ষমতার এক নীতিহীন ব্যবস্থার অংশ, যা যেকোনো মূল্যে কার্যকারিতা কিনে নেয়। আর সর্বোপরি, নীতিবোধের মূল্য কখনোই খুব বেশি ছিল না। রেনেসাঁ যুগের ইতালিতে 'স্ক্রুপল' ছিল ওজনের ক্ষুদ্রতম পরিমাপ, সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ। পাঁচ শতাব্দী পরে, জার্মান ক্লাব কোলোনের খেলোয়াড় পল স্টাইনার ব্যাখ্যা করেছিলেন: "আমি টাকা এবং পয়েন্টের জন্য খেলি। প্রতিপক্ষ খেলোয়াড় আমার টাকা এবং আমার পয়েন্ট কেড়ে নিতে চায়। তাই আমার উচিত আমার হাতে থাকা সমস্ত উপায় দিয়ে তার বিরুদ্ধে লড়াই করা।"

এবং ডাচ খেলোয়াড় রোনাল্ড কোম্যান ১৯৮৮ সালে তার স্বদেশী গিলহাউস কর্তৃক ফরাসি খেলোয়াড় টিগানার পেটে দেওয়া নৃশংস লাথিটিকে এভাবে সমর্থন করেছিলেন: "এটি ছিল একটি জঘন্য কাজ। টিগানা ছিল তাদের সবচেয়ে বিপজ্জনক খেলোয়াড় এবং তাকে যেকোনো মূল্যে নিষ্ক্রিয় করতে হতো।"

উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যেকোনো উপায়ই বৈধ, এবং যেকোনো পাশবিক কাজই গ্রহণযোগ্য, যদিও তা গোপনে করাই বুদ্ধিমানের কাজ। অলিম্পিক ডি মার্সেই-এর ডিফেন্ডার বাসিল বলি, যিনি অন্যদের গোড়ালিতে আঘাত করার অভিযোগে অভিযুক্ত, তিনি তার সেই অগ্নিপরীক্ষার বর্ণনা দিয়েছেন। ১৯৮৩ সালে রজার মিলা তাকে পাগলের মতো কনুই দিয়ে আঘাত করছিলেন, তাই তিনি মাথা দিয়ে তাকে মাটিতে ফেলে দেন। "সেটাই ছিল প্রথম শিক্ষা: তারা আঘাত করার আগেই তুমি আঘাত করো, কিন্তু বিচক্ষণতার সাথে।"



আপনাকে বল থেকে দূরে শট নিতে হবে, কারণ টিভি ক্যামেরার মতোই রেফারিও সেদিকেই নজর রাখেন। ১৯৭০ সালের বিশ্বকাপে ইতালীয় বার্টিনি পেলেকে নির্মমভাবে মার্ক করেছিলেন। পরে তিনি তার প্রশংসা করে বলেছিলেন: "বার্টিনি অলক্ষ্যে ফাউল করার একজন শিল্পী ছিলেন। তিনি আমার পাঁজরে বা পেটে ঘুষি মারতেন, আমার গোড়ালিতে লাথি মারতেন।"

. . . একজন শিল্পী।

আর্জেন্টিনার সাংবাদিকরা প্রায়শই কার্লোস বিলার্দোর কূটকৌশলের প্রশংসা করেন, কারণ তিনি জানেন কীভাবে সেগুলো সতর্কভাবে ও কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে হয়। বলা হয় যে, খেলোয়াড় থাকাকালীন বিলার্দো প্রতিপক্ষকে পিন দিয়ে খোঁচা দিতেন এবং মুখে নিষ্পাপ ভাব দেখাতেন। আর যখন তিনি আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের ম্যানেজার ছিলেন, তখন ১৯৯০ বিশ্বকাপের সবচেয়ে কঠিন ম্যাচে তিনি তৃষ্ণার্ত ব্রাজিলিয়ান খেলোয়াড় ব্রাঙ্কোর জন্য বমি উদ্রেককারী জলে ভরা একটি ক্যান্টিন পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

উরুগুয়ের সাংবাদিকরা বেপরোয়া অপরাধকে "শক্তিশালী চাল" বলতে ভালোবাসেন, এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দের ভয় দেখানোর জন্য "নরম করার লাথি"-র কার্যকারিতা নিয়ে একাধিক সাংবাদিক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। সেই লাথিটি ম্যাচের প্রথম মিনিটেই দিতে হয়। এর পরে দিলে মাঠ থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। উরুগুয়ের ফুটবলে সহিংসতা হলো অধঃপতনের ফল। অনেক আগে, "চারুয়ার থাবা" শব্দটি সাহসিকতার পরিচায়ক ছিল, কোনো মারাত্মক লাথির জন্য নয়।

১৯৫০ সালের বিশ্বকাপে, মারাকানার সেই বিখ্যাত ফাইনালে, ব্রাজিল উরুগুয়ের চেয়ে দ্বিগুণ ফাউল করেছিল। ১৯৯০ সালের কাপে, যখন ম্যানেজার অস্কার তাবারেজ উরুগুয়ে দলকে আবার পরিচ্ছন্নভাবে খেলতে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলেন, তখন বেশ কয়েকজন স্থানীয় ভাষ্যকার আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করেছিলেন যে এতে বিশেষ কোনো সাফল্য আসেনি। এমন অনেক সমর্থক ও কর্মকর্তাও আছেন, যারা সম্মানের সঙ্গে হারার চেয়ে সম্মানহীনভাবে জেতাকেই বেশি পছন্দ করেন।

উরুগুয়ের ফরোয়ার্ড "পেপে" সাসিয়া বলেছেন: "গোলরক্ষকের চোখে ময়লা ছুঁড়ে মারবেন? ধরা পড়লে ম্যানেজাররা তা পছন্দ করেন না।"

'৮৬ বিশ্বকাপে ম্যারাডোনার হাত দিয়ে করা গোলটির ভূয়সী প্রশংসা করেছিল আর্জেন্টাইন সমর্থকরা, কারণ রেফারি তা দেখতে পাননি। ১৯৯০ বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে চিলির গোলরক্ষক রবার্তো রোজাস কপালে কেটে আহত হওয়ার ভান করেছিলেন, কিন্তু তিনি ধরা পড়ে যান। চিলির সমর্থকেরা, যারা রোজাসকে পূজা করত এবং তাকে "দ্য কন্ডর" বলে ডাকত, হঠাৎ করেই তাকে খলনায়কে পরিণত করে, কারণ তার কৌশলটি কাজে আসেনি।

পেশাদার ফুটবলে, অন্য সবকিছুর মতোই, অপরাধটি গুরুত্বপূর্ণ নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত অকাট্য প্রমাণ থাকে। "সংস্কৃতি" মানে হলো পরিচর্যা। ক্ষমতার সংস্কৃতি আমাদের মধ্যে কী চাষ করে? যে ক্ষমতা সেনাবাহিনীর অপরাধ ও রাজনীতিবিদদের দুর্নীতিকে দায়মুক্তি দেয় এবং সেগুলোকে বিজয়ে রূপান্তরিত করে, তার কী দুঃখজনক ফল হতে পারে?

লেখক আলবার্ট কামু, যিনি একসময় আলজেরিয়ায় গোলরক্ষক ছিলেন, যখন বলেছিলেন: "নৈতিকতা সম্পর্কে আমি যা কিছু জানি, তার সবই ফুটবলের কাছে ঋণী," তখন তিনি পেশাদার খেলার কথা বলছিলেন না।



বদহজম

১৯৮৯ সালে বুয়েনস আইরেসে আর্জেন্টিনোস জুনিয়র্স এবং রেসিং-এর মধ্যে একটি ম্যাচ ড্র হয়। নিয়ম অনুযায়ী পেনাল্টি আমি শুটআউটের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

বারো গজ দূর থেকে প্রথম শটগুলো দেখার জন্য দর্শকরা উৎকণ্ঠায় দাঁড়িয়ে নখ কামড়াচ্ছিল। রেসিং-এর একটি গোলে সমর্থকরা উল্লাস করল। এরপর আর্জেন্টিনোস জুনিয়র্স একটি গোল করল এবং অপর প্রান্তের সমর্থকেরাও উল্লাস করল। রেসিং-এর গোলরক্ষক যখন একটি পোস্টে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলটি লক্ষ্যভ্রষ্ট করলেন, তখন দর্শকরা করতালি দিয়ে তাকে অভিবাদন জানাল। আরেকটি করতালি আর্জেন্টিনোসের গোলরক্ষকের প্রশংসায় গেল, যিনি স্ট্রাইকারের মুখের অভিব্যক্তিতে প্রভাবিত না হয়ে গোলের মাঝখানে বলটির জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

দশম পেনাল্টি কিকটি নেওয়া হলে আবারও করতালি পড়ল। বিশতমটির পর কয়েকজন দর্শক স্টেডিয়াম ছেড়ে চলে গেলেন। যখন ত্রিশতম পেনাল্টি কিকের পালা এল, তখন যারা রয়ে গেলেন তারা হাই তুলে তার জবাব দিলেন। একের পর এক কিক আসতেই থাকল এবং ম্যাচটি অমীমাংসিতই রইল।

চুয়াল্লিশটি পেনাল্টি কিকের পর ম্যাচটি শেষ হলো। এটি ছিল পেনাল্টির ক্ষেত্রে একটি বিশ্ব রেকর্ড। স্টেডিয়ামে উদযাপন করার মতো কেউ ছিল না, এমনকি কোন দল জিতেছে তাও কেউ জানত না।

১৯৯০ বিশ্বকাপ

এন সাতাশ বছর কারাগারে কাটানোর পর এলসন ম্যান্ডেলা মুক্তি পেয়েছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গ এবং গর্বিত হওয়ার জন্য। কলম্বিয়ায় বামপন্থীদের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী বের্নার্দো জারামিলো মুমূর্ষু অবস্থায় ছিলেন এবং একটি হেলিকপ্টার থেকে পুলিশ বিশ্বের দশজন ধনী ব্যক্তির অন্যতম, মাদক পাচারকারী রদ্রিগেজ গাচাকে গুলি করছিল। চিলির মারাত্মকভাবে আহত গণতন্ত্র সেরে উঠছিল, কিন্তু সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল পিনোশে তখনও রাজনীতিবিদদের ওপর নজর রাখছিলেন এবং তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। একটি ট্রাক্টরে চড়ে আলবার্তো ফুজিমোরি পেরুর নির্বাচনে মারিও ভার্গাস ইয়োসাকে পরাজিত করছিলেন। নিকারাগুয়ায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা অস্ত্রসজ্জিত ও প্রশিক্ষিত আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে দশ বছরের যুদ্ধের ক্লান্তিতে পরাজিত হয়ে সান্ডিনিস্তারা দেশটির নির্বাচনে হারছিল, অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পানামায় তাদের একবিংশতম আক্রমণের সাফল্যের পর নতুন করে দখলদারিত্ব শুরু করছিল।

পোল্যান্ডে শ্রমিক নেতা লেক ওয়ালেসা, যিনি প্রতিদিন গণপ্রার্থনায় যেতেন, জেল থেকে বেরিয়ে সরকারে যোগ দিচ্ছিলেন। মস্কোতে ম্যাকডোনাল্ড'স-এর সামনে ভিড় জমেছিল। বার্লিন প্রাচীর খণ্ড খণ্ড করে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছিল, যখন দুই জার্মানির একত্রীকরণ এবং যুগোস্লাভিয়ার পতন শুরু হচ্ছিল। রোমানিয়ায় একটি গণঅভ্যুত্থান চাউসেস্কু শাসনের অবসান ঘটাচ্ছিল, এবং সেই প্রবীণ স্বৈরশাসক, যিনি নিজেকে "সমাজতন্ত্রের নীল দানিউব" বলতে পছন্দ করতেন, তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছিল। সমগ্র পূর্ব ইউরোপে, পুরোনো আমলারা নতুন উদ্যোক্তায় পরিণত হচ্ছিলেন এবং ক্রেন দিয়ে মার্ক্সের মূর্তি টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, যাঁর "আমি নির্দোষ" বলার কোনো উপায় ছিল না। মিয়ামির নির্ভরযোগ্য সূত্র ফিদেল কাস্ত্রোর আসন্ন পতনের ঘোষণা দিচ্ছিল, যা ছিল মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার। স্বর্গে, পার্থিব যন্ত্রগুলো শুক্র গ্রহে গিয়ে তার গোপন রহস্যের ওপর নজরদারি করছিল, আর এদিকে পৃথিবীতে, ইতালিতে, চতুর্দশ বিশ্বকাপ শুরু হয়ে গিয়েছিল।

ইউরোপ থেকে চৌদ্দটি এবং আমেরিকা থেকে ছয়টি দল অংশগ্রহণ করেছিল, এছাড়াও ছিল মিশর, দক্ষিণ কোরিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ক্যামেরুন, যারা প্রথম ম্যাচে আর্জেন্টিনাকে পরাজিত করে বিশ্বকে চমকে দিয়েছিল।

এরপর ইংল্যান্ডের সঙ্গে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা। চল্লিশ বছর বয়সী প্রবীণ রজার মিলা এই আফ্রিকান অর্কেস্ট্রার প্রথম ড্রামার ছিলেন।



কুমড়োর মতো ফুলে যাওয়া এক পা নিয়ে ম্যারাডোনা তার দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছিলেন। ট্যাঙ্গোর সুর প্রায় শোনাই যাচ্ছিল না। ক্যামেরুনের কাছে হারের পর আর্জেন্টিনা রোমানিয়া ও ইতালির সাথে ড্র করে এবং ব্রাজিলের কাছে হারতে বসেছিল। ব্রাজিলিয়ানরা পুরো ম্যাচ জুড়ে আধিপত্য বিস্তার করে, যতক্ষণ না ম্যারাডোনা এক পায়ে খেলে মাঝমাঠে তিনজন ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে কানিগিয়াকে বল বাড়িয়ে দেন, যিনি চোখের পলক ফেলার আগেই গোল করে বসেন।

আগের কাপের মতোই ফাইনালে আর্জেন্টিনা জার্মানির মুখোমুখি হয়েছিল, কিন্তু এবার একটি অলক্ষিত ফাউল এবং বেকেনবাউয়ারের বিচক্ষণ কোচিংয়ের সুবাদে জার্মানি ১-০ গোলে জয়লাভ করে।

ইতালি তৃতীয় এবং ইংল্যান্ড চতুর্থ স্থান অধিকার করে। ইতালির শিল্লাচি ছয়টি গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় শীর্ষে ছিলেন, এরপর পাঁচটি গোল করে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন চেকোস্লোভাকিয়ার স্কুহারাভি। ছিটেফোঁটা সাহস বা সৌন্দর্যহীন এই বিরক্তিকর ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বনিম্ন গড় স্কোর ছিল।

রিনকনের গোল

ঘটনাটি ১৯৯০ সালের বিশ্বকাপে ঘটেছিল। কলম্বিয়া তখন এর চেয়ে ভালো খেলছিল।
আমি জার্মানি, কিন্তু ম্যাচটি ১-০ গোলে পিছিয়ে ছিল।

তারপর, শেষ মিনিটে, বলটি বিদ্যুতের মতো উদ্দীপ্ত আফ্রো চুলের একটি মাথা খুঁজতে মাঠের মাঝখানে পৌঁছালো: ভালদেরামা পেছন থেকে বল পেলেন, ঘুরলেন, অপ্রয়োজনীয়ভাবে তিনজন জার্মানকে কাটিয়ে রিনকনকে পাস দিলেন। বলটি রিনকন থেকে ভালদেরামা, ভালদেরামা থেকে রিনকনের কাছে, তোমার আর আমার, আমার আর তোমার, একের পর এক স্পর্শে ঘুরতে লাগলো, যতক্ষণ না রিনকন জিরাফের মতো কয়েক পা লাফিয়ে এগিয়ে গিয়ে একা জার্মান গোলরক্ষক ইলগনারের মুখোমুখি হলেন। ইলগনার গোলপোস্ট পুরোপুরি ঢেকে রেখেছিলেন। তাই রিনকন বলটিকে লাথি মারেননি, তিনি যেন তাকে আদর করেছিলেন। আর সে গোলরক্ষকের দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে আলতোভাবে গলে গিয়ে গোল করলো।



হুগো সানচেজ

১৯৯২ সাল শুরু হতেই যুগোস্লাভিয়া টুকরো টুকরো হয়ে গেল। যুদ্ধ ভাইদের শিখিয়েছিল... একটিপরস্পরকে ঘৃণা করা এবং বিনা অনুশোচনায় হত্যা ও ধর্ষণ করা।

দুই মেক্সিকান সাংবাদিক, এপি ইবারা এবং হের্নান ভেরা, সারায়েভো যেতে চেয়েছিলেন। বোমাবর্ষণ ও অবরোধে জর্জরিত সারায়েভো বিদেশি সংবাদমাধ্যমের জন্য নিষিদ্ধ ছিল, এবং অবিবেচক আচরণের কারণে এর মধ্যেই একাধিক সাংবাদিকের প্রাণহানি ঘটেছিল।

শহরের প্রবেশপথের সবদিকেই চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। সবাই সবার বিরুদ্ধে: পরিখা, ধোঁয়া ওঠা ধ্বংসস্তূপ আর সমাহিত না হওয়া লাশের সেই উন্মত্ততার মধ্যে কে কে, বা তারা কার সাথে লড়ছে, তা কেউই নিশ্চিত ছিল না। হাতে মানচিত্র নিয়ে, এপি আর হার্নান কামানের গোলাবর্ষণ আর মেশিনগানের গুলির গর্জনের মধ্যে দিয়ে পথ করে এগোতে লাগল, অবশেষে দ্রিনা নদীর তীরে এসে তারা হঠাৎ একদল সৈন্যের মুখোমুখি হলো, যারা তাদের মাটিতে ফেলে দিয়ে বুকে নিশানা করল। অফিসারটি কী যেন গর্জন করে উঠল আর সাংবাদিকরাও কী যেন বিড়বিড় করে জবাব দিল। কিন্তু যখন অফিসারটি তার গলায় আঙুল বুলিয়ে দিল আর রাইফেলগুলো থেকে ক্লিক শব্দ হল, তারা বুঝতে পারল যে বিদায় জানানো আর প্রার্থনা করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই, যদি আদৌ কোনো স্বর্গ থেকে থাকে।

তখন দণ্ডিত ব্যক্তিদের মনে হলো তাদের পাসপোর্ট দেখানোর কথা।

অফিসারের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "মেক্সিকো!" তিনি চিৎকার করে উঠলেন। "হুগো সানচেজ!"

এবং সে তার অস্ত্র ফেলে দিয়ে তাদের জড়িয়ে ধরল।

অসম্ভব তালা খোলার মেক্সিকান চাবিকাঠি হুগো সানচেজ টেলিভিশনের সৌজন্যে বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন, যেখানে তার গোল করার শিল্প এবং গোল উদযাপনের জন্য দেওয়া হ্যান্ডস্প্রিংগুলো প্রদর্শিত হয়েছিল। ১৯৮৯-১৯৯০ মৌসুমে, তিনি পরেছিলেন

রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে তিনি আটত্রিশবার জাল কাঁপিয়ে স্প্যানিশ ফুটবলের সমগ্র ইতিহাসে সর্বোচ্চ বিদেশি গোলদাতা হন।



ঝিঁঝিঁ পোকা এবং পিঁপড়া

১৯৯২ সালে গান গাওয়া ঝিঁঝি পোকা কর্মী পিঁপড়াকে ২-০ তে পরাজিত করেছিল।

আমি ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে জার্মানি ও ডেনমার্ক একে অপরের মুখোমুখি হয়েছিল। জার্মান খেলোয়াড়রা উপবাস, সংযম ও কঠোর পরিশ্রমে বেড়ে উঠেছিল, আর ডেনিশরা বেড়ে উঠেছিল বিয়ার, নারী আর রোদে ঘুমিয়ে।

ডেনমার্ক বাছাইপর্বে বাদ পড়েছিল এবং খেলোয়াড়রা ছুটিতে ছিলেন, এমন সময় যুদ্ধ শুরু হয় এবং টুর্নামেন্টে যুগোস্লাভিয়ার জায়গা নেওয়ার জন্য তারা একটি জরুরি ডাক পায়। তাদের প্রশিক্ষণের জন্য কোনো সময় ছিল না, এমনকি এতে কোনো আগ্রহও ছিল না, এবং তাদের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারকা মাইকেল লাউড্রপকে ছাড়াই কাজ চালাতে হয়েছিল; যিনি ছিলেন একজন নিশ্চিত পদক্ষেপে চলা খেলোয়াড় এবং সবেমাত্র বার্সেলোনার জার্সিতে ইউরোপিয়ান কাপ জিতেছিলেন। অন্যদিকে, জার্মান দল ম্যাথিউস, ক্লিন্সম্যান এবং তাদের অন্যান্য সব বড় তারকাদের নিয়ে ফাইনালে এসেছিল। জার্মানি, যাদের জেতা উচিত ছিল, তারা ডেনমার্কের কাছে পরাজিত হয়; ডেনমার্কের নিজেদের প্রমাণ করার কিছুই ছিল না এবং তারা এমনভাবে খেলছিল যেন মাঠটি সৈকতেরই একটি অংশ।



গুলিত

১৯৯৩ সালে বর্ণবাদের ঢেউ উঠছিল। এর দুর্গন্ধ, এক পুনরাবৃত্ত ঘটনার মতো।
আমি দুঃস্বপ্ন, যা ইতিমধ্যেই ইউরোপের উপর ছেয়ে গিয়েছিল; বেশ কয়েকটি অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল।
এবং প্রাক্তন ঔপনিবেশিক অভিবাসীদের প্রবেশ ঠেকাতে আইন পাস করা হয়েছিল। কাজ খুঁজে না পেয়ে অনেক শ্বেতাঙ্গ যুবক তাদের দুর্দশার জন্য কালো চামড়ার মানুষদের দায়ী করতে শুরু করে।

সেই বছর ফ্রান্সের একটি দল প্রথমবারের মতো ইউরোপিয়ান কাপ জিতেছিল। জয়সূচক গোলটি করেন আইভরি কোস্টের আফ্রিকান নাগরিক বাসিলে বলি, যিনি ঘানায় জন্মগ্রহণকারী আরেক আফ্রিকান আবেদি পেলের নেওয়া কর্নার কিক থেকে হেডে গোলটি করেন। এদিকে, শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্বের কট্টর সমর্থকরাও অস্বীকার করতে পারত না যে নেদারল্যান্ডসের সেরা খেলোয়াড় ছিলেন সুরিনামের অধিবাসী শ্যামবর্ণের সন্তান, প্রবীণ রুড গুলিত ও ফ্রাঙ্ক রাইকার্ড, কিংবা আফ্রিকান ইউসেবিও ছিলেন পর্তুগালের সর্বকালের সেরা ফুটবল খেলোয়াড়।



'দ্য ব্ল্যাক টিউলিপ' নামে পরিচিত রুড গুলিত বরাবরই বর্ণবাদের একজন সোচ্চার বিরোধী ছিলেন। হাতে গিটার নিয়ে তিনি ম্যাচের ফাঁকে বর্ণবাদবিরোধী কনসার্টে গান গাইতেন এবং ১৯৮৭ সালে ইউরোপের সবচেয়ে মূল্যবান খেলোয়াড় নির্বাচিত হওয়ার পর, তিনি তাঁর ব্যালন ডি'অর পুরস্কারটি নেলসন ম্যান্ডেলাকে উৎসর্গ করেন, যিনি কৃষ্ণাঙ্গদের মানুষ হিসেবে বিশ্বাস করার অপরাধে বহু বছর কারাগারে কাটিয়েছিলেন।

গুলিতের একটি হাঁটুতে তিনবার অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল। প্রতিবারই ভাষ্যকাররা ঘোষণা করেছিলেন যে তার ক্যারিয়ার শেষ। কিন্তু প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে তিনি সবসময় ফিরে আসতেন।

ব্যাক: "যখন আমি খেলতে পারি না, তখন আমি এমন এক নবজাতকের মতো হয়ে যাই যার চোষার মতো কিছুই নেই।"

তার ক্ষিপ্র গোল করার ক্ষমতা এবং রাস্টা ড্রেডলকস শোভিত প্রভাবশালী অবয়ব নেদারল্যান্ডস ও ইতালির শক্তিশালী দলগুলোর হয়ে খেলার সময় তার জন্য একনিষ্ঠ অনুসারী তৈরি করেছিল। কিন্তু গুলিতের সাথে কোচ বা ম্যানেজারদের কখনোই বনিবনা হতো না, কারণ তিনি আদেশ অমান্য করতেন এবং তার মধ্যে সেই একগুঁয়ে অভ্যাস ছিল যে তিনি অর্থের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কথা বলতেন, যা ফুটবলকে স্টক এক্সচেঞ্জের একটি সাধারণ তালিকায় পরিণত করছে।



পিতৃহত্যা

১৯৯৩ সালের দক্ষিণাঞ্চলীয় শীতের শেষে, কলম্বিয়ার জাতীয় দল
একটিবুয়েনস আইরেসে একটি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ খেলেছিল। যখন
কলম্বিয়ার খেলোয়াড়রা যখন মাঠে নামলেন, তখন তাঁদেরকে শিস, দুয়ো এবং অপমানের ঝড় দিয়ে স্বাগত জানানো হলো। তাঁরা যখন মাঠ ছাড়লেন, দর্শকরা দাঁড়িয়ে তাঁদের এমন এক অভিবাদন জানাল যার রেশ আজও শোনা যায়।

আর্জেন্টিনা ৫-০ গোলে হেরে গেল। বরাবরের মতোই, হারের বোঝাটা গোলরক্ষকের কাঁধেই পড়ল, কিন্তু এবার সফরকারীদের জয় এমনভাবে উদযাপিত হলো যা আগে কখনো হয়নি। সমর্থকেরা একযোগে কলম্বিয়ানদের অবিশ্বাস্য শৈলীতে উল্লাস করছিল—পায়ের এক মহোৎসব, চোখের জন্য এক আনন্দ, এক অবিরাম পরিবর্তনশীল নৃত্য যা ম্যাচ এগোনোর সাথে সাথে নিজের সুর তৈরি করে নিচ্ছিল। শ্রমজীবী মিশ্রবর্ণের কৃষ্ণাঙ্গ 'এল পিবে' বালদেরামার রাজকীয় খেলা রাজপুত্রদেরও ঈর্ষার কারণ ছিল, এবং কৃষ্ণাঙ্গ খেলোয়াড়েরাই ছিল এই উৎসবের রাজা: কেউই পেরিয়াকে অতিক্রম করতে বা 'ফ্রেইট ট্রেন'কে থামাতে পারছিল না।
ভ্যালেন্সিয়া; 'অক্টোপাস' আসপ্রিলার শুঁড়ের মোকাবিলা করার কিংবা রিনকনের ছোড়া গুলি আটকানোর মতো ক্ষমতা তখন কারও ছিল না। তাদের গায়ের রঙ আর আনন্দের তীব্রতা দেখে ওই কলম্বিয়ানদেরকে ব্রাজিলের স্বর্ণযুগের মতো মনে হচ্ছিল।

কলম্বিয়ার সংবাদমাধ্যম এই হত্যাকাণ্ডকে 'পিতৃহত্যা' বলে আখ্যা দিয়েছে। অর্ধ শতাব্দী আগে, বোগোটা, মেডেলিন এবং কালিতে ফুটবলের প্রতিষ্ঠাতারা ছিলেন আর্জেন্টাইন। কিন্তু জীবনে চমক তো থাকেই: পেডেরনেরা, ডি স্টেফানো, রসি, রিয়াল, পন্তোনি এবং মোরেনোর এক সন্তান হয়, যে পরবর্তীতে ব্রাজিলিয়ান হিসেবে জন্ম নেয়।



জিকোর গোল

সালটা ছিল ১৯৯৩। টোকিওতে, কাশিমা সম্রাটের জন্য তোহোকুর বিপক্ষে খেলছিল।
আমি কাপ।

কাশিমা দলের তারকা, ব্রাজিলিয়ান জিকো, জয়সূচক গোলটি করেন, যা ছিল তার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে সুন্দর গোল। ডান দিক থেকে আসা একটি ক্রসে বলটি মাঝখানে পৌঁছায়। জিকো, যে অর্ধবৃত্তের মধ্যে ছিল, সামনে লাফ দিল। কিন্তু সে খুব তাড়াতাড়ি লাফ দিয়েছিল। যখন সে বুঝতে পারল বলটা তার পেছনে, সে শূন্যে একটা ডিগবাজি খেল এবং মুখ মাটিতে রেখে গোড়ালির জোরে বলটা জালে জড়াল। এটা ছিল পেছন দিকে করা একটা ওভারহেড ভলি।

"আমাকে ঐ গোলটা সম্পর্কে বলুন," অন্ধটি মিনতি করে।



এড়ানোর খেলা

ডাব্লিউ যখন স্পেন তখনও ফ্রাঙ্কোর একনায়কতন্ত্রের অধীনে ভুগছিল, রিয়েল মাদ্রিদের প্রেসিডেন্ট সান্তিয়াগো বার্নাবেউ এর একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন ক্লাবের লক্ষ্য: “আমরা জাতির সেবা করছি। আমাদের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে খুশি করা।”

অ্যাটলেটিকো ডি মাদ্রিদে তাঁর সহকর্মী, ভিসেন্তে কালদেরনও খেলাটির গুণকে একটি সম্মিলিত ভ্যালিয়াম হিসেবে প্রশংসা করেছেন: “সকার মানুষকে আরও বিপজ্জনক বিষয় নিয়ে চিন্তা করা থেকে বিরত রাখে।”

১৯৯৩ এবং ১৯৯৪ সালে বিশ্বজুড়ে বেশ কয়েকটি ফুটবল দলের পরিচালকদের নানা ধরনের প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত ও বিচার করা হয়েছিল। স্পষ্টতই, ফুটবল শুধু সামাজিক উত্তেজনা গোপন করা ও সামাজিক সংঘাত এড়ানোর জন্যই নয়, বরং সম্পদ গোপন করা ও কর ফাঁকি দেওয়ার জন্যও কার্যকর।

সেই দিন অনেক আগেই চলে গেছে যখন বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্লাবগুলো সমর্থক ও খেলোয়াড়দের মালিকানাধীন ছিল। সেই সুদূর অতীতে, ক্লাবের সভাপতি এক বালতি চুন আর একটি তুলি নিয়ে মাঠে দাগ টানার জন্য ঘুরে বেড়াতেন, আর পরিচালকদের সবচেয়ে বড় বিলাসিতা ছিল পাড়ার পানশালায় কোনো উৎসবের ভোজের খরচ জোগানো। আজ ক্লাবগুলো এমন কর্পোরেশন, যারা খেলোয়াড় নিয়োগ করতে ও খেলা দেখানোর জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করে, এবং তারা রাষ্ট্রকে ধোঁকা দিতে, জনসাধারণকে বোকা বানাতে, এবং শ্রম অধিকারসহ অন্যান্য সমস্ত অধিকার লঙ্ঘন করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। তারা শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেতেও অভ্যস্ত।

পেশাদার ক্লাবগুলোর সংগঠন ফিফার চেয়ে বেশি দায়মুক্তি ভোগ করে এমন কোনো বহুজাতিক সংস্থা নেই। ফিফার নিজস্ব বিচার ব্যবস্থা আছে।

ব্যবস্থা। 'অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড' -এর কুইন অফ হার্টস-এর মতো , ফিফার এই অন্যায্য ব্যবস্থা আগে শাস্তি দেয় এবং পরে বিচার করে, ফলে সবকিছু ধামাচাপা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে।



পেশাদার ফুটবল আইনের পরিধির বাইরে, এক পবিত্র পরিসরে পরিচালিত হয়, যেখানে এটি নিজের আইন নিজেই প্রণয়ন করতে পারে এবং অন্য সব আইন উপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু আইনই বা ফুটবলের পরিধির বাইরে থাকবে কেন? বিচারকরা বড় ক্লাবগুলোকে সরকারি কোষাগারে অবৈধ গোল করার জন্য এবং পরিচ্ছন্ন খেলার নিয়মকানুনকে মাটিতে ফেলে রাখার জন্য কারচুপি করার দায়ে খুব কমই লাল কার্ড দেখানোর সাহস করেন। আসল সত্যিটা হলো, বিচারকরা জানেন যে কঠোর হস্তে কাজ করলে তাদের কঠোর সমালোচনার মুখে পড়তে হবে।

পেশাদার ফুটবল অস্পৃশ্য, কারণ এটি জনপ্রিয়। ভক্তরা বলে, "পরিচালকেরা আমাদের জন্য চুরি করে," এবং তারা এটা বিশ্বাসও করে।

কিছু বিচারক দায়মুক্তির ঐতিহ্যকে অগ্রাহ্য করতে প্রস্তুত, এবং সাম্প্রতিক কেলেঙ্কারিগুলো বিশ্বের কয়েকটি ধনী গোষ্ঠীর নিয়মিত আর্থিক কসরত ও প্রতারণামূলক কার্যকলাপের ওপর কিছুটা আলোকপাত করেছে।

১৯৯৩ সালে যখন ইতালীয় ক্লাব পেরুজার সভাপতির বিরুদ্ধে রেফারি কেনার অভিযোগ ওঠে, তখন তিনি পাল্টা অভিযোগ করে বলেন, "ফুটবলের আশি শতাংশই দুর্নীতিগ্রস্ত।"

বিশেষজ্ঞরা একমত যে তিনি উদারতা দেখাচ্ছিলেন। উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত, মিলান ও তোরিনো থেকে শুরু করে নাপোলি ও কাগলিয়ারি পর্যন্ত ইতালির প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ক্লাবই জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত; কোনোটা বেশি, কোনোটা কম। তাদের জাল ব্যালেন্স শিট তাদের মূলধনের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি ঋণ গোপন করে; পরিচালকরা গোপন তহবিল, ভুয়া কোম্পানি এবং গোপন সুইস অ্যাকাউন্ট বজায় রাখে; কর এবং সামাজিক সুরক্ষার পরিবর্তে তারা এমন পরিষেবার জন্য মোটা অঙ্কের বিল পরিশোধ করে যা তারা প্রদানই করেনি; এবং খেলোয়াড়রা হিসাবের খাতায় দেখানো অর্থের চেয়ে অনেক কম টাকা পকেটস্থ করে, কারণ সেই টাকা পথেই হারিয়ে যায়।

ফ্রান্সের সবচেয়ে সুপরিচিত ক্লাবগুলোর মধ্যে একই ধরনের কৌশল প্রচলিত। বোর্দোর বেশ কয়েকজন পরিচালকের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কাজে তহবিল তছরুপের অভিযোগ আনা হয়েছিল এবং অলিম্পিক ডি মার্সেইয়ের শীর্ষ কর্তাদের প্রতিপক্ষকে ঘুষ দেওয়ার জন্য আদালতে তোলা হয়েছিল। ফ্রান্সের সবচেয়ে শক্তিশালী ক্লাব অলিম্পিক দ্বিতীয় বিভাগে নেমে যায় এবং ফ্রান্স ও ইউরোপের চ্যাম্পিয়ন খেতাব হারায়, যখন ১৯৯৩ সালে একটি ম্যাচের ঠিক আগে এর পরিচালকরা ভ্যালেন্সিয়েন্সের বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়কে ঘুষ দেওয়ার সময় ধরা পড়েন। সেই ঘটনাটি ব্যবসায়ী বার্নার্ড তাপিয়ের ক্রীড়াজীবন ও রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার ইতি ঘটায়, যার জন্য তিনি এক বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং শেষ পর্যন্ত দেউলিয়া হয়ে যান।

একই সময়ে, পোল্যান্ডের চ্যাম্পিয়ন ক্লাব লেগিয়া দুটি ম্যাচ 'সাজানো'র দায়ে তাদের শিরোপা হারায় এবং ইংল্যান্ডের টটেনহ্যাম হটস্পার জানায় যে নটিংহ্যাম ফরেস্ট থেকে একজন খেলোয়াড় পাওয়ার জন্য তাদেরকে গোপনে অর্থ প্রদানের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। এদিকে, ইংলিশ ক্লাব লুটনের বিরুদ্ধে কর ফাঁকির অভিযোগে তদন্ত চলছিল।

ব্রাজিলে একই সাথে বেশ কয়েকটি ফুটবল কেলেঙ্কারি ঘটে। বোটাফোগোর সভাপতি অভিযোগ করেন যে, ব্রাজিলের পেশাদার লীগের পরিচালকেরা ১৯৯৩ সালে সাতটি ম্যাচে কারচুপি করে বাজি ধরে বিপুল পরিমাণ অর্থ জিতেছিলেন। সাও পাওলোতে অন্যান্য মামলায় প্রকাশ পায় যে, স্থানীয় ফুটবল ফেডারেশনের একজন প্রধান রাতারাতি ধনী হয়ে গিয়েছিলেন, এবং কিছু ভুয়া অ্যাকাউন্ট পরীক্ষা করে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, খেলাধুলার মতো মহৎ পেশায় জীবন উৎসর্গ করার ফলে তার এই আকস্মিক সম্পদ অর্জিত হয়নি। যেন এটাই যথেষ্ট ছিল না, টেলিভিশন সম্প্রচার স্বত্ব বিক্রির ক্ষেত্রে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে পেলে ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের সভাপতি রিকার্ডো টেক্সেইরার বিরুদ্ধে মামলা করেন। পেলের মামলার জবাবে হ্যাভেলাঞ্জ তার জামাতা টেক্সেইরাকে ফিফা বোর্ডে নিযুক্ত করেন।

এই সবকিছুর প্রায় দুই হাজার বছর আগে, বাইবেলের যে ধর্মগুরু প্রেরিতদের কার্যবিবরণী গ্রন্থটি লিখেছিলেন, তিনি আনানিয়াস ও তার স্ত্রী সাফিরা নামক দুজন আদি খ্রিস্টানের গল্প বলেছিলেন, যারা এক খণ্ড জমি বিক্রি করে দাম নিয়ে মিথ্যা বলেছিল। ঈশ্বর যখন এই কথা জানতে পারলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাদের হত্যা করলেন।

ঈশ্বরের যদি ফুটবলের জন্য সময় থাকত, তাহলে কতজন পরিচালক বেঁচে থাকতেন?





১৯৯৪ বিশ্বকাপ

টি চিয়াপাসের মায়ারা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল, আসল মেক্সিকো বিস্ফোরিত হচ্ছিল। সরকারি মেক্সিকোর সামনে, এবং সাবকমান্ডান্তে মার্কোস ছিলেন তাঁর রসবোধ ও প্রেমময় কথায় বিশ্বকে বিস্মিত করেছেন।

আত্মার অন্ধকার দিক নিয়ে লেখা উপন্যাসের লেখক ওনেত্তি মৃত্যুশয্যায় ছিলেন। বিশ্ব গাড়ি-দৌড় চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলিয়ান আইরটন সেনা ইউরোপের এক অনিরাপদ ট্র্যাকে নিহত হচ্ছিলেন। যুগোস্লাভিয়ার খণ্ড-বিখণ্ড অংশে সার্ব, ক্রোয়েট এবং মুসলিমরা একে অপরকে হত্যা করছিল। রুয়ান্ডাতেও একই ধরনের ঘটনা ঘটছিল, কিন্তু টেলিভিশন জাতিগোষ্ঠীর পরিবর্তে উপজাতিদের কথা বলছিল এবং ইঙ্গিত দিচ্ছিল যে এই সহিংসতা কৃষ্ণাঙ্গরা করে থাকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রক্তাক্ত আগ্রাসন ও নিষ্ফল দখলদারিত্বের চার বছর পর তোরিহোসের উত্তরাধিকারীরা পানামার নির্বাচনে জয়লাভ করছিলেন। মার্কিন সৈন্যরা সোমালিয়া থেকে সরে আসছিল, যেখানে তারা গুলির মাধ্যমে ক্ষুধার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল।
দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যান্ডেলাকে ভোট দিচ্ছিল। কমিউনিস্টরা, সমাজতন্ত্রী নামে নতুন নামকরণ হয়ে, লিথুয়ানিয়া, ইউক্রেন, পোল্যান্ড এবং হাঙ্গেরিতে সংসদীয় নির্বাচনে জয়লাভ করছিল; এই সব দেশই ততদিনে জেনে গিয়েছিল যে পুঁজিবাদেরও কিছু অসুবিধাজনক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কিন্তু মস্কোর প্রোগ্রেস পাবলিশার্স, যা একসময় মার্কস ও লেনিনের রচনাবলী প্রকাশ করত, এখন ' রিডার্স ডাইজেস্ট' প্রকাশ করছিল।
মিয়ামির নির্ভরযোগ্য সূত্রগুলো ফিদেল কাস্ত্রোর আসন্ন পতনের কথা ঘোষণা করছিল, এটা ছিল মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার।



দুর্নীতির কেলেঙ্কারি ইতালির রাজনৈতিক দলগুলোকে ধ্বংস করে দিচ্ছিল এবং সেই ক্ষমতার শূন্যস্থান পূরণ করছিলেন বেরলুসকোনি—সেই নব্য ধনী ব্যক্তি যিনি গণতান্ত্রিক বৈচিত্র্যের নামে টেলিভিশনের একনায়কতন্ত্র চালাতেন। বেরলুসকোনি ফুটবল স্টেডিয়াম থেকে চুরি করা একটি স্লোগান দিয়ে তার নির্বাচনী প্রচারণার চূড়ান্ত পর্যায় পার করছিলেন, আর ঠিক তখনই বেসবলের দেশ যুক্তরাষ্ট্রে পঞ্চদশ বিশ্বকাপ শুরু হয়ে গিয়েছিল।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম বিষয়টিকে তেমন পাত্তা দেয়নি, মোটামুটিভাবে বলেছিল: "এখানে ফুটবলই ভবিষ্যতের খেলা এবং তা চিরকালই থাকবে।" কিন্তু পাথর গলিয়ে দেওয়ার মতো প্রখর রোদ সত্ত্বেও স্টেডিয়ামগুলো কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। ইউরোপীয় টেলিভিশনকে খুশি করার জন্য বড় ম্যাচগুলো দুপুরে খেলা হতো, যেমনটা '৮৬ সালের কাপে মেক্সিকোতে হয়েছিল।

ইউরোপ থেকে তেরোটি, আমেরিকা থেকে ছয়টি এবং আফ্রিকা থেকে তিনটি দল অংশগ্রহণ করেছিল, সাথে ছিল দক্ষিণ কোরিয়া ও সৌদি আরব। ম্যাচ টাই হওয়া নিরুৎসাহিত করতে, প্রতিটি জয়ের জন্য দুই পয়েন্টের পরিবর্তে তিন পয়েন্ট দেওয়া হয়েছিল। আর সহিংসতা নিরুৎসাহিত করতে, রেফারিরা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি কঠোর ছিলেন এবং টুর্নামেন্ট জুড়ে সতর্কবার্তা ও বহিষ্কার জারি করছিলেন। প্রথমবারের মতো রেফারিরা রঙিন পোশাক পরেছিলেন এবং প্রথমবারের মতো প্রতিটি দলকে আহত গোলরক্ষকের পরিবর্তে তৃতীয় একজন বদলি খেলোয়াড় নামানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

ম্যারাডোনা তার শেষ বিশ্বকাপ খেলছিলেন এবং তা ছিল এক উৎসবের মতো, যতক্ষণ না দ্বিতীয় ম্যাচের পর পরীক্ষাগারে তার মূত্র পরীক্ষা করতে গিয়ে তিনি পরাজিত হন।
তাকে ছাড়া এবং গতিদানব কানিগিয়াকে ছাড়া আর্জেন্টিনা ভেঙে পড়ল।
নাইজেরিয়া কাপের সবচেয়ে বিনোদনমূলক ফুটবল খেলেছিল। স্টোইচকভের দল বুলগেরিয়া, ভয়ঙ্কর জার্মান দলকে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে দিয়ে চতুর্থ স্থান অর্জন করে। তৃতীয় স্থান পায় সুইডেন। ফাইনালে ইতালি ব্রাজিলের মুখোমুখি হয়েছিল। এটি ছিল একটি বিরক্তিকর, দীর্ঘায়িত ম্যাচ যা গোলশূন্যভাবে শেষ হয়, কিন্তু হাই তোলার ফাঁকে রোমারিও এবং বাজ্জিও ভালো ফুটবলের কিছু শিক্ষা দিয়েছিলেন। পেনাল্টি শুটআউটে ব্রাজিল ৩-২ গোলে জয়লাভ করে এবং বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের মুকুট পরেন।

এক আশ্চর্যজনক কাহিনী: ব্রাজিলই একমাত্র দেশ যা প্রতিটি বিশ্বকাপের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছে।

কাপ, একমাত্র দেশ হিসেবে চারবার জয়ী, সর্বাধিক ম্যাচ জয়ী এবং সর্বাধিক গোলদাতা।



'৯৪ কাপের সর্বোচ্চ গোলদাতাদের তালিকায় শীর্ষে ছিলেন বুলগেরিয়ার স্টয়চকভ ও রাশিয়ার সালেঙ্কো, প্রত্যেকে ছয়টি করে গোল করে। এরপরে ছিলেন ব্রাজিলের রোমারিও, ইতালির বাজ্জিও, সুইডেনের অ্যান্ডারসন এবং জার্মানির ক্লিন্সম্যান, প্রত্যেকে পাঁচটি করে গোল করে।

রোমারিও

এক ফ স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের কোন অংশ থেকে যে আসে কে জানে, বাঘটা আবির্ভূত হয়, ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলে, আর উধাও হয়ে যায়। খাঁচায় বন্দী গোলরক্ষক চোখের পলক ফেলারও সময় পায় না। রোমারিও একের পর এক গোল করে চলে:
হাফ-ভলি, বাইসাইকেল, অন দ্য ফ্লাই, ব্যানানা শট, ব্যাকহিল, টো পোক, সাইড ট্যাপ।

রোমারিও জাকারেজিনহো নামের এক বস্তিতে দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু শৈশব থেকেই তিনি তার জীবনে দেওয়া অসংখ্য অটোগ্রাফের জন্য প্রস্তুতি হিসেবে নিজের নাম লেখা অনুশীলন করতেন। বাধ্যতামূলক মিথ্যার মূল্য না দিয়েই তিনি খ্যাতির সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠেছিলেন: এই অতি দরিদ্র মানুষটি সবসময় যা ইচ্ছা তাই করার বিলাসিতা উপভোগ করতেন; তিনি ছিলেন রাতের এক বার-হপিং প্রেমিক, যিনি কী বলছেন তা না ভেবেই সবসময় নিজের মনের কথা বলে দিতেন।

এখন তার কাছে মার্সিডিজ-বেঞ্জ গাড়ির একটি সংগ্রহ এবং ২৫০ জোড়া জুতো আছে, কিন্তু তার সেরা বন্ধুরা এখনও সেই অমার্জিত প্রতারকদের দলটিই, যারা তার শৈশবে তাকে শিখিয়েছিল কীভাবে অর্থ উপার্জন করতে হয়।



ব্যাজিও

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আর কেউ ইতালীয়দের এর চেয়ে ভালো ফুটবল বা আলোচনার জন্য এর চেয়ে বেশি কিছু আমি উপহার দেয়নি। রবার্তো বাজিওর খেলা রহস্যময়: তার পা দুটো যেন নিজের ইচ্ছায় চলে, তার পা আপনাআপনি শট নেয়, তার চোখ গোল হওয়ার আগেই তা দেখতে পায়।

ব্যাজিও একটি বিশাল ঘোড়ার লেজের মতো, যা সাবলীল ঢেউয়ের মতো এগিয়ে যাওয়ার সময় প্রতিপক্ষকে ঝেড়ে ফেলে দেয়। প্রতিপক্ষরা তাকে হয়রান করে, কামড়ায়, সজোরে ঘুষি মারে।
ব্যাজিওর অধিনায়কের বাহুবন্ধনীর নিচে বৌদ্ধ বাণী লেখা আছে। বুদ্ধ আঘাত প্রতিহত করেন না, কিন্তু তা সহ্য করতে সাহায্য করেন। তাঁর অসীম প্রশান্তি থেকে, তিনি ব্যাজিওকে উল্লাস ও শিসধ্বনির কোলাহলের আড়ালে থাকা নীরবতা খুঁজে পেতেও সাহায্য করেন।







কয়েকটি সংখ্যা

বি ১৯৩০ থেকে ১৯৯৪ সালের মধ্যে আমেরিকা মহাদেশ আটটি বিশ্বকাপ জিতেছিল এবং ইউরোপ সাতবার জিতেছে। ব্রাজিল চারবার ট্রফি জিতেছে, আর্জেন্টিনা দুইবার, এবং উরুগুয়ে দুইবার। ইতালি ও জার্মানি প্রত্যেকে তিনবার করে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল; ইংল্যান্ড কেবল নিজেদের মাটিতে অনুষ্ঠিত কাপটিই জিতেছিল।

তবে, যেহেতু ইউরোপের দলগুলোই ছিল সংখ্যায় বিপুল, তাই তাদের সুযোগও ছিল দ্বিগুণ। পনেরোটি বিশ্বকাপে ইউরোপীয় দলগুলো জেতার ১৫৯টি সুযোগ পেয়েছিল, যেখানে আমেরিকার দলগুলো পেয়েছিল মাত্র সাতাত্তরটি সুযোগ। অধিকন্তু, রেফারিদের সিংহভাগই ছিলেন ইউরোপীয়।

বিশ্বকাপের বিপরীতে, আন্তঃমহাদেশীয় কাপ ইউরোপ ও আমেরিকার দলগুলোকে সমান সংখ্যক সুযোগ দিয়েছে। জাতীয় দলের পরিবর্তে ক্লাবগুলোর দ্বারা আয়োজিত এই টুর্নামেন্টগুলোতে, আমেরিকার দলগুলো বিশবার জিতেছে, যেখানে ইউরোপীয়রা জিতেছে তেরোবার।

বিশ্ব ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে অধিকারের এই অসমতার বিষয়ে গ্রেট ব্রিটেনের ঘটনাটি সবচেয়ে আশ্চর্যজনক। ছোটবেলায় আমাকে যেভাবে বোঝানো হয়েছিল, ঈশ্বর এক কিন্তু তিনি ত্রিত্ব: পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা।
আমি এটা কখনোই বুঝতে পারিনি। আর আমি এখনও বুঝি না কেন গ্রেট ব্রিটেন একটি দেশ হয়েও চারটি ভাগে বিভক্ত: ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, উত্তর আয়ারল্যান্ড এবং ওয়েলস, অথচ উদাহরণস্বরূপ স্পেন ও সুইজারল্যান্ডের মতো দেশগুলো বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত হওয়া সত্ত্বেও একটির বেশি নয়।

যাইহোক, ইউরোপের চিরাচরিত নিয়ন্ত্রণ ভেঙে পড়তে শুরু করেছে। ১৯৯৪ বিশ্বকাপ পর্যন্ত ফিফা বিশ্বের বাকি অংশ থেকে এক বা দুটি নামমাত্র দেশকে গ্রহণ করত, যেন তা বিশ্ব মানচিত্রকে কর দেওয়ার মতোই ছিল। '৯৮ বিশ্বকাপ থেকে অংশগ্রহণকারী দেশের সংখ্যা চব্বিশ থেকে বেড়ে বত্রিশ হবে। আমেরিকার তুলনায় ইউরোপ তার অন্যায্য অনুপাত বজায় রাখবে, কিন্তু তাকে কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকার দেশগুলোর বৃহত্তর অংশগ্রহণের মোকাবিলা করতে হবে, যাদের বিদ্যুৎগতি ও আনন্দময় ফুটবল এখন পূর্ণ প্রসার লাভ করছে। সেই সাথে আরব ও এশীয় দেশগুলোরও, যেমন চীন, যারা এই খেলার পথিকৃৎ হলেও এখন পর্যন্ত গ্যালারি থেকে তা দেখতে বাধ্য হয়েছে।

১৯৯৫ সালে এটি লেখার পর থেকে, ইউরোপ আরও তিনটি এবং আমেরিকা একটি শিরোপা জিতেছে, ফলে সামগ্রিকভাবে ইউরোপ ১০-৯ ব্যবধানে এগিয়ে আছে। ব্রাজিল এখন পর্যন্ত বিস্ময়করভাবে পাঁচবার এবং ইতালি চারবার এই ট্রফি জিতেছে। কিন্তু ভৌগোলিক অবিচার অব্যাহত রয়েছে: ফিফা আমেরিকার তুলনায় ইউরোপকে তিনগুণ বেশি স্থান বরাদ্দ করে চলেছে। ২০১৪ সালে, ব্রাজিলে অনুষ্ঠিতব্য ৩২টি দলের মধ্যে থাকবে ইউরোপ থেকে তেরোটি, দক্ষিণ আমেরিকা থেকে চার বা পাঁচটি, আফ্রিকা থেকে পাঁচটি, এশিয়া থেকে চার বা পাঁচটি, উত্তর ও মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান থেকে তিন বা চারটি, এবং ভাগ্য ভালো থাকলে, ওশেনিয়া থেকে একটি দল আসবে।



হেরে যাওয়ার কর্তব্য

এফ বলিভিয়ার জন্য '৯৪ বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করাটা ছিল চাঁদে পৌঁছানোর মতো। ভৌগোলিকভাবে আবদ্ধ এবং ইতিহাসের দ্বারা অবহেলিত হওয়ায়, দেশটি অন্যান্য বিশ্বকাপে কেবল আমন্ত্রণে অংশ নিয়েছিল এবং তার সবকিছু হারিয়েছিল।
ম্যাচগুলোতে একটিও গোল করতে ব্যর্থ।

ম্যানেজার শাবিয়ের আজকারগোরতার পরিশ্রম ফল দিচ্ছিল, শুধু লা পাজে নয়, যেখানে মেঘের উপরে খেলা হয়, বরং সমুদ্রপৃষ্ঠেও। বলিভিয়া প্রমাণ করছিল যে উচ্চতাই তাদের একমাত্র সেরা খেলোয়াড় নয়; দলটি সেইসব প্রতিবন্ধকতাও কাটিয়ে উঠতে পারে, যা ম্যাচ শুরু হওয়ার আগেই তাদের হেরে যেতে বাধ্য করত। বাছাইপর্বে বলিভিয়া ঝলমল করে উঠেছিল। মাঝমাঠে মেলগার ও বালদিভিয়েসো এবং ফরোয়ার্ডে সানচেজ ও সর্বোপরি ‘এল দিয়াবলো’ নামে পরিচিত এচেভেরি সবচেয়ে খুঁতখুঁতে দর্শকদের কাছ থেকেও উল্লাসধ্বনি পেয়েছিলেন।

দুর্ভাগ্যবশত, বলিভিয়াকে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচেই সর্বশক্তিমান জার্মানির মুখোমুখি হতে হয়েছিল। র‍্যাম্বোর বিরুদ্ধে যেন এক কড়ে আঙুল। কিন্তু এর ফলাফল কী হবে, তা কেউই আগে থেকে অনুমান করতে পারেনি: নিজেদের গুটিয়ে নেওয়ার পরিবর্তে, বলিভিয়া আক্রমণে গেল। তারা সমানে সমানে খেলেনি। না, তারা যেন ছোটদের বিরুদ্ধে বড়দের মতো খেলছিল। ছন্দ হারিয়ে জার্মানি উড়তে লাগল আর বলিভিয়া আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। আর এভাবেই খেলা চলতে থাকল, যতক্ষণ না বলিভিয়ার তারকা মার্কো আন্তোনিও এচেভেরি মাঠে নেমে অমার্জনীয়ভাবে ম্যাথিউসকে লাথি মেরে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লেন। তারপর বলিভিয়ানরা ভেঙে পড়ল, আর আফসোস করতে লাগল যে, শতাব্দীর গভীর থেকে নেমে আসা সেই গোপন অভিশাপের বিরুদ্ধে তারা কেন পাপ করল, যা তাদের হারতে বাধ্য করে।

হেরে যাওয়ার পাপ

এস ফুটবল তার দেবতাদের মহিমান্বিত করে এবং তাদেরকে প্রতিশোধের মুখে ঠেলে দেয়। বিশ্বাসীরা। পায়ে বল আর বুকে জাতীয় পতাকা নিয়ে,

যে খেলোয়াড় জাতির প্রতিমূর্তি, সে দূর রণক্ষেত্রে গৌরব অর্জনের জন্য যাত্রা করে। যদি সে পরাজিত হয়ে ফেরে, তবে সেই যোদ্ধা এক পতিত দেবদূতে পরিণত হয়।
১৯৫৮ সালে এজেইজা বিমানবন্দরে, সুইডেনে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে বাজে পারফরম্যান্সের পর ফেরা আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়দের দিকে লোকেরা পয়সা ছুঁড়েছিল। '৮২-এর কাপে, কাসেলি একটি পেনাল্টি কিক মিস করেন এবং চিলিতে তার জীবন দুর্বিষহ করে তোলা হয়েছিল। দশ বছর পর, মিশরের কাছে ৬-১ গোলে হেরে যাওয়ার পর বেশ কয়েকজন ইথিওপিয়ান খেলোয়াড় জাতিসংঘের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন।

আমরা জিতি বলেই আমাদের অস্তিত্ব। হেরে গেলে আমাদের আর কোনো অস্তিত্ব থাকে না। নিঃসন্দেহে, জাতীয় জার্সি সম্মিলিত পরিচয়ের সবচেয়ে স্পষ্ট প্রতীক হয়ে উঠেছে; শুধু সেইসব দরিদ্র বা ছোট দেশেই নয়, যাদের মানচিত্রে অবস্থান ফুটবলের ওপর নির্ভরশীল। ১৯৯৪ সালের বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে ইংল্যান্ড হেরে গেলে, লন্ডনের ' ডেইলি মিরর' -এর প্রথম পাতায় মহাবিপর্যয়ের উপযোগী বড় হরফে একটি শিরোনাম ছাপা হয়েছিল: "পৃথিবীর শেষ।"

ফুটবলে, অন্য সবকিছুর মতোই, হারার কোনো সুযোগ নেই। এই শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে, ব্যর্থতাই একমাত্র পাপ যা মোচন করা যায় না। '৯৪-এর কাপ চলাকালীন মুষ্টিমেয় কিছু উগ্রপন্থী পরাজিত ক্যামেরুনের গোলরক্ষক জোসেফ বেলের বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল এবং এর কিছুদিন পরেই মেডেলিনে কলম্বিয়ার খেলোয়াড় আন্দ্রেস এসকোবারকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এসকোবারের দুর্ভাগ্য ছিল যে তিনি একটি আত্মঘাতী গোল করেছিলেন, যা ছিল এক ক্ষমার অযোগ্য বিশ্বাসঘাতকতা।

আমরা কি ফুটবলকে দোষ দেব? নাকি সাফল্যের সংস্কৃতি এবং ক্ষমতার সেই পুরো ব্যবস্থাকে দোষ দেব, যা পেশাদার ফুটবল প্রতিফলিত করে? ফুটবল স্বভাবগতভাবে কোনো সহিংস খেলা নয়, যদিও মাঝে মাঝে এটি মনের ক্ষোভ প্রকাশের একটি মাধ্যম হয়ে ওঠে। এটা কোনো কাকতালীয় ঘটনা ছিল না যে এসকোবারের হত্যাকাণ্ডটি পৃথিবীর অন্যতম সহিংস একটি দেশে সংঘটিত হয়েছিল। সহিংসতা এই মানুষদের জিনে নেই, যারা পার্টি করতে ভালোবাসে এবং সঙ্গীত ও ফুটবলের আনন্দে উন্মত্ত। কলম্বিয়ানরা সহিংসতার কারণে একটি রোগের মতো ভোগে, কিন্তু তারা এটিকে কপালে জন্মদাগের মতো ধারণ করে না। অন্যদিকে, ক্ষমতার কলকাঠি অবশ্যই সহিংসতার একটি কারণ। সমগ্র লাতিন আমেরিকার মতোই,

বিচারহীনতার এমন এক ঐতিহ্যের অধীনে অবিচার ও অপমান মানুষের আত্মাকে বিষিয়ে তোলে, যা বিবেকহীনদের পুরস্কৃত করে, অপরাধকে উৎসাহিত করে এবং একে একটি জাতীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে।



'৯৪ কাপ শুরু হওয়ার কয়েক মাস আগে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে, যা অনুসারে ১৯৯৩ সালে সশস্ত্র বাহিনী এবং তাদের আধাসামরিক মিত্ররা শত শত কলম্বীয়কে যথাযথ বিচার প্রক্রিয়া ছাড়াই মৃত্যুদণ্ড দেয়। এই বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকারদের অধিকাংশই ছিলেন এমন ব্যক্তি যাদের কোনো পরিচিত রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছিল না।

অ্যামনেস্টির প্রতিবেদনে 'সামাজিক শুদ্ধি অভিযান'-এ কলম্বিয়ার পুলিশের ভূমিকাও উন্মোচিত হয়েছে, যা সমকামী, যৌনকর্মী, মাদকাসক্ত, ভিক্ষুক, মানসিক রোগী এবং পথশিশুদের পরিকল্পিতভাবে নির্মূল করার একটি মার্জিত শব্দ। সমাজ তাদের 'ব্যবহারের পর ফেলে দেওয়ার যোগ্য' বা 'মানব আবর্জনা' বলে ডাকে, যাদের মরে যাওয়াই উচিত।

ব্যর্থতাকে শাস্তি দেয় এমন এই পৃথিবীতে তারাই চিরস্থায়ী পরাজিত।



ম্যারাডোনা

এইচ সে খেললে জিতত; সে প্রস্রাব করলে হারত। এফেড্রিন তার মধ্যে হাজির হল। মূত্র পরীক্ষা এবং ম্যারাডোনাকে ১৯৯৪ সালের বিশ্বকাপ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য অনেক দেশের পেশাদার ক্রীড়া জগতে এফেড্রিনকে উত্তেজক হিসেবে গণ্য করা না হলেও, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় এটি নিষিদ্ধ।

বিস্ময় আর কেলেঙ্কারির সৃষ্টি হয়েছিল, নৈতিক নিন্দার এমন এক বিস্ফোরণ যা গোটা বিশ্বকে বধির করে দিয়েছিল। কিন্তু কোনোভাবে সেই পতনোন্মুখ তারকার প্রতি সমর্থনের কয়েকটি কণ্ঠস্বর ঠিকই শোনা গিয়েছিল, শুধু তার আহত ও হতবাক আর্জেন্টিনাতেই নয়, বাংলাদেশের মতো সুদূর জায়গাতেও, যেখানে ফিফাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং ম্যারাডোনার প্রত্যাবর্তনের দাবিতে এক বিশাল বিক্ষোভ রাজপথ কাঁপিয়ে দিয়েছিল। সর্বোপরি, বিচার করা এবং নিন্দা করা সহজ ছিল। এটা ভুলে যাওয়া অত সহজ ছিল না যে, বহু বছর ধরে ম্যারাডোনা সেরা হওয়ার পাপ করেছিলেন, ক্ষমতাধররা যা চাপা দিতে চেয়েছিল সে বিষয়ে মুখ খোলার অপরাধ করেছিলেন, এবং বাঁ হাতে খেলার মতো গুরুতর অপরাধ করেছিলেন, যার অর্থ অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি অনুসারে শুধু "বাম হাতের বা বাম হাত সম্পর্কিত" নয়, বরং "অশুভ বা প্রশ্নবিদ্ধ"ও বটে।

দিয়েগো আরমান্দো মারাদোনা ম্যাচের আগে নিজের শারীরিক ক্ষমতার সীমা পরীক্ষা করার জন্য কখনো উত্তেজক দ্রব্য ব্যবহার করতেন না। এটা সত্যি যে তিনি কোকেনে আসক্ত ছিলেন, কিন্তু তা কেবল বিষণ্ন পার্টিতে, যেখানে তিনি সবকিছু ভুলে যেতে বা বিস্মৃত হতে চাইতেন। কারণ তিনি খ্যাতির দ্বারা কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন এবং সেই খ্যাতি ছাড়া বাঁচতে পারতেন না, যা তাঁকে শান্তিতে থাকতে দিত না। তিনি কোকেনের কারণে নয়, বরং কোকেন থাকা সত্ত্বেও অন্য সবার চেয়ে ভালো খেলতেন।

নিজের ব্যক্তিত্বের ভারে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। সেই বহু পুরোনো দিনের পর থেকে, যেদিন ভক্তরা প্রথম তাঁর নাম ধরে স্লোগান দিয়েছিল, তাঁর মেরুদণ্ড তাঁকে যন্ত্রণা দিত। ম্যারাডোনা নামের এক বোঝা ম্যারাডোনা বয়ে বেড়াতেন, যা তাঁর পিঠকে বেঁকে দিয়েছিল। শরীর যেন এক রূপক: তাঁর পায়ে ব্যথা করত, ওষুধ ছাড়া তিনি ঘুমাতে পারতেন না। মাঠে দেবতা হওয়ার দায়িত্ব নিয়ে বেঁচে থাকা যে অসম্ভব, তা বুঝতে তাঁর বেশি সময় লাগেনি, কিন্তু শুরু থেকেই তিনি জানতেন যে থেমে যাওয়াটা অসম্ভব। "আমি চাই যেন তাদের আমাকে প্রয়োজন হয়," অতিমানবীয় পারফরম্যান্সের স্বৈরাচারী বলয়ের নিচে বহু বছর বেঁচে থাকার পর তিনি স্বীকার করেছিলেন; কর্টিসোন, ব্যথানাশক আর প্রশংসায় ফুলেফেঁপে ওঠা, ভক্তদের দাবি এবং যাদের তিনি আঘাত করেছিলেন তাদের ঘৃণায় জর্জরিত হয়ে।

প্রতিমা ভাঙার আনন্দ, তা গড়ার প্রয়োজনের সাথে সরাসরি সমানুপাতিক। স্পেনে, যখন গোইকোয়েচিয়া তাকে পেছন থেকে আঘাত করেন—যদিও তার কাছে বল ছিল না—এবং তাকে বেশ কয়েক মাসের জন্য মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দেন, তখন কিছু উগ্র সমর্থক এই পূর্বপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের হোতাকে নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছিল।

আর সারা বিশ্বজুড়ে বহু মানুষ সেই উদ্ধত অনুপ্রবেশকারী, ক্ষুধার তাড়নায় পলাতক সেই নব্য ধনী, সেই তেলবাজের পতন উদযাপন করতে প্রস্তুত ছিল, যার দম্ভভরে দম্ভ করার ও বড়াই করার দুঃসাহস ছিল।



পরবর্তীকালে নেপলসে ম্যারাডোনা সান্তা ম্যারাডোনা নামে পরিচিত হন এবং পৃষ্ঠপোষক সাধু সান জেনারো সান জেনারমান্দো হয়ে ওঠেন। রাস্তায় তারা এই দেবতার ছবি বিক্রি করত, যেখানে তিনি ভার্জিনের জ্যোতির্বলয়ে উদ্ভাসিত হাফপ্যান্ট পরিহিত থাকতেন অথবা সেই সাধুর পবিত্র চাদরে আবৃত থাকতেন, যাঁর প্রতি ছয় মাস অন্তর রক্তস্রাব হয়।

তারা এমনকি উত্তর ইতালির ক্লাবগুলোর জন্য কফিন এবং সিলভিও বেরলুসকোনির চোখের জলে ভরা ছোট ছোট বোতলও বিক্রি করত। বাচ্চারা আর কুকুরেরা ম্যারাডোনার পরচুলা পরত।
কেউ দান্তের মূর্তির পায়ের নিচে একটি বল রেখেছিল, এবং বিখ্যাত ফোয়ারাটিতে ট্রাইটন নাপোলির নীল জার্সি পরেছিল। ভিসুভিয়াসের রোষ আর ফুটবল মাঠে চিরস্থায়ী পরাজয়ের শিকার হতে অভিশপ্ত এই শহরটি শেষবার চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিল অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় পর, এবং ধন্যবাদ

ম্যারাডোনার কাছে, অবশেষে সেই কৃষ্ণবর্ণ দক্ষিণাঞ্চল তাকে অবজ্ঞা করা শ্বেতবর্ণ উত্তরাঞ্চলকে অপমান করতে সক্ষম হলো। ইতালি এবং সমগ্র ইউরোপের স্টেডিয়ামগুলোতে নাপোলি একের পর এক কাপ জিতেই চলল, এবং প্রতিটি গোল ছিল প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার অবমাননা ও ইতিহাসের বিরুদ্ধে এক প্রতিশোধ। মিলানে তারা এই উদ্ধত দরিদ্রদের দ্বারা করা অপমানের জন্য দায়ী লোকটিকে ঘৃণা করত: তারা তাকে "কোঁকড়ানো চুলের হ্যাম" বলে ডাকত। আর শুধু মিলানেই নয়: ১৯৯০ সালের বিশ্বকাপে বেশিরভাগ দর্শক ম্যারাডোনা যখনই বল স্পর্শ করতেন, তখনই প্রচণ্ড শিস দিয়ে তাকে শাস্তি দিত, এবং জার্মানির কাছে আর্জেন্টিনার পরাজয়কে ইতালির বিজয় হিসেবে উদযাপন করত।

যখন ম্যারাডোনা বললেন যে তিনি নেপলস ছেড়ে যেতে চান, তখন কিছু লোক তার জানালায় পিন বিদ্ধ মোমের পুতুল ছুঁড়ে মারল। যে শহর তাকে পূজা করত, এবং শহরটির মালিক মাফিয়া কামোরার হাতে বন্দী হয়ে তিনি খেলছিলেন নিজের হৃদয়ের বিরুদ্ধে, নিজের পায়ের বিরুদ্ধে। ঠিক তখনই কোকেন কেলেঙ্কারি ফাঁস হলো, এবং ম্যারাডোনা হঠাৎ করেই হয়ে গেলেন মারাকোকা—এমন এক অপরাধী, যে কিনা মানুষকে বোকা বানিয়েছিল নিজেকে নায়ক হিসেবে।



পরে বুয়েনস আইরেসে গণমাধ্যম আগুনে ঘি ঢালে: তার গ্রেপ্তারের সরাসরি সম্প্রচার, যেন তা ছিল একটি ম্যাচ; যা দেখে সেইসব লোকেরা আনন্দ পায়, যারা একজন রাজাকে বিবস্ত্র করে পুলিশের হাতে তুলে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখতে ভালোবাসে।

তারা বলল, "সে অসুস্থ।" তারা বলল, "তার খেলা শেষ।" যে ত্রাণকর্তা দক্ষিণ ইতালীয়দের তাদের চিরস্থায়ী অভিশাপ থেকে মুক্তি দিতে এসেছিলেন, তিনিই আবার ফকল্যান্ডে আর্জেন্টিনার পরাজয়ের প্রতিশোধকও ছিলেন—একটি চতুর গোল এবং আরেকটি অসাধারণ গোলের মাধ্যমে, যা ইংরেজদের বেশ কয়েক বছর ধরে লাটুর মতো ঘুরিয়ে রেখেছিল। কিন্তু যখন তার পতন ঘটল, সেই 'সোনালী ছেলে' তখন এক অসাড় নাক ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

লম্পট ভণ্ড। ম্যারাডোনা তাকে পূজা করা সন্তানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এবং খেলাটির জন্য কলঙ্ক বয়ে এনেছিল। তারা তাকে মৃত বলে ধরে নিয়েছিল।

কিন্তু শরীরটা আবার সচল হলো। কোকেনের সাজা খেটে বেরোনোর পর ম্যারাডোনা আর্জেন্টিনা দলের ফায়ারম্যানের ভূমিকা নিলেন, যে দলটি '৯৪ বিশ্বকাপে পৌঁছানোর শেষ সুযোগগুলো কাজে লাগাচ্ছিল। ম্যারাডোনার বদৌলতে তারা সফল হয়েছিল। আর বিশ্বকাপে, পুরনো দিনের মতোই, এফেড্রিন কেলেঙ্কারি ফাঁস হওয়ার আগ পর্যন্ত ম্যারাডোনাই ছিলেন সেরাদের সেরা।

ক্ষমতার কলকাঠি তাকে শেষ করে দেওয়ার শপথ নিয়েছিল। তিনি ক্ষমতার কাছে সত্য কথা বলেছিলেন এবং তার জন্য মূল্য দিতে হয়, এমন এক মূল্য যা কোনো ছাড় ছাড়াই নগদে পরিশোধ করতে হয়। আর ম্যারাডোনা নিজেই তাদের সেই অজুহাতটা জুগিয়ে দিয়েছিলেন—তার অসংখ্য শত্রুর কাছে নিজেকে থালায় সাজিয়ে দেওয়ার আত্মঘাতী প্রবণতা এবং সেই ছেলেমানুষি দায়িত্বজ্ঞানহীনতার মাধ্যমে, যা তাকে পথের প্রতিটি ফাঁদে পা দিতে বাধ্য করে।

সেই সাংবাদিকরাই, যারা তাদের মাইক্রোফোন দিয়ে তাকে বিরক্ত করে, তার ঔদ্ধত্য ও খামখেয়ালিপনার জন্য তিরস্কার করে এবং বেশি কথা বলার জন্য তাকে অভিযুক্ত করে।
তারা ভুল নয়, কিন্তু সে কারণে তারা তাকে ক্ষমা করতে পারে না, তা নয়। তারা যা সত্যিই সহ্য করতে পারে না, তা হলো তার বলা কিছু কথা। এই বদমেজাজি, অল্পবুদ্ধির মানুষটির কড়া জবাব দেওয়ার অভ্যাস আছে। '৮৬ এবং '৯৪ সালে, মেক্সিকো এবং যুক্তরাষ্ট্রে, সে টেলিভিশনের সর্বশক্তিমান একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল, যা খেলোয়াড়দের দুপুরে প্রখর রোদে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে বাধ্য করত। এবং তার ক্যারিয়ারের উত্থান-পতনের মধ্যে আরও হাজারো বার, ম্যারাডোনা এমন সব কথা বলেছেন যা হুলুস্থুল ফেলে দিয়েছে। সে-ই একমাত্র অবাধ্য খেলোয়াড় ছিল না, কিন্তু তার কণ্ঠেই সবচেয়ে আপত্তিকর প্রশ্নগুলো জোরালো ও স্পষ্টভাবে প্রতিধ্বনিত হতো: ফুটবলের ক্ষেত্রে শ্রম অধিকারের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড কেন প্রয়োগ করা হয় না? যদি শিল্পীদের জন্য তাদের শো থেকে কত টাকা আয় হয় তা জানা একটি সাধারণ বিষয় হয়, তাহলে ফুটবলের এই বিলাসবহুল বহুজাতিক কোম্পানির হিসাবের খাতা খেলোয়াড়রা কেন দেখতে পাবে না? অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকায় হ্যাভেলাঞ্জ চুপ করে ছিলেন, অন্যদিকে ফিফার আমলা জোসেফ ব্লাটার—যিনি জীবনে একবারও ফুটবল খেলেননি কিন্তু একজন কৃষ্ণাঙ্গ চালকের চালানো পঁচিশ ফুটের লিমুজিনে ঘুরে বেড়ান—মাত্র একটিই মন্তব্য করেছিলেন: "আর্জেন্টিনার শেষ তারকা ছিলেন ডি স্টেফানো।"

যখন ম্যারাডোনাকে অবশেষে '৯৪ বিশ্বকাপ থেকে বের করে দেওয়া হলো, ফুটবল তার সবচেয়ে সোচ্চার বিদ্রোহীকে হারালো। এবং সেই সাথে একজন অসাধারণ খেলোয়াড়কেও। ম্যারাডোনা কথা বলার সময় অনিয়ন্ত্রিত, কিন্তু খেলার সময় আরও বেশি। কম্পিউটারকে বিভ্রান্ত করার সাধারণ আনন্দের জন্য বিস্ময়ের এই উদ্ভাবক যে শয়তানি কৌশলগুলো উদ্ভাবন করবেন, তা কেউ অনুমান করতে পারে না; এমন কৌশল যা তিনি আর কখনও পুনরাবৃত্তি করেন না।

সে ততটা দ্রুত নয়, বরং খাটো পায়ের ষাঁড়ের মতো, কিন্তু বলটা যেন তার পায়ের সাথে সেলাই করা এবং তার সারা শরীর জুড়ে যেন চোখ। তার অ্যাক্রোব্যাটিক্স মাঠকে আলোকিত করে তোলে।

গোলপোস্টের দিকে পিঠ দিয়েও তিনি বজ্রের মতো গর্জন করে ম্যাচ জেতাতে পারেন, কিংবা হাজার হাজার প্রতিপক্ষের পায়ের চাপে ঘেরাও হয়েও দূর থেকে এক অসম্ভব পাস দিয়ে। আর যখন তিনি ড্রিবল করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাঁকে কেউ থামাতে পারে না।

আজকের এই হিমশীতল ফুটবল জগতে, যা পরাজয়কে ঘৃণা করে এবং সব ধরনের আনন্দ নিষিদ্ধ করে, সেই মানুষটি ছিলেন হাতেগোনা কয়েকজনের একজন, যিনি প্রমাণ করেছিলেন যে কল্পনাও কার্যকর হতে পারে।



তাদের গণনা করা হয় না

1994 সালের শেষের দিকে, ম্যারাডোনা, স্টোইচকভ, বেবেতো, ফ্রান্সস্কোলি,
একটি লড্রুপ, জামোরানো, হুগো সানচেজ এবং অন্যান্য খেলোয়াড়রা শুরু করেছিলেন
একটি আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলোয়াড় ইউনিয়ন গঠন করা।

এখন পর্যন্ত, ক্ষমতার সেই কাঠামোগুলো থেকে অনুষ্ঠানের তারকারা পুরোপুরি অনুপস্থিত, যেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। স্থানীয় ফুটবলের ব্যবস্থাপনায় তাদের কোনো বক্তব্য নেই, আর ফিফার সর্বোচ্চ স্তরে, যেখানে বৈশ্বিক সম্পদের ভাগাভাগি হয়, সেখানেও নিজেদের কথা শোনানোর বিলাসিতা তারা উপভোগ করতে পারে না।

খেলোয়াড়রা কারা? সার্কাসের বানর? তারা রেশমের পোশাক পরতে পারে, কিন্তু তারা কি বানরই নয়? কখন, কোথায় এবং কীভাবে তারা খেলবে, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের সাথে কখনোই পরামর্শ করা হয় না। আন্তর্জাতিক আমলাতন্ত্র নিজের খেয়ালখুশিমতো নিয়ম বদলে দেয়, খেলোয়াড়দের কোনো কথাই চলে না। তাদের পা থেকে কত টাকা আয় হয়, বা সেই পলাতক সম্পদ শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে পৌঁছায়, সেটাও তারা জানতে পারে না।

স্থানীয় ইউনিয়নগুলোর বহু বছরের ধর্মঘট ও বিক্ষোভের পর খেলোয়াড়রা আরও ভালো চুক্তি আদায় করে নিয়েছে, কিন্তু ফুটবলের ব্যবসায়ীরা তাদের সাথে কেনা-বেচা ও ধার দেওয়ার যন্ত্রের মতোই আচরণ করে চলেছে: "ম্যারাডোনা একটি বিনিয়োগ," নাপোলির প্রেসিডেন্ট বলতে ভালোবাসতেন।

এখন ইউরোপীয় ক্লাবগুলোতে, সেইসাথে কয়েকটি লাতিন আমেরিকান ক্লাবেও, কারখানার মতোই মনোবিজ্ঞানী নিযুক্ত আছেন। পরিচালকেরা তাদের সমস্যাগ্রস্তদের সাহায্য করার জন্য বেতন দেন না, বরং যন্ত্রপাতির কার্যকারিতা সচল রাখতে এবং উৎপাদনশীলতা বাড়াতে দেন। ক্রীড়াক্ষেত্রের উৎপাদনশীলতা? শ্রম উৎপাদনশীলতা, যদিও এক্ষেত্রে নিযুক্ত কর্মীরা আসলে নিযুক্ত পা। আসল ব্যাপার হলো, পেশাদার খেলোয়াড়রা তাদের শ্রমশক্তি প্রদান করে।

মজুরির বিনিময়ে প্রদর্শনীর কারখানায়। দাম নির্ভর করে পারফরম্যান্সের ওপর, এবং তারা যত বেশি পারিশ্রমিক পায়, তাদের কাছ থেকে তত বেশি উৎপাদনের প্রত্যাশা করা হয়। জেতার জন্য বা জেতার জন্যই তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, শেষ ক্যালোরি পর্যন্ত নিংড়ে নেওয়া হয়, তাদের সাথে রেসের ঘোড়ার চেয়েও খারাপ আচরণ করা হয়। রেসের ঘোড়া? ব্রিটিশ খেলোয়াড় পল গ্যাসকোইন নিজেকে কারখানায় পালিত মুরগির সাথে তুলনা করতে পছন্দ করেন: নিয়ন্ত্রিত গতিবিধি, কঠোর নিয়ম, নির্দিষ্ট আচরণ যা অবশ্যই সর্বদা পুনরাবৃত্তি করতে হবে।

তারকারা তাদের ক্ষণস্থায়ী জাঁকজমক থাকাকালে সর্বোচ্চ বেতন উপার্জন করতে পারেন। ক্লাবগুলো এখন তাদের বিশ বা ত্রিশ বছর আগের চেয়ে অনেক বেশি বেতন দেয় এবং তারা বিজ্ঞাপনের জন্য নিজেদের নাম ও চেহারা বিক্রি করতে পারে। কিন্তু ফুটবলের এই গৌরবময় তারকারা মানুষের কল্পনার মতো কিংবদন্তিতুল্য ধন-সম্পদ দিয়ে পুরস্কৃত হন না। ফোর্বস ম্যাগাজিন ১৯৯৪ সালে বিশ্বের সর্বোচ্চ উপার্জনকারী চল্লিশজন ক্রীড়াবিদের একটি তালিকা প্রকাশ করেছিল। তাদের মধ্যে ছিলেন একমাত্র ফুটবল খেলোয়াড়, ইতালীয় রবার্তো বাজ্জিও, এবং তিনি তালিকার প্রায় শেষের দিকে ছিলেন।

আর সেই হাজার হাজার খেলোয়াড়ের কী হবে যারা তারকা নন?
যারা খ্যাতির রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না, যারা এই ঘূর্ণায়মান দরজার মধ্যে কেবল ঘুরতেই আটকে থাকে? আর্জেন্টিনার প্রতি দশজন পেশাদার ফুটবল খেলোয়াড়ের মধ্যে মাত্র তিনজন এটি থেকে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। বেতন খুব বেশি নয়, বিশেষ করে একজন সক্রিয় খেলোয়াড়ের কর্মজীবনের স্বল্পস্থায়ীত্বের কথা বিবেচনা করলে: এই আত্মঘাতী শিল্প সভ্যতা নিমিষেই তাদের গ্রাস করে ফেলে।

২০১২ সালে চারজন ফুটবল তারকা ফোর্বসের শীর্ষ চল্লিশে জায়গা করে নেন : ডেভিড বেকহ্যাম (#৮), ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো (#৯), লিওনেল মেসি (#১১) এবং ওয়েন রুনি (#৩৮)। এই কয়েকজন কোটিপতি ব্যতিক্রম, যা নিয়মটিকেই প্রমাণ করে।



একটি রপ্তানি শিল্প

এইচ এখানে দক্ষিণাঞ্চল থেকে একজন খেলোয়াড়ের ভ্রমণসূচী দেওয়া হল যার পা দুটো ভালো এবং ভাগ্যও ভালো, এমন এক বিশ্ব। তার নিজ শহর থেকে সে প্রথমে এক প্রাদেশিক শহরে চলে যায়, তারপর সেখান থেকে দেশের রাজধানীর একটি ছোট ক্লাবে। ছোট ক্লাবটির তাকে একটি বড় ক্লাবের কাছে বিক্রি করে দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। ঋণের ভারে জর্জরিত হয়ে বড় ক্লাবটি তাকে আরও বড় একটি দেশের আরও বড় একটি ক্লাবের কাছে বিক্রি করে দেয়। আর খেলোয়াড়টি ইউরোপে তার ক্যারিয়ারের শিখরে পৌঁছায়।

এই পুরো শৃঙ্খল জুড়েই ক্লাব, ঠিকাদার এবং মধ্যস্থতাকারীরা টাকার সিংহভাগ হাতিয়ে নেয়। দরিদ্র দেশগুলোর পাড়া-মহল্লার ক্লাবগুলোর শোচনীয় অবস্থা থেকে শুরু করে ইউরোপীয় লীগ পরিচালনাকারী কর্পোরেশনগুলোর সর্বময় ক্ষমতা পর্যন্ত, এই শৃঙ্খলের প্রতিটি ধাপই পক্ষগুলোর মধ্যে বৈষম্যকে নিশ্চিত ও স্থায়ী করে তোলে।

উদাহরণস্বরূপ, উরুগুয়েতে ফুটবল একটি রপ্তানি শিল্প, যা দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারকে অবজ্ঞা করে। ভালো খেলোয়াড়দের ক্রমাগত দেশত্যাগের ফলে পেশাদার লিগগুলো মাঝারি মানের হয়ে যায় এবং সমর্থকের সংখ্যাও ক্রমশ কমে আসে ও তাদের উৎসাহও হ্রাস পায়। মানুষ স্টেডিয়াম ছেড়ে টেলিভিশনে বিদেশি ম্যাচ দেখতে চলে যায়। যখন বিশ্বকাপ আসে, আমাদের খেলোয়াড়রা পৃথিবীর চার কোণ থেকে আসে, বিমানে তাদের দেখা হয়, অল্প কিছুক্ষণ একসাথে খেলে এবং একে অপরকে বিদায় জানায়; একটি সত্যিকারের দল হিসেবে—এগারোটি মাথা, বাইশটি পা এবং একটিমাত্র হৃদয়—একত্রিত হওয়ার জন্য তারা কখনোই যথেষ্ট সময় পায় না।

যখন ব্রাজিল তাদের চতুর্থ বিশ্বকাপ জিতল, তখন উদযাপনে অংশ নেওয়া সাংবাদিকদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনই অতীতের সেই বিস্ময়কর দিনগুলোর স্মৃতিচারণ লুকাতে পেরেছিলেন। রোমারিও ও বেবেতোর দলটি একটি কার্যকরী ম্যাচ খেলেছিল, কিন্তু তা ছিল কৃপণ।

কবিতা: '৫৮, '৬২ এবং '৭০ সালের গারিঞ্চা, দিদি, পেলে এবং তাদের সতীর্থদের সম্মোহনী খেলার তুলনায় এই ফুটবল ছিল অনেক কম ব্রাজিলীয়। একাধিক সাংবাদিক প্রতিভার অভাবের কথা উল্লেখ করেছিলেন, এবং বেশ কয়েকজন ভাষ্যকার ম্যানেজারের চাপিয়ে দেওয়া খেলার ধরনের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন, যা সফল হলেও জাদুর অভাব ছিল: ব্রাজিল আধুনিক ফুটবলের কাছে তার আত্মা বিক্রি করে দিয়েছিল। কিন্তু আরেকটি বিষয় ছিল যা প্রায় অনুল্লেখিতই থেকে গিয়েছিল: অতীতের সেরা দলগুলো ব্রাজিলে খেলা ব্রাজিলিয়ানদের নিয়েই গঠিত ছিল। ১৯৯৪ সালের দলে তাদের মধ্যে আটজন ইউরোপে খেলতেন। রোমারিও, বিশ্বের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত লাতিন আমেরিকান খেলোয়াড়, স্পেনে ব্রাজিলের '৫৮ সালের দলের এগারোজন খেলোয়াড়ের সম্মিলিত আয়ের চেয়েও বেশি উপার্জন করছিলেন, যারা ছিলেন ফুটবলের ইতিহাসের অন্যতম সেরা শিল্পী।



অতীতের তারকারা স্থানীয় ক্লাবের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। পেলে ছিলেন সান্তোসের, গারিনচা ছিলেন বোটাফোগোর, এবং বিদেশে স্বল্পস্থায়ী অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও দিদিও তাই ছিলেন। আর সেই রঙগুলো বা জাতীয় দলের হলুদ রঙ ছাড়া তাদের কল্পনা করা যেত না। ব্রাজিলে এবং অন্য সব জায়গায় এমনই নিয়ম ছিল, যার কারণ ছিল ইউনিফর্মের প্রতি আনুগত্য অথবা সামন্ততান্ত্রিক দাসত্বের চুক্তির এমন কিছু ধারা, যা কিছুদিন আগেও খেলোয়াড়দের আজীবনের জন্য বেঁধে রাখত। উদাহরণস্বরূপ, ফ্রান্সে ক্লাবগুলোর খেলোয়াড়দের ওপর সম্পত্তির অধিকার ছিল তাদের চৌত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত; খেলোয়াড় হিসেবে তাদের ক্যারিয়ার শেষ হয়ে গেলে তারা মুক্ত হতে পারত। স্বাধীনতার দাবিতে ফ্রান্সের খেলোয়াড়রা ১৯৬৮ সালের মে মাসের বিক্ষোভে যোগ দেয়, যখন প্যারিসের ব্যারিকেডগুলো বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রেমন্ড কোপা।

ম্যাচের সমাপ্তি

টি বলটি ঘোরে, পৃথিবীও ঘোরে। মানুষের সন্দেহ, সূর্য একটি জ্বলন্ত বস্তু। যে বলটি সারাদিন কাজ করে এবং সারারাত এদিক-ওদিক লাফাতে থাকে চাঁদের আবর্তনের সাথে সাথে আকাশও আলোকিত হয়, যদিও এ বিষয়ে বিজ্ঞান কিছুটা সন্দিহান। তবে, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে পৃথিবী একটি ঘূর্ণায়মান বলকে কেন্দ্র করেই ঘোরে: '৯৪ বিশ্বকাপের ফাইনাল দুই বিলিয়নেরও বেশি মানুষ দেখেছিল, যা এই গ্রহের ইতিহাসে সমবেত হওয়া বহু জনসমাগমের মধ্যে সর্ববৃহৎ। এটিই সেই আবেগ যা সবচেয়ে ব্যাপকভাবে ভাগ করে নেওয়া হয়: বলটির অনেক অনুরাগী মাঠে ও চারণভূমিতে তাকে নিয়ে খেলা করে, এবং আরও অনেকে টিভির সামনে বক্স সিটে বসে নখ কামড়ায় যখন হাফপ্যান্ট পরা বাইশজন লোক একটি বলকে তাড়া করে এবং তাদের ভালোবাসা প্রমাণ করতে তাকে লাথি মারে।

'৯৪ কাপের শেষে ব্রাজিলে জন্ম নেওয়া প্রতিটি শিশুর নাম রাখা হয়েছিল রোমারিও, এবং লস অ্যাঞ্জেলেসের স্টেডিয়ামের মাঠ পিজ্জার মতো বিক্রি হয়ে গিয়েছিল, প্রতি স্লাইস কুড়ি ডলারে। এ কি কোনো মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য করা সামান্য পাগলামি? একটি আদিম ও কুরুচিপূর্ণ ব্যবসা? নাকি মালিকদের দ্বারা পরিচালিত একগুচ্ছ কৌশল?
আমি তাদের মধ্যে একজন যারা বিশ্বাস করে যে ফুটবল শুধু এটুকুই নয়, এটি তার চেয়েও অনেক বেশি কিছু: যা দর্শকের জন্য এক ভোজ এবং খেলোয়াড়ের জন্য এক আনন্দ। একবার একজন সাংবাদিক জার্মান ধর্মতত্ত্ববিদ ডরোথি সোলেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “আপনি একটি শিশুকে সুখ কীভাবে বোঝাবেন?”



“আমি এটা ব্যাখ্যা করতাম না,” সে উত্তর দিল। “আমি ওকে একটা বল ছুঁড়ে দিয়ে খেলতে দিতাম।”

পেশাদার ফুটবল আনন্দের সেই শক্তিকে নপুংসক করে দেওয়ার জন্য সবকিছুই করে, কিন্তু এতসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তা টিকে থাকে। আর হয়তো একারণেই ফুটবল কখনো বিস্ময়কর হওয়া থামায় না। আমার বন্ধু অ্যাঞ্জেল রুওকোর ভাষায়, এটাই এর সেরা দিক—বিস্ময় সৃষ্টির অদম্য ক্ষমতা। প্রযুক্তিবিদরা একে ক্ষুদ্রতম খুঁটিনাটি পর্যন্ত যত বেশি প্রোগ্রাম করে, ক্ষমতাধররা একে যত বেশি নিয়ন্ত্রণ করে, ফুটবল ততই অপ্রত্যাশিতের শিল্প হয়ে ওঠে। যখন আপনি একেবারেই আশা করেন না, তখনই অসম্ভব ঘটে যায়, বামন দৈত্যকে শিক্ষা দেয়, আর বেঁটে, ধনুক-পাওয়ালা এক কৃষ্ণাঙ্গ খেলোয়াড় গ্রিসে গড়া একজন ক্রীড়াবিদকে হাস্যকর করে তোলে।

এক বিস্ময়কর শূন্যতা: প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাস ফুটবলকে উপেক্ষা করে। সমসাময়িক ইতিহাসের বইগুলোতে এর উল্লেখ করা হয় না, এমনকি প্রসঙ্গক্রমেও নয়, সেইসব দেশে যেখানে ফুটবল ছিল এবং এখনও আছে সম্মিলিত পরিচয়ের এক আদিম প্রতীক। আমি খেলি, তাই আমি আছি: খেলার একটি শৈলী হলো অস্তিত্বের একটি উপায় যা প্রতিটি সম্প্রদায়ের অনন্য রূপরেখা প্রকাশ করে এবং তাদের ভিন্ন হওয়ার অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। আমাকে বলুন আপনি কীভাবে খেলেন, আর আমি বলে দেব আপনি কে। বহু বছর ধরে ফুটবল বিভিন্ন শৈলীতে খেলা হয়েছে, যা প্রতিটি জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিত্বের অনন্য প্রকাশ, এবং আমার কাছে মনে হয়, সেই বৈচিত্র্যের সংরক্ষণ আজ আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়। এখন ফুটবল এবং অন্য সবকিছুতে বাধ্যতামূলক একরূপতার দিন। বিশ্ব তার প্রদত্ত সুযোগের ক্ষেত্রে এতটা অসম এবং চাপিয়ে দেওয়া অভ্যাসের ক্ষেত্রে এতটা সমতাবিধানকারী আগে কখনো ছিল না। এই শতাব্দীর শেষ প্রান্তের পৃথিবীতে, যে ক্ষুধায় মরে না, সে একঘেয়েমিতে মরে।

বছরের পর বছর ধরে ফুটবলের স্মৃতি আর বাস্তবতা আমাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে, এবং আমি এমন কিছু লেখার চেষ্টা করেছি যা এই বিশাল, বিচিত্র জনতার যোগ্য হবে, যারা কত ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলতে পারে এবং এমন সর্বজনীন আবেগ জাগিয়ে তুলতে পারে। লেখার মাধ্যমে, আমি আমার হাত দিয়ে সেটাই করতে যাচ্ছিলাম যা আমি আমার পা দিয়ে কখনোই করতে পারিনি: এক অমার্জনীয় আনাড়ি, খেলার মাঠের কলঙ্ক, আমার কাঙ্ক্ষিত বলটি যা আমাকে দেয়নি, তা শব্দের কাছে চাওয়া ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না।

সেই চ্যালেঞ্জ থেকে, এবং সেই প্রায়শ্চিত্তের তাগিদ থেকে এই বইটির জন্ম। ফুটবলের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি, তার আলোর উদযাপন, আর তার অন্ধকারের নিন্দা। আমি জানি না ফুটবল যেমনটা চেয়েছিল, তেমনটা হয়েছে কি না, কিন্তু আমি জানি এটা আমার ভেতরেই বেড়ে উঠেছে এবং শেষ পাতায় পৌঁছেছে, আর এখন যেহেতু এর জন্ম হয়েছে, এটি আপনার। আর আমি সেই অপূরণীয় বিষণ্ণতা অনুভব করছি, যা আমরা সবাই প্রেম করার পর এবং ম্যাচ শেষে অনুভব করি।

১৯৯৫ সালের গ্রীষ্মে মন্টেভিডিওতে



অতিরিক্ত সময়

১৯৯৮ বিশ্বকাপ

ভারত ও পাকিস্তান নিজেদের বোমা তৈরির স্বপ্ন পূরণ করছিল।

আমি সামনে দিয়ে পরাশক্তিদের একচেটিয়া পারমাণবিক ক্লাবে অনায়াসে প্রবেশ করা

এশিয়ার শেয়ার বাজারগুলো ভূপতিত হচ্ছিল, যেমনটা হয়েছিল ইন্দোনেশিয়ায় সুহার্তোর দীর্ঘ একনায়কতন্ত্রেরও; ক্ষমতাশূন্য হয়ে পড়লেও, সেই ক্ষমতার জোরে অর্জিত ১৬ বিলিয়ন ডলারে তার পকেট তখনও ভারী ছিল।

বিশ্ব হারাচ্ছিল ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রাকে, তাঁর 'দ্য ভয়েস'-কে। এগারোটি ইউরোপীয় দেশ ইউরো নামে একটি একক মুদ্রা চালু করতে সম্মত হচ্ছিল। মায়ামির নির্ভরযোগ্য সূত্রগুলো ফিদেল কাস্ত্রোর আসন্ন পতনের ঘোষণা দিচ্ছিল, যা ছিল মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার।

জোয়াও হ্যাভেলাঞ্জ সিংহাসন ত্যাগ করছিলেন এবং তার স্থলে বিশ্ব ফুটবলের সাম্রাজ্যের জ্যেষ্ঠ সভাসদ, যুবরাজ জোসেফ ব্লাটারকে অধিষ্ঠিত করছিলেন।
আর্জেন্টিনার প্রাক্তন স্বৈরশাসক জেনারেল ভিদেলা, যিনি বিশ বছর আগে হ্যাভেলাঞ্জের সঙ্গে বিশ্বকাপের উদ্বোধন করেছিলেন, কারাগারে যাচ্ছিলেন, আর এদিকে ফ্রান্সে একটি নতুন চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হয়ে গিয়েছিল।

এয়ার ফ্রান্সে ধর্মঘটের কারণে সৃষ্ট গুরুতর জটিলতা সত্ত্বেও, শতাব্দীর শেষ বিশ্বকাপে অংশ নিতে বত্রিশটি দল দৃষ্টিনন্দন সাঁ দেনি স্টেডিয়ামে এসে পৌঁছায়: ইউরোপ থেকে পনেরোটি, আমেরিকা থেকে আটটি, আফ্রিকা থেকে পাঁচটি, মধ্যপ্রাচ্য থেকে দুটি এবং এশিয়া থেকে দুটি।

বিজয়ের উল্লাস, শোকের গুঞ্জন: কানায় কানায় পূর্ণ স্টেডিয়ামে এক মাসের লড়াইয়ের পর ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল আয়োজক ফ্রান্স এবং ফেভারিট ব্রাজিল। ব্রাজিল ৩-০ গোলে হেরে যায়। ক্রোয়েশিয়ার সুকের সেরা খেলোয়াড়ের তালিকায় শীর্ষে ছিলেন।

ছয়টি গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতা হন, এরপর আর্জেন্টিনার বাতিস্তুতা এবং ইতালির ভিয়েরি প্রত্যেকে পাঁচটি করে গোল করেন।

লন্ডন ডেইলি টেলিগ্রাফে প্রকাশিত একটি গবেষণা অনুসারে , ফুটবল ম্যাচ চলাকালীন দর্শকরা খেলোয়াড়দের প্রায় সমপরিমাণ টেস্টোস্টেরন নিঃসরণ করে।

বহুজাতিক কোম্পানিগুলোও এমনভাবে হইচই ফেলে দেয় যে, মনে হয় যেন তারাই মাঠে নেমেছে। ব্রাজিল পাঁচবারের বিজয়ী হতে পারেনি, কিন্তু অ্যাডিডাস পেরেছিল। '৫৪ সালের কাপ থেকে শুরু করে, যেটি অ্যাডিডাস জার্মানির হয়ে জিতেছিল, এটি ছিল এই তিনটি ব্র্যান্ডের প্রতিনিধিত্বকারী খেলোয়াড়দের পঞ্চম বিজয়। ফ্রান্সের হয়ে অ্যাডিডাস আরও একবার খাঁটি সোনার ট্রফি তুলে ধরেছিল। এবং জিনেদিন জিদানের মাধ্যমে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কারটি জিতে নিয়েছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী নাইকি, যার তারকা রোনাল্ডো ফাইনালে অসুস্থ ছিলেন, তাদের দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্থান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল, যা তারা ব্রাজিল ও নেদারল্যান্ডসের হয়ে জিতেছিল। একটি ছোট কোম্পানি, লোটো, ক্রোয়েশিয়ার হয়ে একটি বড় সাফল্য অর্জন করে; দলটি এর আগে কখনও বিশ্বকাপে অংশ নেয়নি এবং সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

এরপর, লস অ্যাঞ্জেলেসে অনুষ্ঠিত আগের কাপের মতোই সেন্ট ডেনিসের ঘাস খণ্ড খণ্ড করে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। এই বইয়ের লেখকের কাছে বিক্রি করার মতো ঘাসের কোনো খণ্ড নেই, কিন্তু তিনি বিনামূল্যে ফুটবলের এমন কিছু টুকরো তুলে ধরতে চান, যার সাথেও এই চ্যাম্পিয়নশিপের কিছুটা সম্পর্ক ছিল।

তারকারা

সবচেয়ে বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়রা হলেন এমন পণ্য যা অন্য পণ্য বিক্রি করে। পেলের সময়ে খেলোয়াড়রা শুধু খেলত, বা বলা যায়, প্রায় সবই ছিল। ম্যারাডোনার সময়ে টেলিভিশন ও বিজ্ঞাপনের প্রভাব এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে পরিস্থিতি পাল্টে গিয়েছিল।

ম্যারাডোনা চড়া মূল্য চেয়েছিলেন, এবং তার খেসারতও দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর পায়ের জন্য দাম চেয়েছিলেন, আর তার মূল্য দিয়েছিলেন নিজের আত্মা দিয়ে।

চৌদ্দ বছর বয়সে রোনালদো ছিলেন রিও ডি জেনিরোর বস্তির এক গরিব মিশ্র-বর্ণের মানুষ, যার ছিল খরগোশের মতো দাঁত আর দুর্দান্ত এক স্ট্রাইকারের মতো পা, যিনি বাসের ভাড়া না থাকার কারণে ফ্লামেঙ্গোর হয়ে খেলতে পারতেন না। বাইশ বছর বয়সে তিনি ঘণ্টায় এক হাজার ডলার আয় করতেন, এমনকি ঘুমিয়েও। নিজের জনপ্রিয়তা এবং অর্থের চাপে অভিভূত হয়ে, সবসময় জ্বলে ওঠা ও জেতার বাধ্যবাধকতায়, '৯৮ সালের কাপের ভাগ্য নির্ধারণের কয়েক ঘণ্টা আগে রোনালদো তীব্র খিঁচুনিসহ এক মানসিক বিপর্যয়ের শিকার হন। বলা হয়, নাইকি তাকে ফ্রান্সের বিপক্ষে ফাইনালে মাঠে নামতে বাধ্য করেছিল। তিনি খেলেছিলেন, কিন্তু তিনি জেতেননি।

এবং তিনি নিজের পায়ে নাইকির বাজারজাত করা নতুন জুতার সিরিজ, আর-৯-এর গুণাগুণ প্রদর্শন করতে পারেননি।

দাম

শতাব্দীর শেষে এসে ফুটবল সাংবাদিকরা খেলোয়াড়দের দক্ষতার চেয়ে তাদের চড়া দাম নিয়ে বেশি লেখেন। ক্লাব সভাপতি, ব্যবসায়ী, ঠিকাদার এবং এই জাতীয় ব্যবসায়ীরা ফুটবলের কলামগুলোতে ভিড় জমান। কয়েক বছর আগেও 'পাস' বলতে বোঝাতো এক খেলোয়াড় থেকে অন্য খেলোয়াড়ের কাছে বলের চলাচল। এখন এটি একজন খেলোয়াড়ের এক ক্লাব থেকে অন্য ক্লাবে, বা এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়াকে বেশি ইঙ্গিত করে। তারকাদের পেছনে বিনিয়োগের লাভ কী? ফুটবল কলামিস্টরা আমাদের উপর সময়ের পরিভাষার বর্ষণ ঘটান: প্রস্তাব, বাইআউট, কেনার বিকল্প, বিক্রয়, ফোরক্লোজার, মূল্যবৃদ্ধি, মূল্যহ্রাস।

১৯৯৮ সালের বিশ্বকাপ চলাকালীন, বিশ্বজুড়ে টিভির পর্দাগুলো সম্মিলিত আবেগে—যা ছিল আবেগের মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক—আচ্ছন্ন ও অভিভূত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সেগুলোকে বাণিজ্য মেলার প্রদর্শনীতেও পরিণত করা হয়েছিল। বিশ্বকাপের প্রতিটি লেগের ভবিষ্যৎ নিয়ে উত্থান-পতন ছিল।

ভাড়া করা পা

ফুটবলের নতুন সম্রাট জোসেফ ব্লাটার ১৯৯৫ সালের শেষের দিকে ব্রাজিলের পত্রিকা 'প্লাকার'- কে একটি সাক্ষাৎকার দেন , যখন তিনি তখনও হ্যাভেলাঞ্জের ডান হাত ছিলেন। সাংবাদিকটি আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় ইউনিয়ন গঠনের বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন।

"ফিফা খেলোয়াড়দের সাথে কোনো লেনদেন করে না," ব্লাটার জবাব দিলেন। "খেলোয়াড়রা হলো ক্লাবগুলোর কর্মচারীরা।

আমলা ব্লাটার যখন তাঁর অবজ্ঞা প্রকাশ করছিলেন, তখন ক্রীড়াবিদদের এবং আমাদের সকলের জন্য, যারা মানবাধিকার ও শ্রমের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, একটি সুখবর ছিল। বেলজিয়ামের ফুটবল খেলোয়াড় জঁ-মার্ক বোসম্যানের দায়ের করা একটি মামলায়, ইউরোপের সর্বোচ্চ বিচারিক কর্তৃপক্ষ, ইউরোপীয় বিচার আদালত, রায় দিয়েছে যে ইউরোপীয় খেলোয়াড়রা তাদের চুক্তির শেষে মুক্ত খেলোয়াড় (ফ্রি এজেন্ট) হতে পারবেন।

পরবর্তীতে, ব্রাজিলের "পেলে আইন" সামন্ততান্ত্রিক দাসত্বের শৃঙ্খলকে আরও দুর্বল করে দেয়। কিন্তু অনেক দেশেই খেলোয়াড়দের এখনও ক্লাবগুলোর স্থায়ী সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয়, যে ক্লাবগুলোর বেশিরভাগই অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের ছদ্মবেশে থাকা কোম্পানি।

'৯৮ সালের কাপের ঠিক আগে, একজন ম্যানেজার, পাচো মাতুরানা, এই মতামত দিয়েছিলেন: "খেলোয়াড়দের অধিকার নিয়ে কেউ ভাবে না।" এই কথাটি আজও একটি বিশাল ও সুবিশাল সত্য, যদিও দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর খেলোয়াড়রা ফ্রি এজেন্সির অধিকার অর্জন করছে। একজন খেলোয়াড় যত উপরের দিকে যায়...

পেশাদার ফুটবলার হিসেবে তার দায়িত্বও তত বেশি, যা তার অধিকারের চেয়ে সবসময়ই বহুগুণে বেশি। তাকে অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে চলতে হয়, সামরিক শৃঙ্খলা, ক্লান্তিকর প্রশিক্ষণ এবং অবিরাম ভ্রমণ সহ্য করতে হয়, এবং দিনের পর দিন সেরা ফর্মে থেকে খেলে যেতে হয়, আর ক্রমাগত আরও ভালো ফল করতে হয়।

নব্বই বছর বয়সে পৌঁছেও উইনস্টন চার্চিল আগের মতোই প্রাণবন্ত ছিলেন। এক সাংবাদিক তাঁর কাছে তাঁর সুস্বাস্থ্যের রহস্য জানতে চাইলেন। চার্চিল উত্তর দিলেন, "খেলাধুলা। আমি কখনো খেলিনি।"

বিজ্ঞাপন

আজকের বিশ্বে, যা কিছু চলে এবং যা কিছু চলে না, তার সবই কোনো না কোনো বাণিজ্যিক বার্তা বহন করে। প্রত্যেক ফুটবল খেলোয়াড়ই এক একটি চলমান বিলবোর্ড, কিন্তু ফিফা খেলোয়াড়দের সংহতির বার্তা পরিধান করতে স্পষ্টভাবে নিষেধ করে। আর্জেন্টিনার ফুটবলের প্রধান হুলিও গ্রোন্দোনা ১৯৯৭ সালে আমাদের এই বিষয়টি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, যখন কয়েকজন খেলোয়াড় দেশের শিক্ষকদের দাবির প্রতি তাদের সমর্থন দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন, যারা অবিরাম উপবাসের বিনিময়ে বেতন পান। এর কিছুদিন আগেই, ফিফা ইংরেজ খেলোয়াড় রবি ফাউলারকে তার জার্সিতে ধর্মঘটী মাল খালাসকারীদের সমর্থনে একটি স্লোগান লেখার অপরাধে জরিমানা করেছিল।

শিকড়

ফুটবলের অনেক সেরা তারকা কৃষ্ণাঙ্গ বা মিশ্রবর্ণের হওয়ার কারণে বৈষম্যের শিকার হন। মাঠে তারা পরিসংখ্যানগত গড়ের কারণে নির্ধারিত অপরাধমূলক জীবনের একটি বিকল্প খুঁজে পান এবং এভাবেই তারা সম্মিলিত আশার প্রতীক হয়ে ওঠেন।

ব্রাজিলে সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, প্রতি তিনজন পেশাদার খেলোয়াড়ের মধ্যে দুজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করেননি। এদের মধ্যে অনেকেই—অর্ধেক—কালো বা বাদামী বর্ণের। মাঠে ইদানীং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রভাব স্পষ্ট হলেও, আজকের ব্রাজিলিয়ান ফুটবল পেলের আমলের থেকে খুব একটা আলাদা নয়, যিনি ছোটবেলায় রেলস্টেশন থেকে বাদাম চুরি করতেন।

আফ্রিকানরা

ক্যামেরুনের ন্জাঙ্কা পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে অস্ট্রিয়ার পুরো দলকে পেছনে ফেলে '৯৮ কাপের সবচেয়ে সুন্দর গোলটি করেছিলেন। কিন্তু ক্যামেরুন নিজে বেশিদূর এগোতে পারেনি।

যখন নাইজেরিয়া তার আনন্দময় ফুটবল দিয়ে স্প্যানিশ দলকে পরাজিত করল এবং প্যারাগুয়ে স্পেনের সাথে ড্র করল, তখন স্পেনের রাষ্ট্রপতি হোসে মারিয়া আজনার মন্তব্য করেছিলেন, "এমনকি একজন নাইজেরিয়ান, এমনকি একজন প্যারাগুয়েয়ানও তোমাদের জায়গা নিতে পারে।"
এরপর, নাইজেরিয়া প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গেলে, একজন আর্জেন্টাইন ধারাভাষ্যকার মন্তব্য করেন, "ওরা সবাই রাজমিস্ত্রি, ওদের একজনও মাথা খাটিয়ে চিন্তা করে না।"

ফিফা, যারা ফেয়ার প্লে-র জন্য পুরস্কার দেয়, তারা নাইজেরিয়ার সঙ্গে ন্যায্য আচরণ করেনি।
দলটি সবেমাত্র অলিম্পিক জিতলেও, তারা এটিকে গ্রুপের শীর্ষে স্থান পেতে দেয়নি।

কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকার দলগুলো বিশ্বকাপ থেকে তাড়াতাড়ি বিদায় নিলেও, আফ্রিকার ছেলেমেয়েরা নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স, ব্রাজিল ও অন্যান্য দলের হয়ে নিজেদের প্রতিভা দেখিয়ে গেছে। কিছু ধারাভাষ্যকার তাদের 'ডার্কি' বলে ডাকতেন। তারা অন্যদের কখনো 'হোয়াইটি' বলতেন না।

উদ্দীপনা

১৯৯৭ সালের এপ্রিলে লিমা শহরে জাপানি দূতাবাস দখলকারী গেরিলাদের গুলি করে হত্যা করা হয়। যখন কমান্ডোরা ভেতরে ঢুকে তাদের সেই ভয়াবহ ও বিদ্যুৎগতির হত্যাকাণ্ডটি চালায়, তখন গেরিলারা ফুটবল খেলছিল। তাদের নেতা, নেস্তর সেরপা কার্তোলিনি, তার প্রিয় ক্লাব আলিয়াঞ্জার জার্সি পরেই মৃত্যুবরণ করেন।

লাতিন আমেরিকায় এমন খুব কম ঘটনাই ঘটে যার সাথে ফুটবলের কোনো না কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক নেই। তা সে সম্মিলিত কোনো উদযাপনই হোক, কিংবা এমন কোনো বিপর্যয় যা আমাদের সবাইকে ডুবিয়ে দেয়, লাতিন আমেরিকায় ফুটবলের গুরুত্ব অপরিসীম; কখনও কখনও অন্য সবকিছুর চেয়েও বেশি। যদিও মানবতাকে ভালোবাসে কিন্তু মানুষকে সহ্য করতে পারে না এমন মতাদর্শীরা হয়তো তা উপলব্ধি করে না।

ল্যাটিন আমেরিকানরা

'৯৮ সালের কাপে মেক্সিকো ভালো খেলেছিল। প্যারাগুয়ে এবং চিলি ছিল কঠিন প্রতিপক্ষ। কলম্বিয়া এবং জ্যামাইকা তাদের সেরাটা দিয়েছিল। ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনা তাদের সেরাটা দিতে পারেনি, কারণ তাদের কৌশলগুলো ছিল আনন্দ এবং কল্পনার দিক থেকে বেশ কৃপণ। আর্জেন্টিনা দলে সমস্ত আনন্দ এবং কল্পনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল ওর্তেগা, যিনি ছিলেন লাফালাফি আর কসরতের ওস্তাদ, কিন্তু মাটিতে গড়াগড়ি খাওয়ার ক্ষেত্রে একজন জঘন্য অভিনেতা।

ডাচ

সত্যি বলতে, লাতিন আমেরিকার দলগুলোর মধ্যে নেদারল্যান্ডসকেই আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছিল। চমৎকার ফুটওয়ার্ক, দ্রুত পাস এবং বল দখলে স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে কমলা জার্সিধারীদের খেলা ছিল চোখের জন্য এক দারুণ ভোজ। তাদের এই খেলার ধরনের পেছনে বড় অবদান ছিল দক্ষিণ আমেরিকার খেলোয়াড়দের, যারা সুরিনামে জন্ম নেওয়া ক্রীতদাসদের বংশধর।

ফ্রান্সে ভ্রমণকারী দশ হাজার ডাচ সমর্থকের মধ্যে কোনো কৃষ্ণাঙ্গ ছিলেন না, কিন্তু মাঠে অবশ্যই ছিলেন: ক্লুইভার্ট, সিডর্ফ, রাইজিগার, উইন্টার, বোগার্ড, ডেভিডস। দলের চালিকাশক্তি ডেভিডস খেলেন এবং খেলা তৈরি করেন: তিনি গোল করেন এবং ঝামেলায়ও পড়েন, কারণ তিনি এটা মানতে নারাজ যে কৃষ্ণাঙ্গ খেলোয়াড়রা শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে কম বেতন পায়।

ফরাসি

প্রতিটি ম্যাচের আগে নীল জার্সি পরে ‘লা মার্সেইয়েজ’ গাইতে থাকা প্রায় সকল খেলোয়াড়ই ছিলেন অভিবাসী বা অভিবাসীদের সন্তান। দুটি অসাধারণ গোলের জন্য জাতীয় বীরের মর্যাদা পাওয়া থুরাম এবং হেনরি, দেসাইলি, ভিয়েরা ও কারেম্বু ছিলেন আফ্রিকা, ক্যারিবিয়ান বা নিউ ক্যালেডোনিয়ার অধিবাসী। বাকিদের অধিকাংশই এসেছিলেন বাস্ক, আর্মেনীয় বা আর্জেন্টাইন পরিবার থেকে।

সবচেয়ে প্রশংসিত জিদান আলজেরীয়দের সন্তান। বিজয় উদযাপনের দিনে আর্ক দ্য ত্রিয়ম্ফ-এর উপর এক অজ্ঞাতনামা হাতে লেখা ছিল, “জিদান প্রেসিডেন্ট হোক”। প্রেসিডেন্ট? ফ্রান্সে অনেক আরব ও আরবের সন্তান আছে, কিন্তু তাদের একজনও সংসদ সদস্য নন, মন্ত্রী হওয়া তো দূরের কথা।

বিশ্বকাপ চলাকালীন প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ফ্রান্সের প্রতি দশজনের মধ্যে চারজনের বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। বর্ণবাদের দ্বৈতভাষণ আপনাকে নায়কদের জন্য উল্লাস করতে এবং বাকিদের অভিশাপ দিতে দেয়। ফ্রান্সের বিজয় এমন এক জনতা দ্বারা উদযাপিত হয়েছিল, যার তুলনা কেবল অর্ধশতাব্দী আগে জার্মান দখলদারিত্বের অবসানের পর রাস্তায় উপচে পড়া জনতার সাথেই করা যায়।

মাছ

১৯৯৭ সালে ফক্স স্পোর্টসের একটি বিজ্ঞাপনে দর্শকদের ফুটবল দেখার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছিল: “দেখুন কীভাবে বড় মাছ ছোটগুলোকে গিলে ফেলে।” একঘেয়েমির প্রতি এক আমন্ত্রণ। সৌভাগ্যবশত, '৯৮ কাপ চলাকালীন একাধিকবার, ছোট মাছটি

বড়গুলো হাড়সমেত খেয়ে ফেলেছি। ফুটবলে, এবং জীবনেও, এটাই সেই উজ্জ্বল দিক যা আমরা মাঝে মাঝে দেখতে পাই।



২০০২ বিশ্বকাপ

একটি পতনের মরসুম। একটি সন্ত্রাসী হামলায় টুইন টাওয়ার দুটি মাটির সাথে মিশে গিয়েছিল। নিউইয়র্কে। প্রেসিডেন্ট বুশ ক্ষেপণাস্ত্র বর্ষণ করেছিলেন আফগানিস্তানে তালেবানের একনায়কতন্ত্র উৎখাত করা হয়েছিল, যেটিকে তার বাবা ও রিগান লালন-পালন করেছিলেন। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সামরিক সন্ত্রাসকে আশীর্বাদ দিচ্ছিল। ইসরায়েলি ট্যাংকগুলো গাজা ও পশ্চিম তীর ধ্বংস করছিল, যাতে ফিলিস্তিনিরা এমন এক হলোকাস্টের জন্য মূল্য পরিশোধ করে যেতে পারে, যা তারা ঘটায়নি।

স্পাইডার-ম্যান বক্স-অফিসের রেকর্ড ভাঙছিল। মায়ামির নির্ভরযোগ্য সূত্রগুলো ফিদেল কাস্ত্রোর আসন্ন পতনের ঘোষণা দিচ্ছিল, তা ছিল মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার। যা সত্যিই ধসে পড়ল তা হলো আদর্শ রাষ্ট্র আর্জেন্টিনা, এবং তার সাথে সাথে তার মুদ্রা, সরকার এবং অন্য সবকিছুও পতন হলো। ভেনেজুয়েলায় একটি অভ্যুত্থান প্রেসিডেন্ট শাভেজকে ক্ষমতাচ্যুত করল এবং যখন জনতা সেই ক্ষমতাচ্যুত নেতাকে পুনরায় ক্ষমতায় বসাল, তখন মুক্ত গণমাধ্যমের রক্ষক টেলিভিশন এমন ভাব করল যেন সে কিছুই শোনেনি।

নিজের প্রতারণার জালে বিধ্বস্ত হয়ে কর্পোরেট দৈত্য এনরন, যা বুশ এবং বেশিরভাগ মার্কিন সিনেটরের নির্বাচনী প্রচারণায় অন্যতম উদার দাতা ছিল, ধসে পড়ল। আর ডমিনোর মতো একে একে অন্যান্য পূজনীয় দানবদের শেয়ারের দামও একে একে পড়তে লাগল: ওয়ার্ল্ডকম, জেরক্স, ভিভেন্ডি, মার্ক—সবই ঘটেছিল কয়েকটি ছোটখাটো শত কোটি ডলারের হিসাবরক্ষণের ভুলের কারণে। ফিফার সবচেয়ে বড় ব্যবসায়িক অংশীদার, আইএসএল এবং কির্চও দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তাদের এই জঘন্য দেউলিয়াপনা জোসেফ ব্লাটারকে বিপুল ভোটে বিশ্ব ফুটবলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়া থেকে আটকাতে পারেনি। যদি নিজেকে ভালো দেখাতে চান, তবে এর চেয়েও খারাপ কাউকে খুঁজে বের করুন: হিসাবের খাতায় কারচুপি এবং ভোট কেনার ওস্তাদ, অস্পৃশ্য ব্লাটার হ্যাভেলাঞ্জকে একজন সিস্টার অফ চ্যারিটিতে পরিণত করেছিলেন।

বার্টি ফেলস্টেডও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছিলেন। ইংল্যান্ডের সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি ফেলস্টেড ছিলেন ১৯১৫ সালের বড়দিনের দিনে নো-ম্যান'স-ল্যান্ডে ব্রিটিশ ও জার্মান সৈন্যদের মধ্যে হওয়া সেই অসাধারণ ফুটবল ম্যাচের একমাত্র জীবিত ব্যক্তি। কোথা থেকে যেন আবির্ভূত হওয়া একটি বলের জাদুকরী প্রভাবে যুদ্ধক্ষেত্রটি কিছুক্ষণের জন্য খেলার মাঠে পরিণত হয়েছিল, যতক্ষণ না চিৎকাররত অফিসাররা সৈন্যদের মনে করিয়ে দিতে সক্ষম হন যে তারা একে অপরকে ঘৃণা করতে বাধ্য।

* * *

বিশটি শহরের ঝকঝকে নতুন স্টেডিয়ামে সপ্তদশ বিশ্বকাপ খেলতে বত্রিশটি দল জাপান ও কোরিয়ায় গিয়েছিল। নতুন সহস্রাব্দের প্রথম বিশ্বকাপটি ছিল এশিয়ায় অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্বকাপ। পাকিস্তানি শিশুরা অ্যাডিডাসের জন্য সেই অত্যাধুনিক বলটি সেলাই করেছিল, যা সিউলের স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী রাতে গড়াতে শুরু করে: ফোম দিয়ে ঢাকা কাপড়ের জালে ঘেরা একটি রাবারের প্রকোষ্ঠ, আর পুরোটাই ছিল আগুনের প্রতীক দিয়ে সজ্জিত সাদা পলিমারের একটি আবরণের ভেতরে। ঘাস থেকে ভাগ্যকে আকর্ষণ করার জন্যই তৈরি একটি বল।

* * *

দুটি বিশ্ব ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল: একটিতে ছিল রক্ত-মাংসের খেলোয়াড়রা; অন্যটি, যা একই সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে ছিল রোবট। সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা প্রোগ্রাম করা যান্ত্রিক খেলোয়াড়রা কোরিয়ার উপকূলের বিপরীতে জাপানের ফুকুওকা বন্দরে রোবোকাপ ২০০২-এ অংশ নিয়েছিল। ফুটবল জগতের ব্যবসায়ী, প্রযুক্তিবিদ, আমলা এবং ভাবাদর্শীরা কী স্বপ্ন দেখেন? তাদের স্বপ্নটি বারবার ফিরে আসে, যা ক্রমশ বাস্তবতার কাছাকাছি চলে আসছে, যেখানে খেলোয়াড়রা রোবটকে অনুকরণ করে।

সময়ের এক দুঃখজনক লক্ষণ: একবিংশ শতাব্দী দক্ষতার নামে একরূপতাকে পবিত্র করে এবং সাফল্যের বেদিতে স্বাধীনতাকে বলি দেয়। “আপনি জেতেন কারণ আপনি ভালো, তা নয়; বরং আপনি জেতেন বলেই ভালো,” কয়েক বছর আগে কর্নেলিয়াস কাস্টোরিয়াডিস মন্তব্য করেছিলেন। তিনি ফুটবলের কথা বলছিলেন না, কিন্তু বলতে পারতেন। সময় নষ্ট করা নিষিদ্ধ, তেমনি হারাও। একটি চাকরিতে পরিণত হয়ে, লাভজনকতার নিয়মের অধীন হয়ে খেলাটি আর খেলা হয় না।

অন্য সবকিছুর মতোই, পেশাদার ফুটবলও যেন সর্বশক্তিমান, যদিও অস্তিত্বহীন, ইউইবি (সৌন্দর্যের শত্রুদের সংঘ) দ্বারা পরিচালিত হয়।

আনুগত্য, গতি, শক্তি, এবং সেইসব চোখধাঁধানো কৌশলের কোনোটিই নয়: বিশ্বায়ন খেলাটিকে এই ছাঁচেই ঢেলে দেয়। ফুটবল গণ-উৎপাদিত হয়, এবং তা ফ্রিজারের চেয়েও শীতল ও মাংস পেষাই যন্ত্রের মতো নির্মম হয়ে বেরিয়ে আসে: রোবটদের জন্য ফুটবল। এই ধরনের একঘেয়েমিকে নাকি অগ্রগতি বলা হয়, কিন্তু ইতিহাসবিদ আর্নল্ড টয়েনবি এর আগেই তা যথেষ্ট দেখে ফেলেছিলেন যখন তিনি লিখেছিলেন, "পতনশীল সভ্যতাগুলোর একটি ধারাবাহিক বৈশিষ্ট্য হলো প্রমিতকরণ এবং অভিন্নতার দিকে ঝোঁক।"

* * *

আবার সেই রক্ত-মাংসের কাপের কথায় ফেরা যাক। উদ্বোধনী ম্যাচে, মানবজাতির এক-চতুর্থাংশের বেশি মানুষ টেলিভিশনে প্রথম চমকটি দেখল। আগের চ্যাম্পিয়নশিপের বিজয়ী ফ্রান্স, তাদেরই এক প্রাক্তন উপনিবেশ এবং বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণকারী দল সেনেগালের কাছে হেরে গেল। সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীর বিপরীতে, ফ্রান্স একটিও গোল না করে প্রথম রাউন্ডেই ছিটকে গেল। আরেক বড় ফেভারিট দল আর্জেন্টিনাও প্রথম ম্যাচেই বিদায় নিল। আর তারপর রেফারিদের হাতে সশস্ত্র আক্রমণের শিকার হয়ে ইতালি ও স্পেনকেও বিদায় নিতে হলো। এই সমস্ত শক্তিশালী দলগুলোই যমজ ভাইয়ের কাছে পরাজিত হয়েছিল: জেতার তাগিদ এবং হেরে যাওয়ার আতঙ্ক। বিশ্ব ফুটবলের সেরা তারকারা খ্যাতি ও দায়িত্বের ভারে অভিভূত হয়ে এবং যে ক্লাবের হয়ে তারা খেলেন, সেই ক্লাবের প্রচণ্ড গতির চাপে ক্লান্ত হয়ে এই কাপে এসেছিলেন।

বিশ্বকাপের কোনো ইতিহাস নেই, কোনো তারকা নেই, জেতার কোনো বাধ্যবাধকতা বা হারার কোনো আশঙ্কাও নেই—সেনেগাল এক সাবলীল ভঙ্গিতে খেলেছে এবং চ্যাম্পিয়নশিপের বিস্ময় হয়ে উঠেছে। চীন, ইকুয়েডর এবং স্লোভেনিয়াও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল, কিন্তু প্রথম রাউন্ডেই বাদ পড়ে যায়। সেনেগাল অপরাজিত থেকে কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছায় এবং এর বেশি এগোতে পারেনি, কিন্তু তাদের অবিরাম নৃত্য একটি সহজ সত্যকে সামনে এনেছে যা বলের বিজ্ঞানীদের চোখ এড়িয়ে যায়: ফুটবল একটি খেলা, এবং যারা এটি সত্যিই খেলে তারা আনন্দ পায় এবং আমাদেরও আনন্দ দেয়। পুরো টুর্নামেন্টে আমার সবচেয়ে পছন্দের গোলটি করেছিল সেনেগাল: থিয়াওয়ের ব্যাকহিল, কামারার নিপুণ শট। আরেকজন সেনেগালিজ, দিউফ, প্রতি ম্যাচে গড়ে আটবার বল ড্রিবল করেছেন, এমন একটি চ্যাম্পিয়নশিপে যেখানে চোখের এই আনন্দ যেন নিষিদ্ধ ছিল।

আরেকটি বিস্ময় ছিল তুরস্ক। কেউই তা বিশ্বাস করতে পারছিল না। দেশটি অর্ধ শতাব্দী ধরে এই কাপ থেকে অনুপস্থিত ছিল। ব্রাজিলের বিপক্ষে তাদের প্রথম ম্যাচে, তুর্কি দলটি রেফারির দ্বারা চরমভাবে প্রতারিত হয়েছিল, কিন্তু

দলটি দুর্দান্ত খেলে শেষ পর্যন্ত তৃতীয় স্থান অর্জন করে। তাদের উদ্দীপনা ও মানসম্মত খেলা সেই বিশেষজ্ঞদের বাকরুদ্ধ করে দিয়েছিল, যারা একে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছিল।

বাকি প্রায় পুরোটাই ছিল একঘেয়েমির। সৌভাগ্যবশত, শেষ ম্যাচগুলোতে ব্রাজিলের মনে পড়েছিল যে তারা ব্রাজিল। দলটি অবশেষে বাঁধনমুক্ত হয়ে ব্রাজিলিয়ানদের মতো খেলতে শুরু করে এবং ম্যানেজার স্কোলারির বেঁধে রাখা সাধারণ মানের খেলার খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসে। এরপর তাদের চার 'আর'—রিভালদো, রোনাল্ডো, রোনালদিনহো এবং রবার্তো কার্লোস—অসাধারণভাবে জ্বলে ওঠেন এবং ব্রাজিল অবশেষে এক উৎসবে পরিণত হয়।

* * *

এবং তারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। ফাইনালের ঠিক আগে, ১৭ কোটি ব্রাজিলিয়ান জার্মান সসেজে পিন ফুটিয়েছিল, এবং জার্মানি ২-০ গোলে পরাজিত হয়েছিল। এটি ছিল সাত ম্যাচে ব্রাজিলের সপ্তম জয়। দুটি দেশই বহুবার ফাইনালে উঠেছিল, কিন্তু বিশ্বকাপে এর আগে তারা কখনো একে অপরের মুখোমুখি হয়নি। তুরস্ক তৃতীয় এবং দক্ষিণ কোরিয়া চতুর্থ স্থান অধিকার করে। বাজার দরের হিসাবে, নাইকি প্রথম ও চতুর্থ এবং অ্যাডিডাস দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

দীর্ঘ চোট কাটিয়ে ফেরা ব্রাজিলিয়ান রোনাল্ডো আটটি গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় শীর্ষে ছিলেন। তাঁর পরেই ছিলেন তাঁর স্বদেশী রিভালদো ও জার্মানির ক্লোসে, প্রত্যেকে পাঁচটি করে গোল করেন। এরপর ডেনমার্কের টমাসন ও ইতালির ভিয়েরি চারটি করে গোল করেন। ম্যাচ শুরুর মাত্র এগারো সেকেন্ডের মাথায় তুরস্কের শুকুর বিশ্বকাপের ইতিহাসে দ্রুততম গোলটি করেন।

এই প্রথমবার, একজন গোলরক্ষক, জার্মান অলিভার খান, টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন। তিনি এতটাই আতঙ্ক সৃষ্টি করতেন যে তার প্রতিপক্ষরা ভাবত তিনি যেন আরেক খান, চেঙ্গিসের ছেলে। কিন্তু তিনি তা ছিলেন না।



২০০৬ বিশ্বকাপ

বরাবরের মতোই, সিআইএ-র বিমানগুলো কোনো বাধা ছাড়াই ইউরোপে আসা-যাওয়া করছিল। একটি অনুমতি বা বিজ্ঞপ্তি অথবা সামান্যতম একটি হ্যালো-গুডবাই, পারাপার বিশ্বজুড়ে বন্দীদের নির্যাতন কক্ষে পাঠানো হয়।

যথারীতি, ইসরায়েল গাজায় আক্রমণ চালাচ্ছিল, এবং আটক এক সৈন্যকে উদ্ধার করার জন্য জিম্মিটি বন্দুকের গুলিবর্ষণ করে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকে জিম্মি করে রেখেছিল।

বরাবরের মতোই বিজ্ঞানীরা সতর্ক করছিলেন যে জলবায়ু নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে এবং অচিরেই মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাবে ও সমুদ্র বন্দর এবং উপকূলরেখা গ্রাস করবে। কিন্তু যারা বায়ুমণ্ডলকে বিষাক্ত করছে এবং জলবায়ুকে অস্থিতিশীল করছে, তারা বরাবরের মতোই বধির হয়ে রইল।

কান।

বরাবরের মতোই মেক্সিকোর নির্বাচনেও কারচুপি ছিল, যেখানে আনুষ্ঠানিক ভোট গণনার কম্পিউটার সিস্টেমটি ডানপন্থী প্রার্থীর শ্যালক নিখুঁতভাবে প্রোগ্রাম করেছিলেন।

বরাবরের মতোই, মায়ামির নির্ভরযোগ্য সূত্রগুলো ফিদেল কাস্ত্রোর আসন্ন পতনের ঘোষণা দিচ্ছিল, এটা ছিল মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার।

বরাবরের মতোই কিউবায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা সংবাদ শিরোনামে আসছিল। এবার ঘটনাটি ঘটেছে গুয়ান্তানামোর মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে, যেখানে বিনা অভিযোগে বা বিচারে আটক শত শত বন্দীর মধ্যে তিনজনকে তাদের সেলে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। হোয়াইট হাউস বলেছে, সন্ত্রাসীরা কেবল দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছিল।

যথারীতি, বলিভিয়ার প্রথম আদিবাসী রাষ্ট্রপতি ইভো মোরালেস দেশের তেল ও গ্যাস সম্পদ জাতীয়করণ করার পর একটি কেলেঙ্কারি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, যার মাধ্যমে তিনি নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার মতো এক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেন।

বরাবরের মতোই, তেল মজুত রাখার দায়ে দোষী দেশ ইরাকে হত্যাকাণ্ড চলছিল, আর ঠিক সেই সময়ে ক্যালিফোর্নিয়ার প্যান্ডেমিক স্টুডিওস একটি নতুন ভিডিও গেম ঘোষণা করছিল, যেখানে নায়কেরা তেল মজুত রাখার দায়ে দোষী ভেনেজুয়েলা আক্রমণ করে।

আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানকে আক্রমণ করার হুমকি দিচ্ছিল, যে দেশটিও তেল মজুত করার দায়ে দোষী ছিল। ইরান একটি হুমকি ছিল কারণ তারা পারমাণবিক বোমা চেয়েছিল। আমাকে মনে করিয়ে দিন তো, হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে বোমাটা কি ইরানই ফেলেছিল?

ব্রুনোও ছিল এক উপদ্রব। ইতালিতে বন্দী অবস্থায় লালিত-পালিত হয়ে পরে মুক্তি পেয়ে ভালুকটি জার্মানির জঙ্গলে দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল। যদিও ফুটবলের প্রতি তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কোনো ঝুঁকি নিতে চায়নি। অষ্টাদশ বিশ্বকাপের উদ্বোধনের ঠিক আগে তারা বাভারিয়ায় ব্রুনোকে গুলি করে হত্যা করে।

* * *

পাঁচটি মহাদেশের বত্রিশটি দেশ একীভূত জার্মানির বারোটি আকর্ষণীয়, সুপরিকল্পিত, এমনকি রাজকীয় স্টেডিয়ামে চৌষট্টিটি ম্যাচ খেলেছিল: এগারোটি পশ্চিমে এবং মাত্র একটি পূর্বে।

এই বিশ্বকাপের একটি মূলভাব ছিল: প্রতিটি ম্যাচের আগে খেলোয়াড়রা বর্ণবাদের বিশ্বব্যাপী মহামারীর নিন্দা জানিয়ে একটি ব্যানার উন্মোচন করতেন।

একটি আলোচিত বিষয়: টুর্নামেন্টের প্রাক্কালে, ফরাসি রাজনৈতিক নেতা জঁ-মারি লে পেন ঘোষণা করেন যে, দেশটি তার খেলোয়াড়দের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পায় না, কারণ তাদের প্রায় সকলেই কৃষ্ণাঙ্গ। তিনি আরও যোগ করেন যে, দলের অধিনায়ক জিনেদিন জিদান, যিনি ফরাসিদের চেয়ে বেশি আলজেরীয়, জাতীয় সঙ্গীত গাইতে অস্বীকার করেছেন। ইতালীয় সিনেটের ভাইস প্রেসিডেন্ট রবার্তো কালদেরোলি একই মনোভাব প্রকাশ করে বলেন যে, ফরাসি দলটি কৃষ্ণাঙ্গ, ইসলামপন্থী এবং কমিউনিস্টদের নিয়ে গঠিত, যারা ‘লা মার্সেইয়েজ’-এর চেয়ে ‘ল'ইন্টারন্যাশনাল’ এবং বেথলেহেমের চেয়ে মক্কাকে বেশি পছন্দ করে। এর আগে, স্প্যানিশ দলের কোচ লুইস আরাগোনেস ফরাসি খেলোয়াড় থিয়েরি হেনরিকে "কালো আবর্জনা" বলে অভিহিত করেন এবং দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবলের আজীবন সভাপতি নিকোলাস লিওজ তার আত্মজীবনী শুরু করেন এই বলে যে, তিনি "ত্রিশ জন মানুষ ও একশ জন আদিবাসী অধ্যুষিত একটি শহরে" জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

টুর্নামেন্টের শেষে, ফাইনাল ম্যাচের প্রায় শেষ মুহূর্তে, যেন এক ষাঁড় তেড়ে এলো: জিদান, যিনি ফুটবলকে বিদায় জানাচ্ছিলেন, তিনি এমন এক প্রতিপক্ষকে মাথা দিয়ে গুঁতো দিলেন যে তাকে সেই ধরনের অপমানজনক কথা বলে খোঁচা দিচ্ছিল, যা উন্মাদ সমর্থকরা গ্যালারির ওপর থেকে চিৎকার করে বলতে ভালোবাসে। অপমানকারী মাটিতে পড়ে গেল এবং...

অপমানিত হয়ে রেফারির কাছ থেকে লাল কার্ড পেলেন এবং যে দর্শকেরা তাকে অভিবাদন জানাতে প্রস্তুত ছিল, তাদের কাছ থেকে বিদ্রূপ শুনতে পেলেন। আর জিদান চিরতরে মাঠ ছাড়লেন।

তবুও, এটা ছিল তার বিশ্বকাপ। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় তিনিই ছিলেন, যদিও শেষ মুহূর্তের সেই কাণ্ডটি ছিল উন্মাদনাপূর্ণ অথবা সততার পরিচায়ক—আপনি যেভাবেই দেখুন না কেন। তার সুন্দর চালচলন আর বিষণ্ণ সৌন্দর্যের কল্যাণে আমরা তখনও বিশ্বাস করতে পারতাম যে, ফুটবল কখনোই সাধারণ মানের খেলায় চিরতরে অভিশপ্ত হয়ে যায়নি।

* * *

সেই ফাইনাল ম্যাচে, জিদানকে মাঠ থেকে বের করে দেওয়ার কিছুক্ষণ পরেই, ইতালি পেনাল্টিতে ফ্রান্সকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়।

১৯৬৮ সাল পর্যন্ত টাই হওয়া ম্যাচের নিষ্পত্তি হতো টসের মাধ্যমে, তারপর থেকে পেনাল্টি শটের মাধ্যমে: যা কমবেশি ভাগ্যের উপর ছেড়ে দেওয়ারই আরেকটি উপায়। ফ্রান্স ইতালির চেয়ে ভালো দল ছিল, কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে দুই ঘণ্টারও বেশি সময়ের খেলা মুছে গেল। একই ঘটনা ঘটেছিল সেই ম্যাচেও, যা জার্মানির চেয়ে ভালো দল হওয়া সত্ত্বেও আর্জেন্টিনাকে দেশে ফেরার বিমানে তুলে দিয়েছিল।

* * *

ইতালীয় ক্লাব জুভেন্টাসের আটজন খেলোয়াড় বার্লিনের ফাইনালে পৌঁছেছিলেন: ইতালির হয়ে পাঁচজন এবং ফ্রান্সের হয়ে তিনজন। কাপের প্রাক্কালে উন্মোচিত হওয়া জালিয়াতির ঘটনায় জুভেন্টাস ক্লাবটিই সবচেয়ে গভীরভাবে জড়িত ছিল। ইতালির “ক্লিন হ্যান্ডস” (পরিষ্কার হাত) অভিযানটি “ক্লিন ফিট” (পরিষ্কার পা)-এ পরিণত হয়: বিচারকরা ব্যাপক প্রতারণার প্রমাণ খুঁজে পান, যার মধ্যে ছিল রেফারিদের ঘুষ দেওয়া, সাংবাদিকদের কিনে নেওয়া, চুক্তি জাল করা, হিসাবের খাতায় কারচুপি করা, পদের জন্য লটারি করা, এবং কারসাজি করা। সিলভিও বেরলুসকোনির মালিকানাধীন মিলানও এই ঘটনায় জড়িত ছিল, টিভি সম্প্রচার... সেই নিপুণ ব্যক্তি যিনি ফুটবল, ব্যবসা এবং · সরকারে তার প্রতারণামূলক কার্যকলাপের জন্য এত সফলভাবে বিচার এড়িয়ে গেছেন।

* * *

ইতালি তাদের চতুর্থ কাপ জয় করে এবং ফ্রান্স দ্বিতীয় ও জার্মানি তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এবং পর্তুগাল। আপনি বলতে পারেন, অ্যাডিডাস ও নাইকিকে পেছনে ফেলে পুমা জয়ী হয়েছে।

জার্মান দলের মিরোস্লাভ ক্লোসে পাঁচটি গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতা হন।

দক্ষিণ আমেরিকা ও ইউরোপের মধ্যে সমতা ছিল: প্রতিটি মহাদেশই কাপ জিতেছিল। নয়বার।

ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একই রেফারি, হোরাসিও এলিজোন্দো, উদ্বোধনী ম্যাচে প্রথম বাঁশি এবং ফাইনালে সমাপনী বাঁশি বাজালেন। তিনি যে সঠিক পছন্দ ছিলেন, তা প্রমাণিত হলো।

অন্যান্য রেকর্ডও স্থাপিত হয়েছিল, যার সবগুলোই ছিল ব্রাজিলের। স্থূলকায় কিন্তু কার্যকরী রোনাল্ডো বিশ্বকাপ ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা হন; কাফু সর্বাধিক ম্যাচ জেতা খেলোয়াড় হন; এবং ব্রাজিল সর্বাধিক গোলদাতা (বিস্ময়কর ২০১) এবং সর্বাধিক টানা জয়ী (সমানভাবে বিস্ময়কর এগারোটি) দেশ হয়ে ওঠে।

তথাপি, ২০০৬ সালের বিশ্বকাপে ব্রাজিল উপস্থিত থাকলেও তাদের দেখা যায়নি। সুপারস্টার রোনালদিনহো গোল বা জৌলুস কোনটাই এনে দিতে পারেননি, এবং ক্ষুব্ধ ভক্তরা তার কুড়ি ফুট উঁচু একটি মূর্তিকে ছাই ও বিকৃত ইস্পাতের স্তূপে পরিণত করেছিল।

* * *

চূড়ান্ত পর্যায়ে, টুর্নামেন্টটি একটি ইউরোকাপ ছাড়া অন্য কিছুতে পরিণত হয়েছিল। একক লাতিন আমেরিকান, আফ্রিকান বা অন্য কোনো অ-ইউরোপীয় দল।

খুব বেশি কল্পনাশক্তির প্রদর্শন দেখা যায়নি। ইকুয়েডর দল ছাড়া, যারা খুব একটা কার্যকর না হলেও চমৎকার খেলেছিল, এটি ছিল চমকহীন একটি বিশ্বকাপ। একজন দর্শকের ভাষায়: "খেলোয়াড়রা খুব ভালো আচরণ করছিল। তারা ধূমপান করেনি, মদ্যপান করেনি, খেলেনি।"

শিল্পীদের জন্য জায়গা করে দিয়েছিল ভারোত্তোলক ও অলিম্পিক দৌড়বিদরা, যারা মাঝে মাঝে বল বা প্রতিপক্ষকে লাথি মারত।

যে কৌশলটি এখন সাধারণ জ্ঞান হিসেবে গৃহীত হয়েছে, তা ফলপ্রসূ হয়েছে: প্রায় সবাই পেছনে, সামনে বলতে গেলে কেউই নেই; চীনের মহাপ্রাচীর গোলরক্ষা করছে আর একাকী যোদ্ধা একটি পাল্টা আক্রমণের আশায় আছে। মাত্র কয়েক বছর আগেও দলগুলো পাঁচজন খেলোয়াড়কে সামনে নিয়ে খেলত। এখন আছে মাত্র একজন, এবং এই হারে চলতে থাকলে শীঘ্রই আমরা শূন্যে নেমে আসব।

আর্জেন্টিনার কার্টুনিস্ট প্রাণীবিজ্ঞানী রবার্তো ফন্তানারোসা এঁকেছিলেন অনিবার্য উপসংহার: ধর্মঘটকারীরা পান্ডার মতো, এক বিপন্ন প্রজাতি।

২০১০ বিশ্বকাপ

একটির কারণে, রান দ্রুত মানবজাতির জন্য সবচেয়ে মারাত্মক হুমকি হয়ে উঠছিল।
আমি আন্তর্জাতিক প্রচারাভিযান ঘোষণা করছে যে এটির থাকতেও পারে বা হয়তো আছেও।
পারমাণবিক অস্ত্র থাকা, যেন হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে বেসামরিক নাগরিকদের ওপর বোমাটি ইরানিরাই ফেলেছিল।

আন্তর্জাতিক জলসীমায় ফিলিস্তিনের জন্য খাদ্য, ওষুধ এবং খেলনা বহনকারী জাহাজগুলোকে মেশিনগান দিয়ে গুলি করা হচ্ছিল; এটি ফিলিস্তিনিদের শাস্তি দেওয়ার জন্য ইসরায়েলের চিরাচরিত অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডগুলোর একটি, যেন সেমিট জাতিভুক্ত ফিলিস্তিনিরাই ইহুদি-বিদ্বেষ এবং এর ভয়াবহতার জন্য দায়ী।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, বিশ্বব্যাংক এবং অসংখ্য সরকার গ্রিসকে অপমান করছিল এবং অগ্রহণযোগ্য বিষয়টি মেনে নিতে দেশটিকে বাধ্য করছিল, যেন ১৯২৯ সালের পর থেকে সবচেয়ে ভয়াবহ আন্তর্জাতিক সংকটের জন্য ওয়াল স্ট্রিটের ব্যাংকাররা নয়, বরং গ্রিকরাই দায়ী।

পেন্টাগন আনন্দের সাথে ঘোষণা করছিল যে আফগানিস্তানে তাদের বিশেষজ্ঞরা এক ট্রিলিয়ন ডলার মূল্যের সোনা, কোবাল্ট, তামা, লোহা এবং বিশেষ করে লিথিয়াম আবিষ্কার করেছে—যা সেল ফোন ও ল্যাপটপের সেই কাঙ্ক্ষিত অপরিহার্য উপাদান। যেন প্রায় নয় বছরের যুদ্ধ এবং হাজার হাজার মৃত্যুর পর আক্রমণকারী দেশটি অবশেষে দখল করা দেশটিতেই তার কাঙ্ক্ষিত জিনিসটি খুঁজে পেয়েছে।

কলম্বিয়ায় একটি গণকবর থেকে দুই হাজারেরও বেশি নামহীন মৃতদেহ বেরিয়ে আসছিল, যেগুলোকে সেনাবাহিনী সেখানে এমনভাবে ফেলে রেখেছিল যেন তারা যুদ্ধে নিহত গেরিলা। যদিও আশেপাশের বাসিন্দারা জানত যে তারা ছিল শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য, সমাজকর্মী এবং নিজেদের জমি রক্ষাকারী কৃষক।

সর্বকালের সবচেয়ে ভয়াবহ পরিবেশগত বিপর্যয়গুলোর মধ্যে একটি ছিল পরিবর্তন মেক্সিকো উপসাগর তেলের এক বিশাল জলাশয়ে পরিণত হলো, এবং তার দেড় মাস পর

যখন এটা শুরু হলো, সমুদ্রতলের শিলা-আগ্নেয়গিরিটি তখনও পূর্ণমাত্রায় অগ্ন্যুৎপাত করছিল এবং এর জন্য দায়ী সংস্থা, ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম, তখনও উদাসীনভাবে অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল, যেন এই বিপর্যয়ে তাদের কোনো ভূমিকাই ছিল না।

বিভিন্ন দেশে যৌন নির্যাতন ও শিশু ধর্ষণের অভিযোগের বন্যা ক্যাথলিক চার্চকে ভাসিয়ে দিচ্ছিল এবং ভয়ের কারণে এতদিন চাপা থাকা মানসিক আঘাতগুলো সর্বত্র প্রকাশ্যে আসছিল, অথচ গির্জার কিছু সূত্র এই বলে নিজেদের রক্ষা করছিল যে, এই ধরনের নৃশংসতা গির্জার বাইরেও ঘটে, যেন তা এর কোনো অজুহাত হতে পারে, এবং দাবি করছিল যে অনেক ক্ষেত্রে যাজকদের উস্কানি দেওয়া হয়েছিল, যেন ভুক্তভোগীরাই দোষী ছিল।

মিয়ামির নির্ভরযোগ্য সূত্রগুলো তখনও ফিদেল কাস্ত্রোর বেঁচে থাকার কথা অস্বীকার করছিল, যেন তিনি প্রতিদিন তাদের তিক্ততার নতুন নতুন কারণ জোগান দিচ্ছিলেন না।

দুজন অপূরণীয় লেখক বিদায় নিচ্ছিলেন—হোসে সারামাগো এবং কার্লোস মনসিভাইস—এবং আমরা তাঁদের এমনভাবে অভাব বোধ করছিলাম, যেন আমরা জানতামই না যে তাঁরা শুধু এই পৃথিবীর মালিকদের যন্ত্রণা দেওয়ার আনন্দেই মৃতদের জগৎ থেকে বারবার ফিরে আসবেন।

আর হামবুর্গ বন্দরে, সেন্ট পাউলি ফুটবল ক্লাবের জার্মানির প্রথম বিভাগে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে এক বিশাল জনতা উল্লাস করছিল; অবিশ্বাস্য মনে হলেও এই ক্লাবটির বিশ মিলিয়ন ভক্ত রয়েছে এবং তাদের ক্লাবের মূলমন্ত্র হলো: "বর্ণবাদকে না বলুন, লিঙ্গবৈষম্যকে না বলুন, সমকামভীতিকে না বলুন, নাৎসিবাদকে না বলুন।"

এদিকে, সেখান থেকে অনেক দূরে দক্ষিণ আফ্রিকায়, "বর্ণবাদকে না বলুন" লেখা একটি ব্যানারে মোড়া হয়ে ঊনবিংশ বিশ্বকাপ শুরু হয়ে গেল।

* * *

এক মাস ধরে পৃথিবী ঘোরা বন্ধ করে দিয়েছিল এবং এর বহু বাসিন্দার শ্বাস-প্রশ্বাস থেমে গিয়েছিল।

এতে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না, কারণ এটি প্রতি চার বছর পর পর অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু অসাধারণ ব্যাপার ছিল যে এটিই ছিল আফ্রিকার মাটিতে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্বকাপ।

অবজ্ঞাত, নীরবতা ও বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়া কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকা, অন্তত চ্যাম্পিয়নশিপটি যতদিন চলেছিল সেই স্বল্প সময়ের জন্য, বিশ্ববাসীর মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে উদ্ভাসিত হতে পেরেছিল।

বিপুল ব্যয়ে নির্মিত দশটি স্টেডিয়ামে বত্রিশটি দেশ লড়াই করেছিল।
কেউ জানে না দক্ষিণ আফ্রিকা কীভাবে সেই কংক্রিটগুলো রক্ষা করতে পারবে।

বিশ্বের অন্যতম অন্যায্য একটি দেশে বিশাল আকারের প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনায় কোটি কোটি ডলারের এই অপচয় ব্যাখ্যা করা সহজ, কিন্তু এর ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা কঠিন।

* * *

স্টেডিয়ামগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, ফুলের আকৃতির স্টেডিয়ামটি, নেলসন ম্যান্ডেলার নামে নামকরণ করা একটি উপসাগরের উপরে তার বিশাল পাপড়িগুলো মেলে ধরেছিল।

এই বিশ্বকাপটি ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতার প্রতি এক যোগ্য সম্মাননা। ম্যান্ডেলার পরিশ্রমের ফল বিশ্বজুড়ে কোনো না কোনোভাবে দেখা যায়। তা সত্ত্বেও, তাঁর দেশে কৃষ্ণাঙ্গরা এখনও সবচেয়ে দরিদ্র এবং পুলিশ ও মহামারীর দ্বারা সবচেয়ে বেশি নিপীড়িত; এবং বিশ্বকাপের প্রাক্কালে সেইসব ভিক্ষুক, পতিতা ও পথশিশুরাও ছিল কৃষ্ণাঙ্গ, যাদেরকে দর্শনার্থীদের দৃষ্টির আড়ালে রাখা হয়েছিল, যাতে তাদের মনে কোনো খারাপ ধারণা তৈরি না হয়।

* * *

পুরো টুর্নামেন্ট জুড়েই দেখা যাচ্ছিল যে, আফ্রিকান ফুটবল তার ক্ষিপ্রতা ধরে রাখলেও উদ্ভাবনী শক্তি ও দুঃসাহস হারিয়ে ফেলেছে; প্রচুর দৌড়াদৌড়ি কিন্তু নাচের ছোঁয়া প্রায় নেই বললেই চলে। অনেকে মনে করেন, ম্যানেজাররা—যাঁদের প্রায় সবাই ইউরোপীয়—এক ধরনের ভীতিপ্রদ প্রভাব ফেলেছিলেন। যদি তা সত্যিও হয়, তবে যে ফুটবল এত উচ্ছ্বাসের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তার জন্য তাঁরা সামান্যই সুবিধা করতে পেরেছেন।

কার্যকারিতার নামে আফ্রিকা তার স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়েছিল, এবং সেই কার্যকারিতার অনুপস্থিতিই ছিল প্রকট। আফ্রিকার একমাত্র দেশ ঘানাই সেরা আটের মধ্যে স্থান পেয়েছিল; এবং শীঘ্রই ঘানাকেও বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হলো। একটিও আফ্রিকান দল টিকে থাকতে পারেনি, এমনকি আয়োজকরাও নয়।

ভালো ফুটবলের ঐতিহ্যের যোগ্য অনেক আফ্রিকান খেলোয়াড় বাস করেন এবং
সেই মহাদেশেই খেলা, যা তাদের পূর্বপুরুষদের দাসত্বে আবদ্ধ করেছিল।

বিশ্বকাপের একটি ম্যাচে ঘানার নাগরিক বাবার সন্তান বোয়াটেং ভ্রাতৃদ্বয় একে অপরের বিরুদ্ধে খেলেছিলেন: একজন ঘানার জার্সিতে, অন্যজন জার্মানির জার্সিতে।

ঘানা দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে একজনও ঘানার জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে খেলেননি।

জার্মান দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রত্যেকেই খেলেছে
জার্মানির জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ।

লাতিন আমেরিকার মতো আফ্রিকাও কর্মঠ মানুষ ও পরিশ্রমী পা রপ্তানি করে।

* * *

"জাবুলানি" ছিল সাবানমাখা, কিছুটা উন্মত্ত সেই টুর্নামেন্টের বলটির নাম, যা হাত ফসকে যেত আর পা বেপরোয়াভাবে চলত। বিশ্বকাপ অ্যাডিডাসের এই নতুনত্বকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল, যদিও খেলোয়াড়রা এটি বিন্দুমাত্র পছন্দ করেনি। জুরিখে তাদের দুর্গ থেকে ফুটবলের মালিকরা প্রস্তাব দেয় না, তারা চাপিয়ে দেয়।

এটাই তাদের রীতি।

* * *

কিছু কর্মকর্তার দ্বারা সংঘটিত ভুল ও ভয়াবহতা সেটাই স্পষ্ট করে দিয়েছে, যা বহু বছর ধরে সাধারণ জ্ঞান দাবি করে আসছিল।

নির্ণায়ক কিন্তু প্রশ্নবিদ্ধ ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে রেফারিকে ভিডিও রিপ্লে দেখার অনুমতি দেওয়ার জন্য সাধারণ জ্ঞান আকুল আবেদন জানায়, কিন্তু তা সবসময়ই ব্যর্থ হয়। প্রযুক্তি এখন এমন একটি পরামর্শের সুযোগ করে দিয়েছে যা ঠিক ততটাই দ্রুত ও সহজ, যতটা সহজ সেই অন্য প্রযুক্তিগত যন্ত্রটির দিকে এক ঝলক তাকানো, যা রেফারি ম্যাচের দৈর্ঘ্য মাপার জন্য ব্যবহার করেন। এর নাম ঘড়ি।

বাস্কেটবল, টেনিস, বেসবল, সাঁতার, এমনকি ফেন্সিং ও গাড়ি রেসিংয়ের মতো অন্য সব খেলায় নিয়মিত ইলেকট্রনিক সহায়তা ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ফুটবলে নয়। আর এর মালিকদের ব্যাখ্যাটা হাস্যকর হতো, যদি না তা সন্দেহজনকভাবে সুবিধাজনক হতো: তারা বলে, "ভুল তো খেলারই অংশ," আর ' ভুল করা মানুষের স্বভাব'— এই সত্যটি জেনে আমরা হতবাক হয়ে যাই ।

* * *

টুর্নামেন্টের সেরা সেভটি কোনো গোলরক্ষকের নয়, বরং একজন গোলদাতার কাজ ছিল: উরুগুয়ের স্ট্রাইকার লুইস সুয়ারেজ, একটি নির্ণায়ক ম্যাচের শেষ মিনিটে গোললাইনে দাঁড়িয়ে দুই হাত দিয়ে পিচ্ছিল বলটি আটকে দেন।

একটি গোল করলেই তার দেশ কাপ থেকে ছিটকে যেত; তার দেশপ্রেমজনিত পাগলামির কারণে সুয়ারেজকে বিদায় নিতে হলেও উরুগুয়েকে ছাড়তে হয়নি।

* * *

কষ্টকর বাছাইপর্বের পর সবার পেছনে থেকে বিশ্বকাপে প্রবেশ করা উরুগুয়ে, পুরো চ্যাম্পিয়নশিপ জুড়ে এক চুলও ছাড় না দিয়ে খেলেছে এবং একমাত্র লাতিন আমেরিকান দেশ হিসেবে ফাইনালে পৌঁছেছিল।

সেমিফাইনাল। উরুগুয়ের সংবাদমাধ্যমে বেশ কয়েকজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ সতর্ক করেছিলেন যে, "অতিরিক্ত আনন্দ হৃদপিণ্ডের ক্ষতি করতে পারে।" আমাদের মধ্যে অনেক উরুগুয়েবাসীই একঘেয়েমি ছাড়া অন্য কোনো কারণে মৃত্যুর এই সুযোগকে সাদরে গ্রহণ করেছিলাম এবং দেশের রাস্তাঘাট উৎসবে পরিণত হয়েছিল। সর্বোপরি, অন্যের দুর্ভাগ্য থেকে কিছু লোকের প্রাপ্ত আনন্দের চেয়ে নিজের কৃতিত্ব উদযাপনের অধিকার সর্বদাই শ্রেয়।

উরুগুয়ে চতুর্থ স্থানে থেকে মৌসুম শেষ করেছে, যা একমাত্র সেই দেশটির জন্য মন্দ নয় যারা এই বিশ্বকাপকে ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপে পরিণত হতে দেয়নি।

আমাদের স্ট্রাইকার দিয়েগো ফোরলান টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন।

* * *

স্পেন জিতেছে। যে দেশটি এর আগে কখনো এই ট্রফি জেতেনি, তারা তাদের সংহতির ফুটবলের বিস্ময়কর নৈপুণ্যে—যেখানে 'একজনের জন্য সবাই, একজনের জন্য সবাই'—এবং আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা নামের এক ক্ষুদে জাদুকরের অসাধারণ দক্ষতার জোরে অনায়াসে শিরোপাটি জিতে নিল।

একটি ফাইনাল ম্যাচের পর নেদারল্যান্ডস দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে, যে ম্যাচটি তার সেরাটা উজাড় করে দিয়েছিল। ঐতিহ্যকে এক কড়া ধাক্কা।

* * *

গত বিশ্বকাপের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীরা তাদের স্যুটকেস না খুলেই দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। ২০০৬ সালে ফাইনাল ম্যাচে ইতালি ও ফ্রান্স মুখোমুখি হয়েছিল। এবার তাদের দেখা হয়েছিল বিমানবন্দরের প্রস্থান লাউঞ্জে। ইতালিতে, প্রতিপক্ষকে খেলতে না দেওয়ার জন্য খেলা এই ফুটবলের বিরুদ্ধে ক্রমশই জোরালো কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল। ফ্রান্সে, এই বিপর্যয় একটি রাজনৈতিক সংকট তৈরি করেছিল এবং বর্ণবাদী ক্ষোভের জন্ম দিয়েছিল, কারণ দক্ষিণ আফ্রিকার স্টেডিয়ামগুলোতে "লা মার্সেইয়েজ" গাওয়া প্রায় সব খেলোয়াড়ই ছিলেন কৃষ্ণাঙ্গ।

ইংল্যান্ডের মতো অন্যান্য ফেভারিটরাও বেশিদিন টিকতে পারেনি।

ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা নির্মমভাবে অপমানিত হয়েছিল। ব্রাজিলকে চেনাই যাচ্ছিল না, কেবল সেই কয়েকটি মুহূর্ত ছাড়া যখন দলটি নিজেদের রক্ষণাত্মক পরিকল্পনার খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল। কী সেই রোগ যার জন্য এমন এক সন্দেহজনক প্রতিকারের প্রয়োজন হয়েছিল?

জার্মানি তাদের শেষ ম্যাচে আর্জেন্টিনার ওপর গোলের বৃষ্টি বর্ষণ করেছিল। অর্ধ শতাব্দী আগে, অন্য আর্জেন্টাইন খেলোয়াড়রা বিপর্যয়কর পারফরম্যান্সের পর দেশে ফিরলে মুদ্রার আঘাতে জর্জরিত হতেন, কিন্তু এবার তারা উচ্ছ্বসিত দর্শকদের দ্বারা সাদরে অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন। এখনও এমন মানুষ আছেন যারা জয়-পরাজয়ের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কিছুতে বিশ্বাস করেন।

* * *

এই বিশ্বকাপ এটা নিশ্চিত করেছে যে, পেশাদার ফুটবলের চাপিয়ে দেওয়া ক্লান্তিকর গতির কাছে খেলোয়াড়রা কী বিপুল হারে আহত হন। বলা যেতে পারে যে কিছু তারকা ধনী হয়েছেন, এমনকি অভাবনীয়ভাবে ধনী হয়েছেন, কিন্তু এটা কেবল সেই মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ক্ষেত্রেই সত্যি, যারা সপ্তাহে দুই বা ততোধিক ম্যাচ খেলা এবং দিনরাত অনুশীলনের পাশাপাশি তাদের সামান্য অবসর সময়টুকুও ভোগবাদী সমাজের চাহিদা মেটাতে উৎসর্গ করতে বাধ্য হন—যেমন অন্তর্বাস, গাড়ি, সুগন্ধি ও শেভার বিক্রি করা, অথবা চাকচিক্যময় ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদের জন্য পোজ দেওয়া। পরিশেষে, এটা কেবল এটাই প্রমাণ করে যে এই পৃথিবী এতটাই অদ্ভুত যে আমাদের এখানে কোটিপতি দাসও রয়েছে।

* * *

সবচেয়ে আলোচিত ও প্রত্যাশিত দুই সুপারস্টার তাদের নির্ধারিত সাক্ষাতে অনুপস্থিত ছিলেন। লিওনেল মেসি সেখানে থাকতে চেয়েছিলেন, সাধ্যমতো চেষ্টাও করেছিলেন, এবং তার মধ্যে দিয়ে বিশেষ কিছু ফুটে উঠেছিল। শোনা যায়, ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোও সেখানে ছিলেন, কিন্তু তাকে কেউ দেখেনি; সম্ভবত তিনি নিজেকে নিয়েই বেশি ব্যস্ত ছিলেন।

কিন্তু সমুদ্রের গভীর থেকে এক নতুন তারকার আবির্ভাব ঘটল এবং সে অপ্রত্যাশিতভাবে ফুটবল জগতের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করল। সে একটি অক্টোপাস এবং জার্মানির একটি অ্যাকোয়ারিয়ামে থাকে। তার নাম পল, যদিও তাকে অক্টোডামাস নামে ডাকাই বেশি যুক্তিযুক্ত।

প্রতিটি ম্যাচের আগে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করতেন। প্রতিপক্ষ দলের পতাকা বহনকারী দুটি ঝিনুকের মধ্য থেকে তাকে একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হতো। তিনি বিজয়ীদের ঝিনুকগুলো খেতেন এবং তার ভবিষ্যদ্বাণী কখনো ভুল হতো না।

বাজি ধরার ক্ষেত্রে নির্ণায়ক প্রভাব বিস্তারকারী সেই অক্টোপাস-ভবিষ্যদ্বক্তাকে ফুটবল জগতে ধর্মীয় শ্রদ্ধার সাথে শোনা হতো, এবং আমার মতো কিছু বিদ্বেষী মানুষের কাছে তিনি ভালোবাসা, ঘৃণা এমনকি অপবাদও পেতেন। যখন তিনি ঘোষণা করলেন যে উরুগুয়ে জার্মানির কাছে হেরে যাবে, আমি অভিযোগ করলাম: "এই অক্টোপাসকে কিনে নেওয়া হয়েছে।"

* * *

বিশ্বকাপের প্রথম দিনে, আমি আমার দরজায় একটি সাইনবোর্ড ঝুলিয়েছিলাম।
যে বাড়িটিতে লেখা ছিল: "ফুটবলের জন্য বন্ধ।"

এক মাস পর যখন আমি ওটা নামালাম, ততক্ষণে আমি আমার প্রিয় চেয়ারটা থেকে একচুলও না নড়ে চৌষট্টিটা ম্যাচ খেলে ফেলেছিলাম, হাতে ছিল বিয়ার।

এই কীর্তি আমাকে পরিশ্রান্ত করে দিয়েছে, পেশিগুলো শক্ত হয়ে গেছে, গলাটা ভেঙে গেছে, কিন্তু এরই মধ্যে আমার স্মৃতি কাতর হয়ে পড়ছে। আমি মিস করছি ভুভুজেলার অসহ্য একঘেয়ে সুর, দুর্বল হৃদয়ের জন্য ক্ষতিকর সেই গোলগুলোর আবেগ, আর ধীর গতিতে বারবার দেখানো সেরা খেলাগুলোর সৌন্দর্য। আমি মিস করছি উদযাপন আর শোককেও, কারণ কখনও কখনও ফুটবল এমন এক আনন্দ যা কষ্ট দেয়, আর বিজয়ের যে সুর মৃতকেও নাচিয়ে তোলে, তা অনেকটাই শোনায় এক খালি স্টেডিয়ামের কোলাহলপূর্ণ নিস্তব্ধতার মতো, যেখানে পরাজিতদের একজন, নড়তে না পেরে, বিশাল গ্যালারির মাঝখানে একা বসে থাকে।

উৎস

আগুয়েরে, হোসে ফার্নান্দো, রিকার্ডো জামোরা (বার্সেলোনা: ক্লিপার, 1958)।
Alcantara, Eurîpides, "Aeficiencia da retranca," এবং Marcos Sá Corrêa, Maurîcio Cardoso এবং Roberto Pompeu de Toledo, Veja (সাও পাওলো) এর বিশেষ সংস্করণের অন্যান্য নিবন্ধ, 18 জুলাই, 1994।
Altafini, José, I magnific 50 del calcio mondiale (মিলান: Sterling & Kupfer, 1985)।
আনুয়ারিও মুন্ডিয়াল ডি ফুটবল পেশাদার (বুয়েনস আইরেস), ভল. 1, না. 1 জুন 1934।
Arias, Eduardo et al., Colombia gol: De Pedernera a Maturana: Grandes momentos del fútbol (Bogotá: Cerec, 1991)।
আর্চেটি, এডুয়ার্ডো পি., "Estilo y virtudes masculinas en El Gráfico: la criación del imaginario del ফুটবল আর্জেন্টিনো," ডেসাররোলো ইকোনোমিকো 35, নং 139 (অক্টো.-ডিসেম্বর 1995): 419–442।
আরুচি, ড্যানিয়েল, "Mágicos templos del fútbol," El Gráfico (বুয়েনস আইরেস), 20 মার্চ, 1991।
অ্যাসোসিয়েশন দেল ফুটবল আর্জেন্টিনো, Cien años con el fútbol (বুয়েনস আইরেস: জাগো, 1993)।
Associazione Italiana Arbitri, 75 anni di storia (মিলান: Vallardi, 1987)।
Barba, Alejandro, Foot Ball, Base Ball y Lawn Tennis (Barcelona: Soler, nd).
বার্টিসোল, চার্লস এবং ক্রিস্টোফ, লেস রেসিনস ডু ফুট-বল ফ্রাঙ্কাইস (প্যারিস: প্যাক, 1983)।
Bayer, Osvaldo, Fútbol argentino (বুয়েনস আইরেস: সুদামেরিকানা, 1990)।
Benedetti, Mario, "Puntero izquierdo," সংকলন হিঞ্চাস y goles: El fútbol como personaje (বুয়েনস আইরেস: Desde la Gente, 1994)।
Blanco, Eduardo, "El negocio del fútbol," লা মাগা (বুয়েনস আইরেস), ডিসেম্বর 7, 1994।
Boix, Jaume এবং Arcadio Espada, El deporte del poder (Madrid: Temas de Hoy, 1991)।
Boli, Basile, Black Boli (Paris: Grasset, 1994)।
ব্রি, ক্রিশ্চিয়ান দে, লে মন্ডে ডিপ্লোম্যাটিকে (ইতালীয় সংস্করণ), জুন ১৯৯৪, ইল ম্যানিফেস্টো (রোম) কর্তৃক প্রকাশিত।
বুফোর্ড, বিল, গুণ্ডাদের মাঝে: গণ সহিংসতার অভিজ্ঞতা ও প্রলোভন (নিউ ইয়র্ক: নর্টন, ১৯৯২)।
কামু, অ্যালবার্ট, এডুয়ার্ডো গ্যালিয়ানোর সংকলনে প্রকাশিত সাক্ষ্য Su majestad el fútbol (মন্টেভিডিও: আর্কা, ১৯৯৪)।
——, লে প্রিমিয়ার হোমে (প্যারিস: গ্যালিমার্ড, 1994)।
ক্যাপা, অ্যাঞ্জেল, "ফুটবল, আন অ্যানিমেল ডি ডস পাতাস," ডিসেনসো (লাস পালমাস, ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ), না। 7.
ক্যারিয়াস, মার্কো ভার্জিলিও ড্যানিয়েল স্লুটস্কির সাথে, লা গেরা ইনউটিল: সামাজিক-অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ entre Honduras y El Salvador (San José, Costa Rica: EDUCA, 1971)।
Cepeda Samudio, Alvaro, "Garrincha," Alrededor del futbol (Medellin: Antioquia University, ১৯৯৪)।
Cerretti, Franco, Storia illustrata dei Mondiali di Calcio (রোম: Anthropos, 1986)।
Comisión de Asuntos Históricos, La historia de Vélez Sarsfield (1910/1980) (বুয়েনস আইরেস, 1980)।
Coutinho, Edilberto, Maracanã, adeus (হাভানা: Casa de las Américas, 1980)।
Decaux, Sergio, Peñarol campeón del mundo (মন্টেভিডিও: Colección "100 Años de Fútbol," নং 21, ১৯৭০)।
Délano, Poli, ed., Hinchas y goles: El fútbol como personaje (Buenos Aires: Desde la Gente, 1994)।
"Discurso de João Havelange ante la cámara de Comercio Brasil-USA en Nueva York, el 27 de octubre de 1994,"El Gráfico (Buenos Aires), নভেম্বর 8, 1994।

Duarte, Orlando, Todas las Copas del Mundo (Madrid: McGraw-Hill, 1993)।
দুজোভনে অর্টিজ, অ্যালিসিয়া, ম্যারাডোনা সোনো আইও:। Un viaggio alla scoperta di unaidentitá (Naples: Edizioni Scientifiche Italiane, 1992)।
ডানিং, এরিক, প্রমুখ, ফুটবল গুন্ডামির উৎস (লন্ডন: রাউটলেজ অ্যান্ড কেগান পল, ১৯৮৮)।
"Entrevista con cuatro integrantes de la 'barrabrava' del club Nacional," La República (Montevideo), ১ ডিসেম্বর, ১৯৯৩।
Escande, Enrique, Nolo: El fútbol de la cabeza a los pies (বুয়েনস আইরেস: উকামার, 1992)।
ফারিয়া, অক্টাভিও ডি, এট আল।, ওলহো না বোলা (রিও ডি জেনেইরো: গোল, 1968)।
ফেলিস, জিয়ান্নি দে, "ইল গিয়ালো ডেলা ফিফা," গুয়েরিন স্পোর্টিভো (তুরিন), 25 জানুয়ারী, 1995।
ফার্নান্দেজ, জোসে রামন, এল ফুটবল মেক্সিকানো: ¿Un juego sucio? (মেক্সিকো: গ্রিজালবো, 1994)।
Fernández Seguî, JA, La preparación fisica del futbolista europeo (মাদ্রিদ: Sanz Martînez, 1977)।
ফেরেরা, কার্লোস, আমার জুয়েগো। . . (বুয়েনস আইরেস: লা ক্যাম্পানা, 1983)।
গালিয়াচো, জুয়ান লুইস, জেসুস গিল ই গিল, এল গ্রান কমেডিয়ান (মাদ্রিদ: তেমাস ডি হোয়, 1993)।
Gallado, César L., et al., Los maestros (Montevideo: Colección "100 Años de Fútbol," no. 12, 1970)।
গার্সিয়া কান্ডাউ, জুলিয়ান, এল ফুটবল সিন লে (মাদ্রিদ: পেন্টালন, 1981)। ——, Épica
y lîrica del fútbol (মাদ্রিদ: আলিয়ানজা, 1995)।
Geronazzo, Argentino, Técnica y táctica del fútbol (বুয়েনস আইরেস: Lidiun, 1980)।
Gispert, Carlos, et al., Enciclopedia mundial del fútbol, 6 vols. (বার্সেলোনা: Oceano, 1982)।
Goethals, Raymond, Le douzième homme (প্যারিস: Laffont, 1994)।
Guevara, Ernesto, Mi primer gran viaje (বুয়েনস আইরেস: Seix Barral, 1994)।
Gutierrez Cortinas, Eduardo, Los negros en el fútbol uruguayo (মন্টেভিডিও: Colección "100 Años de Fútbol," নং ১০, ১৯৭০)।
Hernández Coronado, Pablo, Las cosas del fútbol (মাদ্রিদ: প্লেনিটুড, 1955)।
হেরেরা, হেলেনিও, ইয়ো (বার্সেলোনা: প্লানেটা, 1962)।
হার্শম্যান, মাইকেল, এবং কাটিয়া লার্নার, ল্যান্স ডি সোর্তে: হে ফুটবল ইয়ো জোগো ডো বিচো না বেলে ইপোক carioca (রিও ডি জেনিরো: ডায়াডোরিম, 1993)।
"হিস্টোরিয়া দে লা কোপা দেল মুন্ডো," ডকুমেন্টারি ভিডিও এবং বিশেষ সিরিজ (বুয়েনস আইরেস: এল গ্রাফিকো, ১৯৯৪)।
"Historia del fútbol," তিনটি ডকুমেন্টারি ভিডিও (মাদ্রিদ: ট্রান্সওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল মেট্রোভিডিও, ১৯৯১)।
Howe, Don, and Brian Scovel, Manual de fútbol (বার্সেলোনা: মার্টিনেজ রোকা, 1991)।
Hübener, Karl Ludolf, et al., ¿Nunca más campeón mundial? সেমিনারিও sobre fútbol, deportes y politica en el Uruguay (মন্টেভিডিও: ফেসুর, 1990)।
Huerta, Héctor, Héroes de consumo জনপ্রিয় (Guadalajara: Agata, 1992)।
Ichah, Robert, Platini (Paris: Inéditions, 1994)।
জোয়াও হ্যাভেলাঞ্জের সাক্ষাৎকার, দ্য টাইমস (লন্ডন), ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১।
Lago, Alessandro dal, Descrizione di una battaglia: I rituali del calcio (Bologna: Il Mulino, 1990)।
——, রবার্তো মোসকাটির সাথে, রেগালেটসি আন সোগনো: ইতালিয়ায় মিটি ই রিয়েলটা ডেল টিফো ক্যালসিসটিকো (মিলান: বোম্পিয়ানি, 1992)।
——, Pier Aldo Rovatti, Per gioco: Pîccolo manuale dell/esperienza ludica (মিলান: কর্টিনা, 1993)।

লা মাগা (বুয়েনস আইরেস), "হোমেনাজে আল ফুটবল আর্জেন্টিনো," বিশেষ সংস্করণ, জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারি 1994।
Lazzarini, Marta, এবং Patricia Luppi, Boletin de temas de psicologîa social (Buenos Aires), vol. 2, না। 5, সেপ্টেম্বর 1991।
Lever, Janet, La locurapor el fútbol (মেক্সিকো: FCE, 1985)।
"লেজিওনি ডি স্টোরিয়া," ইল ম্যানিফেস্টো (রোম), জুন/জুলাই 1994-এর চারটি সম্পূরকের সিরিজ ।
Loedel, Carlos, Hechos y actores del profesionalismo (মন্টেভিডিও: Colección "100 Años de Fútbol," নং ১৪, ১৯৭০)।

Lombardo, Ricardo, Donde se cuentan proezas: Fútbol uruguayo (1920/1930) (মন্টেভিডিও: Banda প্রাচ্য, ১৯৯৩)।
Lorente, Rafael, Di Stéfano cuenta su vida (Madrid: np, 1954)।
লরেঞ্জো, জুয়ান কার্লোস, এবং জর্জ কাস্তেলি, এল ফুটবল এন মুন্ডো ডি ক্যাম্বিওস (বুয়েনস আইরেস: ফ্রিল্যান্ড, ১৯৭৭)।
Lucero, Diego, La boina fantasma (মন্টেভিডিও: Colección "100 Años de Fútbol," নং 20, 1970)।
Marelli, Roberto, Estudiante de La Plata, campeón intercontinental (Buenos Aires: Norte, 1978)।
মারিও ফিলহো, হে রোম্যান্স ডু ফুট-বল (রিও ডি জেনিরো: পংগেটি, 1949)।
——, O negro no futebol brasileiro (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1964)।
——, হিস্টোরিয়াস ডো ফ্ল্যামেঙ্গো (রিও ডি জেনিরো: রেকর্ড, 1966)।
——, O sapo de Arubinha (São Paulo: Companhia das Letras, 1994)।
মার্টিন, কারমেলো, ভালদানো: সুয়েওস দে ফুটবল (মাদ্রিদ: এল পাইস/আগুইলার, 1994)।
মাতুরানা, ফ্রান্সিসকো, জোসে ক্লোপটোফস্কির সাথে, তাল্লা মুন্ডিয়াল (বোগোটা: ইন্টারমিডিও, 1994)।
মার্সিয়ার, জোসেফ, লে ফুটবল (প্যারিস: প্রেসেস ইউনিভার্সিটিয়ারস, 1979)।
Meynaud, Jean, খেলাধুলা এবং রাজনীতি (প্যারিস: পেওট, 1966)।
Milá, Mercedes, "La violencia en el fútbol," টেলিভিশন প্রোগ্রামের অংশ Queremos saber, Antena ৩ (মাদ্রিদ), জানুয়ারি ১৯৯৩।
মিনা, জিয়ান্নি, "Le vie del calcio targate Berlusconi," La Repubblica (রোম), মে 6, 1988।
——, "I padroni del calcio. La Federazione s'é fatta হোল্ডিং," La Repubblica (রোম), 19 জুলাই, 1990. "La classe non è
——, acqua" কমিটির অন্যান্য সদস্যদের সাথে, Te Diegum (Milan: Leonardo, 1991)।

মোরালেস, ফ্র্যাঙ্কলিন, "হিস্টোরিয়া ডি ন্যাসিওনাল" এবং "হিস্টোরিয়া ডি পেনারোল," লা মানানার পরিপূরক (মন্টেভিডিও), ১৯৮৯।
——, Fútbol, mito y realidad (মন্টেভিডিও: Colección “Nuestra Tierra,” no. 22, 1969)।
——, Los albores del fútbol uruguayo (মন্টেভিডিও: Colección "100 Años de Fútbol," নং 2, 1969)।
——, La gloria tan temida (মন্টেভিডিও: Colección "100 Años de Fútbol," নং 1, 1969)।
——, Enviado especial (1) (Montevideo: Banco de Boston, 1994)।
মরিস, ডেসমন্ড, দি সকার ট্রাইব (লন্ডন: জোনাথন কেপ, ১৯৮১)।
মৌরা, রবার্তো, "টেস্টিমোনিওস দে ডোমিঙ্গোস দা গুইয়া ই দিদি," পেসকুইসা দে ক্যাম্পো (ইউনিভার্সিড ডেল এস্তাদো দে রিও ডি জেনিরো), জুন 1994।
মুরা, জিয়ান্নি, "ইল ক্যালসিও দেই বোইয়া," লা রিপাব্লিকা (রোম), নভেম্বর ২৯, ১৯৯৪।
Nogueira, Armando, et al., A Copa que ninguém viu ea que não queremos lembrar (সাও পাওলো: Companhia das Letras, 1994)।
Orwell, George, et al., El fútbol (বুয়েনস আইরেস: জর্জ আলভারেজ, 1967)।
Ossa, Carlos, La historia de Colo-Colo (সান্তিয়াগো দে চিলি: প্ল্যান, 1971)।
Panzeri, Dante, Fútbol, dinámica de lo impensado (Buenos Aires: Paidós, 1967)।
Papa, Antonio, and Guido Panico, Storia sociale del calcio in Italia (Bologn: Il Mulino, 1993)।
পসন, টনি, দ্য গোলস্কোরার্স: ফ্রম ব্লুমার টু কিগান (লন্ডন: ক্যাসেল, ১৯৭৮)।
Pedrosa, Milton (ed.), Gol de letra (Rio de Janeiro: Gol, nd)।
Pepe, Osvaldo, et al., El libro de los Mundiales (Buenos Aires: Crea, 1978)।
Perdigão, Paulo, Anatomîa de uma derrota (Porto Alegre: L&PM, 1986)।
Peucelle, Carlos, Fútbol todotiempo e historia de "La Máquina" (বুয়েনস আইরেস: Axioma, 1975)।
পিপ্পো, আন্তোনিও, ওবদুলিও দেদে এল আলমা (মন্টেভিডিও: ফিন ডি সিগলো, 1993)।
প্লাতিনি, মিশেল, প্যাট্রিক মাহের সাথে, মা ভিয়ে কমে আন ম্যাচ (প্যারিস: লাফন্ট, 1987)।
পন্টে প্রেটা, স্তানিস্লো, বোলা না রেড: আ বাতালহা দো বি (রিও ডি জেনেইরো: সিভিলিজাকাও ব্রাসিলিরা, 1993)।
পোভেদা মার্কেজ, ফ্যাবিও, এল পিবে: ডি পেসকাইতো আ লা গ্লোরিয়া (বোগোটা: ইন্টারমিডিও, 1994)।
Puppo, Julio César, "El Hachero," Nueve contra একবার (Montevideo: Arca, 1976)।
——, ক্রনিকাস ডি ফুটবল (মন্টেভিডিও: এনসাইক্লোপিডিয়া উরুগুয়া, 1969)।

রাফায়েল, এডুয়ার্ডো, "মেমোরিয়া: জোসে ম্যানুয়েল মোরেনো," এল টোক (বুয়েনস আইরেস), মার্চ 17, 1994।
রামিরেজ, মিগুয়েল অ্যাঞ্জেল, "লস ক্যাচিরুলস: লা হিস্টোরিয়া ডেট্রাস দে লা নোটা," রেভিস্তা মেক্সিকানা দে যোগাযোগ, না. 1, সেপ্টেম্বর/অক্টো. 1988।
——, "Emilio Maurer contra Televisa, una batalla epica en el fútbol local," La Jornada (Mexico), ৭-১২ ডিসেম্বর, ১৯৯৩।
Reid, Alastair, Ariel y Calibán (বোগোটা: Tercer Mundo, 1994)।
Ribeiro, Péris, Didi, o gênio da folha seca (রিও ডি জেনেইরো: ইমাগো, 1993)।
Rocca, Pablo, Literatura y fútbol en el Uruguay (1899/1990) (মন্টেভিডিও: আর্কা, 1991)।
Rodrigues, Nelson, A sombra das chuteiras imortais (সাও পাওলো: Companhia das Letras, 1993)।
——, A patria em chuteiras (সাও পাওলো: Companhia das Letras, 1994)। মারিও
——, ফিলহো, ফ্লা-ফ্লু (রিও ডি জেনিরো: ইউরোপা, 1987) এর সাথে।
Rodrîguez, Nelson, El fútbol como apostolado (মন্টেভিডিও: Juventus/Colegio de Escribanos, 1995)।
রদ্রিগেজ আরিয়াস, মিগুয়েল, "ডিয়েগো" (ভিডিও) (বুয়েনস আইরেস: লাস প্যাটাস দে লা মেন্টিরা, 1994)।
রোলস, জেমস, এল দ্বন্দ্ব হন্ডুরাস–এল সালভাদর (1969) (সান জোসে, কোস্টা রিকা: EDUCA, 1980)।
Ruocco, Ángel, "Grandes equipos italianos en zozobra" (ANSA) El Paîs (Montevideo), জানুয়ারী 16, ১৯৯৪।
Ryswick, Jacques de, 100,000 heures de football (Paris: La Table Ronde, 1962)।
Saldanha, João, Meus amigos (Rio de Janeiro: Nova Mitavaî, 1987)।
——, Futebol e outras histórias (রিও ডি জেনিরো: রেকর্ড, 1988)।
সালভো, আলফ্রেডো ডি, আমাদেও ক্যারিজো (বুয়েনস আইরেস: np 1992)।
Sanz, Tomás, and Roberto Fontanarrosa, Pequeño diccionario ilustrado del fútbol argentino (বুয়েনস আইরেস: Clarîn/ Aguilar, 1994)।
Sasîa, José, Orsai en el paraîso (Montevideo: La Pluma, 1992)।
Scher, Ariel, এবং Héctor Palomino, Fútbol: Pasión de multitudes y de elites (বুয়েনস আইরেস: সিসিয়া, ১৯৮৮)।
Schumacher, Harald, Der Anpfiff: Enthüllungen über den deutschen Fußball (মিউনিখ: Knaur, 1987)।
স্ক্লিয়ার, সালোমাও (সম্পাদনা), et al., a história ilustrada do futebol brasileiro, 4 vols. (সাও পাওলো: এডোব্রাস, এনডি)।
স্কোপেলি, আলেজান্দ্রো, হোলা, মিস্টার! El fútbol por dentro (বার্সেলোনা: জুভেন্টুড, 1957)।
Seiferheld, Alfredo, এবং Pedro Servîn Fabio, Álbum fotográfico del fútbol paraguayo (Asunción: এডিটোরিয়াল হিস্টোরিকা, ১৯৮৬)।
শেক্সপিয়র, উইলিয়াম, দি কমেডি অফ এররস (লন্ডন: মেথুয়েন, ১৯০৭)।
—, কিং লিয়ার (লন্ডন: স্যামুয়েল ফ্রেঞ্চ, ১৯৬৭)।
Shaw, Duncan, Fútbol y franquismo (মাদ্রিদ: আলিয়ানজা, 1987)।
সিলভা, থমাজ সোয়ারেস দা, জিজিনহো: ও মেস্ত্রে জিজা (রিও ডি জেনেইরো: মারাকানা, 1985)।
সিমসন, ভিভ, এবং অ্যান্ড্রু জেনিংস, ডিসঅনার্ড গেমস: দুর্নীতি, অর্থ এবং লোভ অলিম্পিক (নিউ ইয়র্ক: শাপলস্কি, ১৯৯২)।
Smorto, Giuseppe, "Nazione corrotto, calcio infetto," La Repubblica (রোম), 26 মার্চ, 1993।
Sobrequés, Jaume, Historia del Fútbol Club Barcelona (বার্সেলোনা: শ্রম, 1994)।
Soriano, Osvaldo, Cuentos de los años felices (বুয়েনস আইরেস: সুদামেরিকানা, 1994)।
সুজা, রবার্তো পেরেইরা দে, "ও পোডেরোসো শেফাও," প্লেবয় (ব্রাজিলীয় সংস্করণ), মে 1994।
Starosin, Andrei, Por esas canchas de fútbol (মস্কো: Lenguas Extranjeras, 1959)।
Suburú, Nilo J., Al fútbol se juega asî: Catorce verdades universales (Montevideo: Tauro, 1968)।
——, প্রাইমার ডিসিওনারিও দেল ফুটবল (মন্টেভিডিও: টাউরো, 1968)।
টেসি, জাস্টিন, লে ফুটবল (প্যারিস: ভিগট, 1969)।
Termes, Josep, et al., Onze del barça (Barcelona: Columna, 1994)।
থিবার্ট, জ্যাকস, লা ফ্যাবুলিউস হিস্টোর ডু ফুটবল (প্যারিস: ওডিল, 1974)।
Traverso, Jorge, Primera linea (Montevideo: Banco de Boston, 1992)।

উরিয়ার্তে, মারিয়া তেরেসা, এবং অন্যান্য।, এল জুয়েগো দে পেলোটা এন মেসোআমেরিকা: রেসিস ও সুপারভিভেনসিয়া (মেক্সিকো: সিগলো XXI, ১৯৯২)।
Valdano, Jorge, "Las ocurrencias de Havelange," El Pais (Madrid) 28 মে, 1990।
ভার্দু, ভিসেন্টে, এল ফুটবল। Mitos, ritos y sîmbolos (মাদ্রিদ: আলিয়ানজা, 1980)।
Vinnai, Gerhard, El fútbol como ideologîa (মেক্সিকো: Siglo XXI, 1974)।
Volpicelli, Luigi, Industrialism y deporte (বুয়েনস আইরেস: Paidós, 1967)।
ওলস্টেনহোলমে, কেনেথ, প্রফেশনালেস দেল ফুটবল (বার্সেলোনা: মোলিনো, 1969)।
Zito Lema, Vicente, Conversaciones con Enrique Pichon-Rivière (Buenos Aires: Cinco, 1991)।

সূচী

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

NATION BOOKS

The Nation Institute

The Nation.

২০০০ সালে প্রতিষ্ঠিত নেশন বুকস আমেরিকার স্বাধীন প্রকাশনা জগতে একটি অগ্রণী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।
এই প্রকাশনা সংস্থাটির অনুপ্রেরণা এসেছিল 'দ্য নেশন' পত্রিকা থেকে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রাচীনতম স্বাধীন এবং ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা।

এই প্রকাশনা সংস্থার লক্ষ্য হলো এমন প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রকাশ করা যা নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে এবং সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়াবলীর ওপর আলোকপাত করে। আমরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠিত লেখকদের গ্রন্থ প্রকাশ করি এবং উদীয়মান ও প্রতিভাবান লেখকদের একটি নতুন প্রজন্ম গড়ে তুলতে সচেষ্ট থাকি। আমাদের প্রতিটি বইয়ের মাধ্যমে আমরা সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আলোচনাকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার লক্ষ্য রাখি।

নেশন বুকস হলো দ্য নেশন ইনস্টিটিউটের একটি প্রকল্প। এটি একটি অলাভজনক গণমাধ্যম কেন্দ্র, যা গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রসার ঘটাতে এবং স্বাধীন গণমাধ্যমকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দ্য নেশন ইনস্টিটিউটে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের গতিশীল কর্মসূচি: আমাদের পুরস্কার-বিজয়ী ইনভেস্টিগেটিভ ফান্ড, যা যুগান্তকারী অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকে সমর্থন করে; বহুল পঠিত ও সিন্ডিকেটকৃত ওয়েবসাইট টমডিসপ্যাচ; নেশন ম্যাগাজিনের সহযোগিতায় আমাদের ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম; এবং জার্নালিজম ফেলোশিপ, যা প্রতি বছর ২০ জন পর্যন্ত খ্যাতিমান সাংবাদিককে অর্থায়ন করে।

নেশন বুকস, নেশন ম্যাগাজিন এবং দ্য নেশন ইনস্টিটিউট সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য , অনুগ্রহ করে দেখুন:

www.nationbooks.org

www.nationinstitute.org

www.thenation.com

www.facebook.com/nationbooks.ny

টুইটার: @nationbooks